KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher নীরদ চৌধুরী
Title উল্টোরথ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number 46/1 46/2 46/3 46/4 46/5	Year of Publication May 1985 Jun 1985 July 1985 Aug 1985 Sep 1985
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

মে
১৯৮৫

মূলত বাঙলা ভাষার দাবিতেই বাংলাদেশের জন্ম। কিন্তু আজ স্বাধীনতার একযুগ পরে বাংলাদেশে মাতৃভাষা কি বিদ্যাজীবীদের উন্নাসিকতার শিকার?—এ বিষয়ে বাংলাদেশের বহুদর্শী চিন্তাবিদ আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধ।

শিখদের অনেক দাবি যৌক্তিক ; এ কথা মেনে নিয়েও ভাববার আছে যে শিখ ধর্মগুরুদের প্ররোচনায় ভারতের এই বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায় শেষপর্যন্ত না সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মান্ধতায় পৌঁছে যায়!
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পর্যালোচনার এ মাসের বিষয়।

আধুনিক কবিতার প্রবাদপুরুষ শামসুর রহমানের কবিতা।
তরুণ লেখক রাধাপ্রসাদ ঘোষালের ধ্বনিচিত্রময় গল্প 'কোজাগরী'।
ড ভবতোষ দত্তের প্রবন্ধ 'প্রগতি ও দারিদ্র্য'-এর ওপর তরুণ চিন্তাবিদদের একগুচ্ছ আলোচনা।

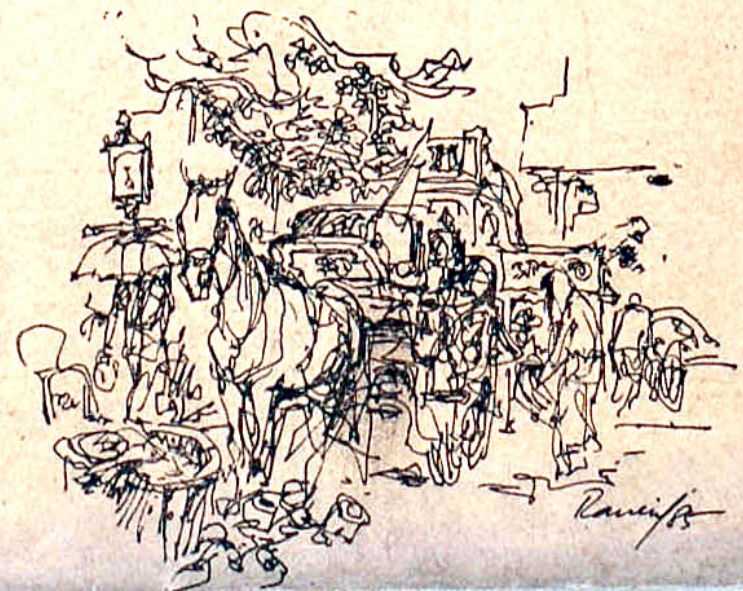

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
মিরিয়া হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যর্থতা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
এর জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কৃত্তিবাস

বর্ষ ৪৬। সংখ্যা ১
মে ১৯৮৫
বৈশাখ ১৩৯২

বাঙলা ভাষা ও বাংলাদেশ আনিসুজ্জামান ১
ভারতে হিন্দু-মুসলমান : সাধনা ও সমন্বয় অমলেশ ভট্টাচার্য ২১
'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য' তারাপদ মুখোপাধ্যায় ৫৭

ইন্দ্রাণীর খাতা শামসুর রাহমান ১৭
শূদ্র বালিহাঁস জয়কৃষ্ণ কয়াল ১৯
ভিক্ষা ওমর আলী ২০

পোকামাকড়ের ঘরবসতি সেলিনা হোসেন ১৩
ক্লান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর রায় ৩১
কোজাগরী রাধাপ্রসাদ ঘোষাল ৪৪
ঢেলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৪৯

গ্রন্থসমালোচনা ৭১
সুকুমারী ভট্টাচার্য, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, নিত্যপ্রিয় ঘোষ,
জীবনবল্লভ চৌধুরী, ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা ৮১
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কিশোর চট্টোপাধ্যায়,
শ্যামশ্রী লাল, দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

পাঠকের দৃষ্টিতে ৯০
দিলীপনারায়ণ দে, গৌতম রায়চৌধুরী, বিভাস সাহা

প্রচ্ছদচিত্র : রনেনআয়ন দত্ত
মুখপাতের ছবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

Fifty Penguin Years

PENGUINS' HOMAGE

TO

Gurudev

Rabindra Nath Tagore

Selected Poems

Translated by

WILLIAM RADICE

£ 2·95

STOCK IN JUNE

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700 073
Also at :
Allahabad : Bombay : New Delhi

চতুরঙ্গ

প্রতি সংখ্যা তিন টাকা
সডাক গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৩৬ টাকা,
যান্মাসিক ১৮ টাকা

এজেন্সির নিয়মাবলী

১। পাঁচ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।

২। কমিশন শতকরা ২৫। পঁচিশ কপির ঊর্ধ্বে শতকরা ৩০।

৩। ডাক-খরচ আমরা বহন করি।

৪। কপি-পিছু দেড় টাকা আমাদের দপ্তরে জমা রাখতে হবে।

•

লেখকদের প্রতি নিবেদন

যাঁরা প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাবেন তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে নকল রেখে পাঠান—অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

অন্যান্য অমনোনীত রচনা যাঁরা ফেরত নিতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে উপযুক্ত পরিমাণে ডাক-টিকিট পাঠালে আমাদের সহায়তা করা হবে।

প্রেরিত রচনায় অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত বিদেশী ব্যক্তিনাম আর স্থাননাম থাকলে, সম্ভব আলাদা একটি কাগজে ইংরেজি বড়ো হরফে সেগুলি লিখে দিলে উপকার হবে।

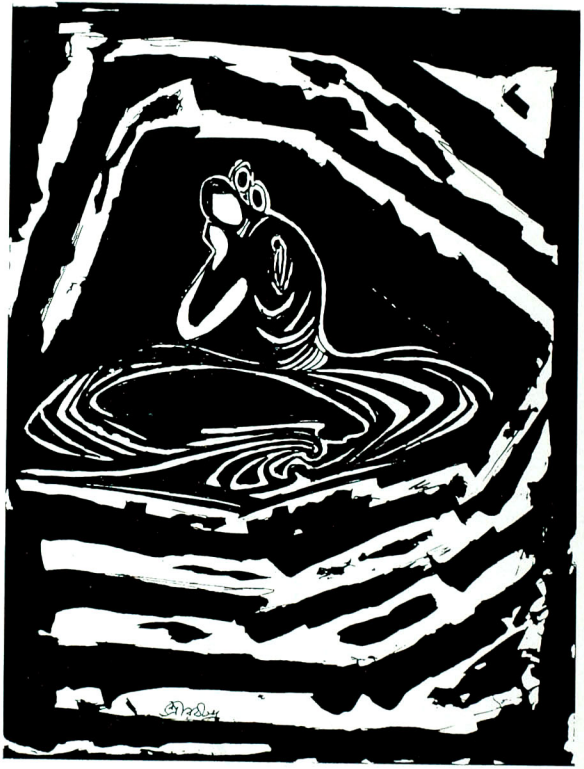

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সৌজন্যে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙলা ভাষা ও বাংলাদেশ

আনিসুজ্জামান

বাংলা একাডেমী এ-বছরে 'অমর একুশে বক্তৃতা' প্রবর্তন করেছেন এবং তা প্রদান করতে আহ্বান জানিয়েছেন আমাকে। এতে আমি যেমন সম্মানিত বোধ করেছি, তেমনি তাঁদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়েছি। তবে খুব সংকোচের সঙ্গে আমি এই বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়েছি। তার কারণটা গোড়ায় ব্যাখ্যা করা ভালো।

অমর একুশে ফেব্রুআরির নামে যে বক্তৃতা দিতে হবে, তাতে, অন্তত তার প্রথমটিতে, আমার মনে হয়, সেই মহান দিনটির লক্ষ্যসাধনের পথে আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি, সেই আলোচনা অনিবার্য। একুশে ফেব্রুআরিতে তেমন আলোচনা করা একটা প্রথাও হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু একুশেই নয়, পুরো ফেব্রুআরিতেই। কিন্তু বাকি এগারো মাসে এই আলোচনার কোনো কার্যকরতা থাকে না। ফেব্রুআরি মাসের বক্তব্য অনেকে নীরবে সহ্যও করেন এই কারণে। বাকি এগারো মাস তো তাঁদের হাতের মুঠোয় বন্দী।

এই অবস্থায় বাঙলা ভাষা সম্পর্কে পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছে করে না। অথচ চারপাশে তাকিয়ে তারই প্রয়োজন অনুভব করি। মাত্র একমাস আগে দায়িত্বশীল এক সরকারি কর্মকর্তা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন : 'আপনার কি মনে হয় না যে, শিক্ষার মাধ্যম বাঙলা করে আমরা ভুল করেছি?'

আমার জবাব শুনে তিনি বলেছিলেন : "অবশ্য আপনি বাঙলার লোক—এই কথাই বলবেন। জাপানিরা কিন্তু এখন খুব করে ইংরেজি শিখছে। আমার তো মনে হয়, বাঙলা-বাঙলা করে আমার জাতিকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছি।"

এরকম কথা সবসময়েই কেউ না কেউ বলতেন, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার আশঙ্কা এই যে, স্বাধীন বাংলাদেশে এমন কথা বলার লোক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার ভুলও হতে পারে। তবে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের এক সক্রিয় কর্মীকেও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে এ-ধরনের কথা বলতে শুনেছি। তাই ভয় হয়।

বাঙলা ভাষা সম্পর্কে এই বক্তব্যের পরিপূরক হল বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেকের গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি। মাস ছয়েক আগে এক বিশ্বজ্জনসভায় প্রদত্ত মুদ্রিত ভাষণে আমাদের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন :

> The birth of Bangladesh on the basis of a separate linguistic cultural identity and a professed secularism incorporated in the Constitution raised new and fresh questions on the problems of Identity and her cultural links with Islam. But this commitment to Bengali nationalism and secularism

had a very brief spell and was followed by a commitment to an Ideal Islamic way of life. ১

ইতিহাসের দিকে ফিরে তিনি আরো বলেন :

When in the 19th century the elitist proponents advocated Urdu as the language of the educated Bengali Muslim, there were angry youngmen who, though devoutly Muslim, advocated the cause of the native tongue, Bangla. ২

ভয় হয়, একুশে ফেব্রুআরির রক্তদানও অচিরে রাগী নেটিভ তরুণদের কান্ড বলে গণ্য হবে।

তাই আজ আবার পুরোনো কথাগুলো নতুন করে উত্থাপন করতে চাই। একুশে ফেব্রুআরির আত্মদান কি হজুগের ফল ছিল? নাকি সমাজের বিকাশধারায় তা ছিল অবধারিত? একুশের পথ ধরে কি অনিবার্য ছিল বাংলাদেশের জন্ম? বাংলাদেশে, আমাদের স্বাধীন মাতৃভূমিতে, প্রার্থিত আসনে কি অধিষ্ঠিত হতে পারবে মাতৃভাষা?

এক

বাঙলা ভাষা সম্পর্কে আমাদের সামাজিক মনোভাবের ইতিহাস সন্ধান করতে গেলে কয়েক শ বছর পিছনে তাকিয়ে দেখতে হবে। অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামচরিত ভাষায় অনুবাদ করলে রৌরব নরকে যেতে হবে বলে এক সময়ে ব্রাহ্মণ-পন্ডিতেরা ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের মতো ব্রাহ্মণ আর মালাধর বসুর মতো কায়স্থ (উভয়েই পন্ডদশ শতাব্দীর) তা গ্রাহ্য করেন নি। কিতাবের কথা ভাষায় অনুবাদ করলে ঘাড়ে দোষ পড়বে, এমন আশঙ্কার উল্লেখ করেছিলেন শাহ্ মুহম্মদ সগীর (পন্ডদশ শতাব্দীর?) আর আবদুল নবী (সপ্তদশ শতাব্দী)। তবে সন্ধানে সেই অপ্রিয় কাজটি করেছিলেন উভয়েই। এই পটভূমিকাতেই ষোলো শতকের কবি সৈয়দ সুলতান বলেছিলেন :

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষে হয় তার অমূল্য রতন॥

তাঁর সমকালীন কবি হাজী মুহম্মদ উপদেশ দিয়েছিলেন, "দেশী ভাষা দেখি মনে না করিও ঘীণ...।" আর সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিম তো দুর্বাক্যই প্রয়োগ করেছিলেন :

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
যে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেসি ভাষা বিদ্যা যার মনে না য়য়াএ
নিজ দেস ত্যাগি কেন বিদেস না জাএ॥[৩]

আঠারো-উনিশ শতকে এ কথাটাই মধুর করে বলেছিলেন রামনিধি গুপ্ত :

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা
পুরে কি আশা?

ধ্রুপদী ভাষার প্রতি ধর্মগত তথা প্রথাসিদ্ধ ভক্তি ছাড়াও, রামনিধি গুপ্তের জীবদ্দশায়, ইংরেজি ভাষার প্রতি নতুন আকর্ষণ জেগেছিল সমাজে। তাই "দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ" দেখে দুঃখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উপদেশ দিয়েছিলেন,

জানিলে জাতীয় বিদ্যা সুখ তাহে নানা
থাকিতে উজ্জ্বল নেত্র কেন হও কানা?[৪]

জেগে যেমন বেশিক্ষণ ঘুমানো যায় না, তেমনি নেত্র উজ্জ্বল হলে বেশিক্ষণ না দেখে পারা যায় না। তাই প্রসিদ্ধি অনুযায়ী যে মধুসূদন বাংলাভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "ইট ইজ দা ল্যাঙগুয়েজ অব ফিশারমেন, আনলেস ইয়ু ইমপোর্ট লারজলি ফ্রম স্যানসক্রিট",[৫] তিনিই পরে "মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে" বলে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। তাই ইংরেজি ভাষায় পান্ডিত্যের জন্যে একদা "ইংরাজী খাঁ" নামে অভিহিত রাজনারায়ণ বসু বন্ধুদের সঙ্গে মিলে জাতীয় গৌরব সম্পাদনীসভা স্থাপন করে পয়লা জানুআরির বদলে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছিলেন এবং বাঙলা বাক্যের মধ্যে ইংরেজি শব্দব্যবহারের জন্যে এক পয়সা করে জরিমানার হার প্রবর্তন করেছিলেন।[৬]

ইংরেজিআনার এই অশুভ পরিমন্ডল থেকে যে মহাপুরুষ আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। যেকালে ইংরেজি পড়ার ধুম, সেকালে ভালো করে বাঙলা পড়ার ফলেই যে তাঁর সমস্ত মনটা চলবার শক্তি পেয়েছিল, একথা উল্লেখ করে, সেজদাদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে।[৭] আর

সেকালের স্মৃতির সঙ্গে একালের প্রয়োজন যোগ করে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন সার্ধ শতাব্দীরও আগে, এখানে তা উদ্ধৃত করি :

এমনও এক সময় ছিল যখন ইংরেজি স্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা 'বাংলা জানি নে' বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে চোকি এগিয়ে দিয়েছে। সেদিন আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাঙালির ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয় শুধু 'কেবল বাংলা ভাষা জানি' বলতে। এদিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগে নি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে।...

আমার বিষয়টা সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না, সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতৃভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোপদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাদ্বারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী?

বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি : তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেলে ধারা বাঙালিচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগ্রত পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।[৮]

দুই

ভাষা সম্পর্কে বাঙলাভাষাভাষী জনসাধারণের যে মনোভাবের ধারণা আমরা দিতে চেষ্টা করেছি, তার একটা স্থূল ধর্মভিত্তিক রূপ ছিল। সংস্কৃতের প্রতি ভক্তি যদি হিন্দু সমাজে দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে আরবি-ফারসির প্রতি শ্রদ্ধা মুসলমান সমাজের বিষয় বলে চিহ্নিত করা যায়। ইংরেজির এই ধর্মীয় ভিত্তি প্রায় ছিল না বললেই চলে. অথচ ইংরেজির প্রতি মোহাবেশ দেখা দিয়েছিল বাঙালি হিন্দু সমাজেই, উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানকে সে মোহ আক্রমণ করে নি। এর ঐতিহাসিক কারণ ছিল, এবং একই কারণে বাঙালি মুসলমান সমাজে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল উরদু নিয়ে।

একথা সুবিদিত যে, হানটার কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নওয়াব আবদুল লতিফ বলেছিলেন যে, উরদুকে বাঙলার উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলমানদের মাতৃভাষা আর বাঙলাকে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মাতৃভাষারূপে জ্ঞান করা উচিত।[৯] কিন্তু তারও প্রায় দশ বছর আগে নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই 'বঙ্গদর্শন'এর অনামা সমালোচক লিখেছিলেন :

যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে [হিন্দু-মুসলমানের] ঐক্য জন্মিবে না। কেন না, জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।[১০]

এই মনোভাব যাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, মীর মশাররফ হোসেনের পিতা আর মশাররফ হোসেনের গ্রাম্য শিক্ষক মুন্সী সাহেব ছিলেন তাঁদের মধ্যে। মশাররফ হোসেনের ভাষায় :

মুন্সী সাহেব বাঙ্গালায় অক্ষর লিখিতে জানিতেন না।...বাঙ্গালা বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চোখে দেখিতেন।...আমার পূজনীয় পিতা একটি অক্ষরও লিখিতে জানিতেন না।[১১]

এই মনোভাবের একটু বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী :

আমার স্বজাতি মোসলমান সমাজ আজি কালি শিক্ষার সম্বন্ধে অতীব পশ্চাদপদ। তাহাতে বঙ্গভাষা বা সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহাদের আগ্রহ ও তেমন অভিজ্ঞতা, অভিনিবেশ নাই, প্রকারান্তরে তৎপ্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, অমনযোগ, ঔদাসীন্য এবং অনভিজ্ঞতাই বিলক্ষণ প্রকাশ পায়।...বাঙ্গালা ভাষা স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেওয়া অধিকাংশ মোছলমানই অতীব গর্হিত বলিয়া মনে করেন।[১২]

ভাবতে অবাক লাগে যে, বাঙলা ভাষার একজন সুপরিচিত গ্রন্থকার হয়েও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ লিখতে পেরেছিলেন :

উর্দু ভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মোসলমানগণ জাতীয়তাবিহীন ও কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙ্গালা দেশের মোসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা হওয়াতে, বঙ্গীয় মোসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তাহারা জাতীয়তাবিহীন, নিস্তেজ, দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে।[১৩]

অবশ্য রেয়াজুদ্দীন আহমদের এই রচনার প্রায় এক যুগ আগে, ১৯১৫ সালে, 'আল-এসলামে'র একজন লেখক এই ধরনের মনোভাবের সমালোচনায় লিখেছিলেন :

> মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙ্গালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিম্বা 'বাঙ্গালা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি', এরূপ বলা—এই মারাত্মক রোগ কেবল একশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়।[১৪]

পরিবেশের মধ্যে এই প্রতিকূলতা ছিল বলে মাতৃভাষার পক্ষে যাঁরা প্রথম দিকে কথা বলেছিলেন, তাঁরা ছিলেন নিম্নকণ্ঠ। যেমন, 'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি'র (১৮৮৯) আখ্যাপত্রে একটি ফারসি উদ্ধৃতি আর তার বঙ্গানুবাদ ব্যবহার করে শেখ আবদুর রহিম প্রাচীন কবিদের মতোই কৈফিয়ত দিয়েছিলেন :

> ধর্মের কথা হিব্রু ভাষায় বল, আর সিরিয়ান ভাষায় বল, অথবা সত্যানুসন্ধান জাবালকা দেশে কর, আর জাবালসা দেশেই কর, তাহাতে ধর্মের বা সত্যের কোন তারতম্য হয় না।[১৫]

তেমনি, ১৯০২ সালে ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখেছিলেন :

> বর্তমান সময়ে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে।[১৬]

১৯১৬ সালে এরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই আবদুল মালেক চৌধুরীর কণ্ঠে :

> আমাদের পূর্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্থান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা।[১৭]

কিন্তু ১৯০৩ সালে 'নবনূর' খুব জোর দিয়ে বলেন :

> বঙ্গভাষা ব্যতীত বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে? যাঁহারা জোর করিয়া উর্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র।[১৮]

১৯১৫ সালে মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী লেখেন :

> বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা দিনের আলোর মতো সত্য। ভারতব্যাপী জাতীয়তাসৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হউক না কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল।[১৯]

পর বছর মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর স্পষ্টোক্তি :

> জীবিতা বাঙলাকে মৃতা মনে করিয়া উর্দুর চাদরে ঢাকিয়া রাখিবার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, বাঙলা উর্দুর চাদর গা ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া যখন উঠিবে, তখন তাহাকে চাপিয়া রাখা যাইবে না।[২০]

১৯১৭ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন :

> পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে? আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্মের নিকট মাথা নত করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই...।
>
> অনেকদিন পূর্বে উর্দু বনাম বাংলা মোকদ্দমা বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতর উঠিয়াছিল, তাহাতে বাংলার ডিক্রী হইয়া যায়। বর্তমানে আবার সেই মোকদ্দমার ছানি বিচারের জন্য উর্দু পক্ষকে সওাল জওাব করিতে শুনিতেছি।...দখল বাংলারই থাকিবে তবে উর্দু বাংলার অধীনে উপযুক্ত করে ইচ্ছাধীন প্রজাই স্বত্বে কিছু বন্দোবস্ত পাইতে পারে।[২১]

তার পরের বছরে মোহাম্মদ আকরম খাঁ বললেন :

> দুনিয়ায় অনেক রকম অদ্ভূত প্রশ্ন আছে। "বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দু না বাঙ্গালা॥" এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভূত। নারিকেল গাছে নারিকেল ফলিবে, না বেল?—বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই তাঁহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।[২২]

উরদু ভাষা নিয়ে এই প্রলম্বিত বিতর্কের পটভূমি একটু স্পষ্ট করে তোলা দরকার। আত্মপরিচয়ের ভ্রান্ত উপলব্ধি থেকে যাঁরা উরদুকে মাতৃভাষারূপে জ্ঞান করেছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন যেমন নিতান্ত অল্প, তেমনি শ্রোতাও পেয়েছিলেন নগণ্যসংখ্যক। কিন্তু উনিশ শতক থেকেই অনেকের মনে এই ধারণা কাজ করছিল যে, বাঙালি মুসলমানের জন্যে অন্তত পাঁচটি ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। ধর্মের ভাষা আরবি, সংস্কৃতির ভাষা ফারসি, সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষা উরদু, রাজভাষা ইংরেজি এবং মাতৃভাষা বাঙলা।[২৩] এতগুলো ভাষা কী করেই বা একজন শিখবে এবং কোন্ ক্রম-অনুযায়ী শিখবে, তাই ছিল ভাবনার বিষয়। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা যে বাঙলা, একথা স্বীকার করেও অনেকে উরদুকে ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমরূপে মর্যাদাদানের এবং সেই ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করলেন। ১৯১৮তে 'আল-এসলামে'র এক প্রবন্ধ-লেখক ঘোষণা করেন যে, "ভারতবাসী হিসাবে ও মুসলমান হিসাবে উরদু না শিখিবার উপায় নাই।"[২৪] আঞ্জুমান ওলামায়ে বাঙ্গালার তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতির মতে, "জাতির হিসাবে উন্নতি লাভ করিতে হইলে উরদু শিক্ষা করা কর্তব্য।"[২৫] 'আল-এসলামে'র সম্পাদকীয় মন্তব্য উরদু শিক্ষার অপরিহার্যতার ওপরে জোর দিয়েছিল।[২৬] মোহম্মদ আকরম খাঁও স্বীকার করেছিলেন যে, "ভারতবর্ষে মোছলেম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উরদুর দরকার।"[২৭] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও উরদুকে "ভারতীয় আন্তর্জনীন ভাষা" বলে অভিহিত করেই বাঙলার অধীনে "প্রজাই স্বত্বে" বন্দোবস্ত করে দেবার কথা বলেছিলেন।[২৮]

কিন্তু এ নিয়ে প্রবল আপত্তিও দেখা দিয়েছিল। 'আল এসলামে'ই ১৯১৯-এ শেখ আবদুল গফুর জালালী লেখেন : "পারসী ও উরদু ভাষার কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই।"[২৯] দু বছর পর মোহাম্মদ লুৎফর রহমান যা লেখেন, তাতে যুক্তির চেয়ে প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তিই ছিল বেশি :

> গৃহের পার্শ্বে উর্দুর কলহাসি আমরা নিত্যই শুনি, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালী মোসলমানের হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনি জাগে না।...
>
> যাঁহারা উর্দু বলিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে আমার বিশ্বাস চিত্তের প্রসারতা ও দৃষ্টির খুব অভাব।[৩০]

আর মোজাফ্ফর আহ্মদ যেন কিছুটা ক্রোধের সঙ্গেই বলেন :

> বাংলাদেশে আমরা উর্দুকে কখনও প্রশ্রয় দিতে পারি না। সখ করিয়া যিনি শিখিতে চান, শিখুন, কিন্তু উর্দু এদেশের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা নহে।[৩১]

এই প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ আরো স্পষ্ট বোঝা যায় রেয়াজুদ্দীন আহমদের খেদোক্তি থেকে :

> আমাদের নব্যশিক্ষিত তরুণ সাহিত্যিকদল আরবী-পারসীর সঙ্গে অপরিচিত। যুবকবৃন্দ উর্দু ভাষার নাম শুনিলেই নাক সিটকাইয়া থাকেন, এবং শিহরিয়া উঠেন। অনেকে উর্দু-পারসীর বিরুদ্ধে গরলোদ্গার করিতেও কুণ্ঠিত হন না।[৩২]

এই অবস্থায় ১৯২৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্যে উরদু ভাষা বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা হয়, কিন্তু প্রতিবাদের ফলে সে প্রয়াস সফল হয় নি। 'মাসিক মোহাম্মদী'র মতো রক্ষণশীল পত্রিকাও তখন প্রস্তাবিত ব্যবস্থাকে "গোদের উপর বিষফোড়া" বলে অভিহিত করেন এবং ঘোষণা করেন যে, বাঙলার মুসলমান সমাজ কখনোই তা মেনে নেবে না।[৩৩] এমনকি, মুসলিম সাহিত্যসমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে ইংরেজিতে অভ্যর্থনা সমিতির ভাষণ দিয়ে মাহমুদ হাসান বলেন :

> মাতৃভাষার চর্চা না করলে কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না।...বাংলা দেশে জোর করে উর্দুকে মাতৃভাষা করতে চাওয়ার মত আহাম্মকি আর নেই।...বাংলার মুসলমান এতদিন অনর্থক উর্দুর পিছু পিছু ছুটে মারাত্মক ভুল করেছে। তাই আজ তারা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে অনুন্নত।[৩৪]

আর এস্. ওয়াজেদ আলি খুব আশা নিয়ে লেখেন :

> উর্দু আর বাঙ্গলার কলহ এখন এক রকম শেষ হয়ে গেছে। বাঙ্গলা দেশে উর্দু ভাষা প্রচলনের চেষ্টা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের প্রয়াসের নিষ্ফলতার কথা বুঝতে পেরে, নিজেদের সংযত করে নিয়েছেন। ভবিষ্যতে আবার সে চেষ্টা যে কেউ করবে, তার বড় একটা সম্ভাবনা নাই।[৩৫]

ভাষা-বিতর্কের আরেকটা ঢেউ জেগেছিল ১৯১৮ সালে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ লিখেছিলেন, "মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষার স্থলে বরণ করা ব্যতীত কোন জাতি কখনও উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে না।"[৩৬] তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদেই কিনা জানি না, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সরোষে লিখলেন :

> বাঙলার অতিভক্ত কেহ কেহ বাঙলাকে মাত্র মাতৃভাষার আসনে বসাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলেন, বাঙলা বাঙালী মুসলমানের কেবল মাতৃভাষা নহে, জাতীয় ভাষাও বটে।...আরবী চিরকাল আমাদের জাতীয় ভাষা ছিল এবং থাকিবে, উহাকে বিদেশীয় নূতন আমদানি বলা কখনই সঙ্গত হইবে না।[৩৭]

কিন্তু সর্ষের মধ্যেই ভূত দেখা গেল। ঐ প্রবন্ধ ছাপিয়ে সম্পাদক টীকা সংযোজন করে বললেন :

> বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা দেশের সমগ্র অধিবাসীর জাতীয় ভাষা।...আমরা আরবী ভাষাকে আমাদের ন্যাশন্যাল

লাঙ্গুয়েজ বলিতে কিছুতেই রাজী নহি। উহা ত চিরদিন আমাদের ইউনিভারস্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ (বিশ্ব-ভাষা) হইয়াই আছে।[৫৮]

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এই বিতর্কের জের টানেন 'আল-এসলাম' পত্রিকায় আর ওই মন্তব্যের জন্যে দায়ী করেন মোহাম্মদ মোজাম্মেল হককে।[৫৯] কেননা, তিনি দেখালেন, পত্রিকার অপর সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এর আগেই আরবিকে মুসলমান জাতির জাতীয় ভাষা বলে অভিহিত করেছিলেন।[৬০] ওয়াজেদ আলী নিজের বক্তব্যের সমর্থনে আকরম খাঁকেও উদ্ধৃত করলেন : "মুছলমানের জাতীয় ভাষা যে আরবী, একথা ভুলিলে মুছলমানের সর্বনাশ হইবে।"[৬১]

কিন্তু যে-বিষয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং আরো অনেকের সম্পূর্ণ মতৈক্য ছিল, তা শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে। মাতৃভাষাই যে শিক্ষার সকল স্তরের বাহন হওয়া উচিত, শুধু সেকথা বলেই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি, অন্তত ১৯১৮ সাল থেকে বারংবার তার বাস্তব প্রয়োগ দাবি করেছিলেন।[৬২] বাঙলাভাষী ছাত্রদেরকে উর্দু-মাধ্যমে মাদ্রাসা-শিক্ষাদানের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে 'সওগাত' পত্রিকা প্রতিবাদ জানান ১৯২৬-এ।[৬৩] মাতৃ-ভাষাকে সকল পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার জন্যে 'শিখা'-গোষ্ঠীও সংগঠিত আন্দোলন চালিয়ে-ছিলেন ওই সময় থেকেই।[৬৪]

এই পটভূমিকায় এটা মোটেও আশ্চর্যজনক ছিল না যে, রামের জন্মের আগে রামায়ণের মতো, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার আগেই তার রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি আলোচিত হয়। মাউনটব্যাটেন-পরিকল্পনা ঘোষণার পরই আবদুল হক আর মাহবুব জামাল জাহেদীর মতো তরুণ লেখক এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতো প্রবীণ শিক্ষাবিদ দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলাকে স্বীকৃতি দানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন, 'মিল্লাত' ও 'ইত্তেহাদ' পত্রিকা সেই মত প্রকাশ করেন এবং গণ-আজাদী লীগের ঘোষণাপত্রে এই দাবি লিপিবদ্ধ হয়। আর কয়েকমাসের মধ্যেই কাজী মোতাহার হোসেন ও মুহম্মদ এনামুল হক, ফররুক আহমদ ও আবুল মনসুর আহমদ এই দাবির পক্ষে লেখেন ; তমদ্দুন মজলিস সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ১৯৪৭-এর অকটোবর মাসে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ্ গঠিত হয়।[৬৫]

এমনি করে দীর্ঘকালের ভিত্তির ওপরে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ইমারত ধীরে ধীরে মাথা তোলে।

তিন

রাষ্ট্রভাষার যে-আন্দোলন ১৯৪৭ সালে অঙ্কুরিত হয়েছিল, ১৯৫২ সালে তা পরিণত হয় মহীরুহে। একুশে ফেব্রুআরির মহৎ আত্মদানের পরে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলার দাবি আর উপেক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। সম্ভবপর ছিল শুধু তার কার্যকরতা বিলম্বিত করা। সে চেষ্টার ত্রুটি হয় নি।

বায়ান্নো সালের ভাষা-আন্দোলন কিন্তু আমাদের চেতনার অনেকগুলো দিক পরিপুষ্ট করেছিল। বিশে ফেব্রুআরি পর্যন্ত বাঙলা ভাষার দাবি যাদেরকে তেমন করে স্পর্শ করতে সমর্থ হয় নি, সরকারের চণ্ডনীতি তাদের অস্তিত্বের মূল ধরে টান দিয়েছিল। রূঢ় আঘাতের চরম বেদনার মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদের বাঙালি সত্তা সম্পর্কে সজাগ হয়েছিলাম। পরে যতই সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ঘটেছে, আমাদের বাঙালিত্ব ততই প্রবল হয়েছে।

এই বাঙালি সত্তার অপরিহার্য অংশ ছিল অসাম্প্রদায়িক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ ভাষা-আন্দোলনেরই মহৎ অবদান। ১৯৫২ সালের শুরুতে যুবলীগ ছাড়া দেশে কোনো অসাম্প্রদায়িক জন-সংগঠন ছিল না। একুশে ফেব্রুআরির পরে ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম হয়, গণতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা ঘটে। উভয়েরই দ্বার সকল ধর্মের মানুষের জন্যে খোলা ছিল। তারপরে মুসলিম ছাত্রলীগ পরিণত হয় ছাত্রলীগে, আওয়ামী মুসলিম লীগ হয় আওয়ামী লীগ। আর নতুন যেসব উল্লেখযোগ্য সংগঠন আর রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল স্ত্রী-পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল।

ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল গণতান্ত্রিক আদর্শ। সকল ভাষার সমান মর্যাদার কথা সেদিন বারে বারে বলা হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই ধ্বনিতে বোঝানো হয়েছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বাঙলার স্বীকৃতি চাই। এ আন্দোলন কোনো ভাষা বা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল না। সকল নাগরিকের অধিকারের স্বীকৃতি এর মাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল।

কিন্তু এইসব প্রবণতার সঙ্গে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতির কোনো মিল ছিল না। সেই নীতি আশ্রয় করে-ছিল অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক আধিপত্য, অর্থ-নৈতিক বৈষম্য এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। পূর্ব বাঙলার মানুষের চেতনার সঙ্গে তার বিরোধ হয়ে পড়ে-ছিল অপরিহার্য। পরিণামে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোই ভেঙে পড়ে।

অনেক আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। সেদিন রাষ্ট্রের মূল নীতি নির্ধারিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। তেরো বছর পরে এর একটিও আর অক্ষুণ্ণ নেই। আমরা বারবার করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি শুনি ; 'জয় বাংলা' ধ্বনির সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদ অন্তর্হিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের আদর্শ পরিত্যক্ত ; ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে এখন আমরা ধর্মীয় আদর্শের কথা বলছি। বাংলাদেশ নামটা আছে, কিন্তু এ কোন্ বাংলাদেশ? বাংলাদেশ নামটা থাকবে। কিন্তু তা বাংলাদেশ হবে, না ক্ষুদ্রতর পাকিস্তানে পরিণত হবে, তা নির্ভর করবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ আমরা কতটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পারব, তার উপর। বাংলাদেশ হবে কিনা, তা নির্ভর করবে জীবনের সকল স্তরে মাতৃভাষার প্রয়োগ কতখানি সফল হচ্ছে, তার উপর।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার অল্প সময়ের মধ্যে আমরা বাঙলায় সংবিধান রচনা করেছিলাম, পরিকল্পনার দলিলগুলো বাঙলায় তৈরি করেছিলাম। তারপর আবার এমন সময় এসেছে, যখন রাষ্ট্রের উচ্চতম পর্যায়ে ইংরেজিতে কাগজপত্র পেশ করার নির্দেশ এসেছিল, সংবিধানের সংশোধনী রচিত হয়েছিল ইংরেজিতে। বাঙলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা অনেকখানি পিছনে হেঁটে গিয়েছিলাম। জনগণের সচেতন প্রতিবাদ ছিল এই বিপরীতমুখী যাত্রায়। এর একটা সুফলও ফলেছে। বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন ও পুনর্গঠন মন্ত্রণালয় বাঙলাভাষা বাস্তবায়ন সেল গঠন করেছেন। এই সেল ১৯৮৪ সালের ফেব্রুআরি মাসে সরকারী কাজের সকল স্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের কর্মসূচী—প্রথম পর্যায়' প্রকাশ করেছেন। এই কর্মসূচী অভিনন্দনযোগ্য। আমার মনে হয়েছে, এটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত, গঠন-মূলক কর্মসূচী। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার সন্দেহও হয়েছে যে, এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথে যেসব বাধা আছে, তা আমরা দূর করতে পারব কি না।

সরকারি কাজের বাইরেও তো প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্র, আইন-আদালত, ব্যাংক। সব জায়গায় কিছু অগ্রগতি যে হয় নি, তা নয়। কিন্তু বেশিদূর এগোনো যায় নি।

কেন এমন হয়? কোথায় ত্রুটি? বাঙলা ভাষার? না, আমাদের আয়োজনের? ইতিহাসের দিকে একটু ফিরে তাকানো যাক।

চার

জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় আজ আমরা বাঙলা ভাষার প্রয়োগ দাবি করছি। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, এই কাজ আমরাই প্রথম করতে যাচ্ছি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জীবনে এবং জ্ঞান-চর্চায় এক সময়ে বেশ সংগঠিতভাবে বাঙলা ভাষার ব্যবহার করা হয়েছিল। বাংলাদেশের শাসনকর্তাদের সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যের শাসকদের বাঙলায় পত্র-বিনিময়ের একটা ধারা যোলো থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত লক্ষ করা যায়।[৬৬] ১৭৮৫ থেকে অন্তত ১৮৫৫ পর্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় দেশের সকল প্রচলিত আইনের অনুবাদ হয়ে এসেছে বাঙলা ভাষায়। উনিশ শতকের শুরু থেকে বাঙলা ভাষায় নানারকম জ্ঞানের বই রচিত আর অনূদিত, পঠিত আর ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

কিভাবে এমন হতে পেরেছিল এবং কেনই বা তার স্রোত ব্যাহত হল, সে বিষয়টি আলোচনার যোগ্য। একক প্রচেষ্টা তথা ব্যক্তিগত সামর্থ্যের মূল্য স্বীকার করেও বলব যে, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ যেমন এই ধারাকে বেগবান করে তুলেছিল, তেমনি তার অভাব এই ধারাকে লুপ্ত করে। কথাটা ভেঙে বলা দরকার। আইনের অনুবাদের কথা ধরা যাক। আইনের অনুবাদ যে অত আগে শুরু হয়েছিল, তার মূলে ছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে গৃহীত কোম্পানি-প্রশাসনের বা সপারিষদ

গভরনর-জেনারেলের নীতি আর উদ্যোগ। কলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠার পরে যখন নতুন করে দেওয়ানি, ফৌজদারি এবং রাজস্ব আইন প্রণীত হতে থাকল, তখন এটা স্থির হয় যে, সপ্তে-সপ্তে ফারসি আর বাঙলা ভাষায় এসব আইনের অনুবাদ প্রকাশ করা দরকার।[৪৭] অতএব, শুরু হল অনুবাদ। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন রাজভাষা হিসেবে ফারসির আসন আর রইল না, তখন ১৮৩৮ সালের ২৩শে জানুআরি সরকার এক নির্দেশ জারি করে বললেন :

...ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্যে পারস্য ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবে এবং এই-রূপ পরিবর্তনকরণার্থ ১ জানুআরি তারিখ অবধি ১২ মাস নির্দিষ্ট হইল।...

শ্রীলশ্রীযুক্তের জ্ঞাপনার্থে এই নিয়ম সম্পাদননিমিত্ত যেরূপ উদ্যোগ হইয়াছে তাহার এক রিপোর্ট আগামি ১ জুলাই তারিখে এবং তৎপরে ১৮৩৯ সালের ১ জানুআরি তারিখে দিতে হইবে।...[৪৮]

অর্থাৎ ফারসি থেকে বাঙলায় পরিবর্তনের জন্যে সময় দেওয়া হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে এক বছরেরও কম এবং দাবি করা হয়েছিল ছ মাসের কিস্তিতে অগ্রগতির প্রতিবেদন। শুধু তাই নয়। আরেকটি আদেশ জারি করে বলা হয় যে, "দেশীয় প্রত্যেক জিলায় কোন আমলা দেশীয় ভাষায় সুবিজ্ঞ না হইলে তাঁহাকে কর্মযোগ্য বোধ করা যাইবে না।"[৪৯] এভাবে আদালতে বাঙলা ভাষা যে চালু হল, নিম্ন আদালতে আজও তা বহাল রয়ে গেছে।

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দুটি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এর মধ্যে প্রথম হচ্ছে ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, এবং অপরটি ১৮১৮ সালে স্থাপিত শ্রীরামপুর কলেজ। বাঙলা ভাষায় সাহিত্য আর ইতিহাস, দর্শন আর ধর্ম, ব্যাকরণ আর অভিধান, তত্ত্বীয় আর ব্যবহারিক বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বইপত্র এবং বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশের সমস্ত এবং সচেতন প্রয়াস এঁরা নিয়েছিলেন। বাঙলা ভাষার মাধ্যমে দেশীয় এবং ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দেখা দেয়। যেমন, গৌড়ীয় সমাজ (১৮২৩), অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৮), সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা (১৮৩২), সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮), তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), বেথুন সোসাইটি (১৮৫১), বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (১৮৫১), আর বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা (১৮৬৭)।[৫০] এসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মধ্যে প্রকাশনার ক্ষেত্রে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ বা ভারনাকুলার লিটারেচার কমিটি (পরে সোসাইটি)—যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, দ্য রিসোরসেস অব দ্য বেঙ্গালি ল্যাঙ্গুয়েজ আর অনবডনডেড—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৫১]

এইসব সরকারি আর বেসরকারি উদ্যোগের ফল কী হয়েছিল, দেখা যাক। আইনের প্রথম অনুবাদ করেন জোনাথন ডানকান, ১৭৮৫ সালে। পরিভাষাও নিজে তৈরি করে নেন। ডানকান, মেয়ার, এডমনস্টোন, ফরস্টার এবং অন্যেরা আইনের উনিশটি অনুবাদ প্রকাশ করেন আঠারো শতকেই। পরিভাষায় কিছু-কিছু পার্থক্য হয়েছিল একজনের সঙ্গে অন্যের। পরে কিন্তু এই পার্থক্য দূর হয়ে যায়।[৫২] উনিশ শতকের শেষার্ধে বেসরকারি উদ্যোগে আইন-সংক্রান্ত কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা দেখা যায়। ১৮৬৭তে বাঙলায় সাপ্তাহিক ল রিপোর্ট প্রকাশ করেন অভয়বন্ধু বসু। তা ছাড়া, আইনের ব্যাখ্যামূলক বইও বের হতে থাকে। যেমন, আশুতোষ বিশ্বাসের 'ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন' (১৮৯৩), যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইন' (১৮৯৩), নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন' (১৮৯৪) এবং রজনীকান্ত সেন ও ডি. এন. মিত্রের 'মহম্মদীয় আইন' (১৮৯৮)।[৫৩]

দেশী ভাষায় স্কুলের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন তথা প্রকাশের জন্যে ১৮১৭ সালে কলকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী পঁচিশ বছর ধরে তাঁরা বহু বই প্রকাশ করতে থাকেন। মুখ্যত এই সোসাইটির সম্পাদক উইলিয়ম ইয়েটসের পরামর্শেই কোম্পানি-সরকার কাউনসিল অব এডুকেশনের একটি উপসংঘ গঠন করেন সেকশন অব দ্য কাউনসিল অব এডুকেশন ফর দ্য প্রিপেয়ারেশন অব ভারনাকুলার বুকস নামে, বোধহয় ১৮৪০-এর দিকে। ইয়েটসের প্রস্তাব ছিল এই যে, বিভিন্ন শ্রেণীর জন্যে আগে ইংরেজিতে পাঠ্যবই সংকলন করা হবে, তারপর এই উপসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে সেসবের অনুবাদ

করা হবে বাঙলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষায়। সেই-অনুযায়ী কাজ হয়েছিল।[৫৪] সোসাইটি ও কাউনসিলের তৎপরতার ফলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এবং তারপরও কিছুকাল ধরে বাঙলা পাঠ্যবইয়ের কোনো অভাব হয় নি।

অন্যদিকে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্যোগে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডকটর জোশুয়া মারশম্যানের নেতৃত্বে পরিচালিত এই কলেজে পরে প্রাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান তাঁর পুত্র জন ক্লার্ক মারশম্যান আর পাদরি জন ম্যাক। জন ম্যাক পরে লিখেছিলেন,

"For be it understood, the native youth of India are those for whom we chiefly labour; and their own tongue is the great instrument by which we hope to enlighten them."

এই নীতির অনুসরণে জে. সি. মারশম্যান ইতিহাস বিষয়ে এবং জন ম্যাক বিজ্ঞান-বিষয়ে বাঙলা পাঠ্যবই রচনায় অগ্রসর হন। জন ম্যাকের নেতৃত্বে বাঙলা ভাষায় প্রথম মানচিত্র রচিত আর প্রচারিত হয়, এ কথাটা যেমন মনে রাখার যোগ্য, তেমনি বাঙলা ভাষার মাধ্যমে প্রথম বিজ্ঞান পড়াবার কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য।[৫৫]

স্কুল বুক সোসাইটি এবং শ্রীরামপুর কলেজের উদ্যোগে রচিত পাঠ্যপুস্তকের আদর্শ অন্যেরাও গ্রহণ করেছিলেন। তাই তেমন বই লেখা হয়েছিল যথেষ্ট। তবে পাঠ্যবই বলতে সেকালে বেশ উন্নত মানের গ্রন্থ বোঝাত, বিশ্বকোষও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্বকোষ-জাতীয় অন্তত তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার পঞ্চম সংস্করণ-অবলম্বনে ফেলিকস কেরী মাসে-মাসে 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮১৯-২০) প্রচার করতে থাকেন। এর প্রথম গ্রন্থ, ৬৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা' ছিল শারীরতত্ত্ব-বিষয়ক প্রথম বাঙলা বই। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'স্মৃতিশাস্ত্র' ছিল ব্যবহারশাস্ত্রীয় পুস্তক; এটি অংশত প্রকাশিত হবার পরে গ্রন্থকারের মৃত্যু হয়। রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' (১৮১৯-৫৮) এর সমসাময়িক, তবে তা প্রকাশিত হয় আট খণ্ডে। আর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তেরো খণ্ডে প্রকাশ করেন 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৮৪৬-৫১)।

তবে বিজ্ঞান-বিষয়ে প্রথম বাঙলা বই বেরিয়েছিল 'বিদ্যাহারাবলী' প্রকাশেরও আগে। ১৮১৫-তে প্রকাশিত উইলিয়ম ইয়েটসের 'পদার্থবিদ্যাসার' ছিল প্রকৃতিবিজ্ঞান-বিষয়ক বই। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়' এর সমসাময়িক বলে মনে করি, কেননা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৮১৯-এ। লক্ষ করা যাবে যে, ভূগোল কথাটা তখনও প্রচলিত হয় নি, ওই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে গোলাধ্যায়। কিন্তু এরপর জে. ডি. পীয়ারসন যখন একই বিষয়ের বই লেখেন, তখন তিনি তার নাম দেন 'ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ে কথোপকথন' (দ্বি-স ১৮২৭)। ডরিউ. এইচ. পীয়ারসের 'ভূগোল-বৃত্তান্ত' ছাপা হয় ১৮২৮-এ। তারপর পাই অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভূগোল' (১৮৪৮) এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'প্রাকৃত ভূগোল' (১৮৫৪)।

উইলিয়ম ইয়েটসের 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩৩) ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রসায়ন-বিষয়ে প্রথম বাঙলা বই ছিল জন ম্যাকের 'কিমিয়াবিদ্যা-সার' (১৮৩৪)। অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছিলেন 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬)।

ভেষজবিজ্ঞানের প্রথম বই লেখেন রামকমল সেন। ১৮১৯-এ প্রকাশিত 'ঔষধসারসংগ্রহে' তিনি ৫৫টি ওষুধের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রথম পরিভাষা-গ্রন্থ রচনা করেন পীটার ব্রিটন : এ ভোকাবুলারি অব দ্য ভেরিয়াস পার্টস অব দ্য হিউম্যান বডি অ্যানড মেডিক্যাল অ্যানড টেকনিক্যাল টারমস (১৮২৫)। পরে, ১৮৯৯তে, হরিপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রকাশ করেছিলেন 'ডাক্তারি অভিধান'। তার আগে, মধুসূদন গুপ্ত ('লন্ডন ফার্মাকোপিয়া', ১৮৯৯; 'আনাটোমী', ১৮৫৩), আমচরণ খাস্তগীর ('মানব জন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা' ১৮৬৮), কাশীচন্দ্র গুপ্ত ('অস্থাচিকিৎসা', ১৮৮১), জহিরুদ্দীন আহমদ ('অস্থ্য-চিকিৎসা', দ্বি-স ১৮৯০), নীলরত্ন অধিকারী ('নর-শরীর-বিধান', ১৮৮৭) এবং রাধাগোবিন্দ কর ('সংক্ষিপ্ত শারীরতত্ত্ব', ১৮৯৩; 'ভিষগ্বন্ধু', ১৮৯৭; 'রোগী পরিচর্যা', ১৮৯৭; 'সংক্ষিপ্ত ভেষজ তত্ত্ব বা মেটেরিয়া মেডিকা', ১৮৯৭) প্রমুখ বিখ্যাত চিকিৎসক এবং স্বরূপ-পরিচিত বিশেষজ্ঞেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের সকল শাখায় বাঙলায় গ্রন্থ রচনা করেন।[৫৬]

তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি শুধু দেখাতে

চেয়েছি যে, ব্যবহারিক জীবনে আর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষার ব্যবহার এক সময়ে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই স্রোতে ভাটা পড়ল কেন, তা সঠিক নির্ধারণ করার উপায় নেই। তবে, আমার অনুমান এই যে, দেশের শাসনভার কোম্পানির কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে মহারানির তত্ত্বাবধানে যাবার পরে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া, একই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটায় এবং তার অধীনে ইংরেজি-মাধ্যমে পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় বাঙলা বইপত্রের সমাদর কমে যায়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, মাত্র ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

অতএব, এমন একটা সময় আসল, যখন আমরা মনে করতে শুরু করলাম যে, ইংরেজি ভাষার মাধ্যম ছাড়া সরকারি কাজকর্ম করা অসম্ভব, শিক্ষাদান অচল এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। গভীর দুঃখ এবং ক্ষোভের সঙ্গে তাই রবীন্দ্রনাথকে একদিন বলতে হয়েছিল :

> আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই—তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সার্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না।...
>
> বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।
>
> এ পর্যন্ত এ অসুবিধাটাকে আমাদের অসুখ বলিয়া বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম।...
>
> আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে?...
>
> মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক—সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?
>
> বলা বাহুল্য ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই—শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসি জার্মান শিখিলে আরও ভালো। সেই সঙ্গে একথাও বলা বাহুল্য অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্‌মুখে বলা যায়।...
>
> আমি জানি তর্ক এই উঠিবে তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সেকথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে,—কিংবা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্ঠকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।
>
> বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।...
>
> জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যেসকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করিতেছে।
>
> দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।
>
> তার ফল হইয়াছে, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চ অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে,—তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজাউজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি।...
>
> সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—"আমরা চাই!" এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশের যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেশে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্রে মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?[৭৭]

সত্তর বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর দেবার ভার আজকের বাংলাদেশের। এই সত্তর বছরে পৃথিবী যেমন অনেক এগিয়েছে, তেমনি অনেক বদল হয়েছে আমাদের দেশের। রবীন্দ্রনাথ যা জানতেন না, তা আমরা জানি। যেখানে দাঁড়িয়ে এখন কথা বলছি, তার অদূরে বাঙলা ভাষার মর্যাদারক্ষার জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন দেশের বীর সন্তানেরা। দেশ স্বাধীন করার জন্যে অগণিত নরনারী প্রাণ দিয়েছেন, সম্ভ্রম হারিয়েছেন। তাঁদের আত্মদান তো বৃথা যেতে পারে না। তাঁদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের, আমাদেরই কর্তব্য জীবনের সকল স্তরে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই দায়িত্বপালনের শপথই তাঁদের কাছে আমাদের মহৎ অঙ্গীকার।*

---

* ১৯৮৬ সালের ১৫ ফেব্রুআরিতে বাংলা একাডেমীতে প্রদত্ত 'অমর একুশে বক্তৃতা'।

১ M. Abdul Aziz Khan, *Presidential Address*, Workshop on Bangladesh : History, Society and Culture (Dhaka, 1984), p. 1.

২ ঐ, p 4.

৩ পূর্ণ উদ্ধৃতির জন্যে দ্রষ্টব্য আহমদ শরীফ, 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ' (ঢাকা, ১৯৭৭), পৃ. ৮১-৮৩।

৪ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), 'আমাদের মাতৃভাষা-চেতনা ও ভাষা আন্দোলন' (ঢাকা, ১৯৮৪), পৃ. ২২-২৪ দ্রষ্টব্য।

৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মধুসূদন দত্ত' (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ; চতুর্থ সং ; কলিকাতা, ১৩৬২), পৃ. ৩৩।

৬ রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত' (তৃ-স ; কলিকাতা, ১৯৫২), পৃ. ৮১।

৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৭ (পুনর্‌মুদ্রণ ; কলিকাতা, ১৩৬১), পৃ. ২৯৮।

৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষা' (পুনর্‌মুদ্রণ ; কলিকাতা, ১৯৭৩), পৃ. ২২৩।

৯ Enamul Haque, *Nawab Bahadur Abdul Latif* [:] *His Writings and Related Documents* (Dacca, 1968), p. 225.

১০ 'বঙ্গদর্শন', পৌষ ১২৮০।

১১ মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবন' (কলিকাতা, ১৩১৫), পৃ. ১০৩-৪।

১২ আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী, 'উদাসী' (টাঙ্গাইল, ১৯০০), ভূমিকা।

১৩ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, 'হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (ছালঃ)-এর জীবনচরিত' (কলিকাতা, ১৩৩৪), ভূমিকা।

১৪ খাদেমোল এস্‌লাম বঙ্গবাসী, "বাঙ্গালীর মাতৃভাষা", 'আল এস্‌লাম', কার্তিক ১৩২২।

১৫ শেখ আবদুর রহিম, 'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম-নীতি' (কলিকাতা, ১২৯৬), আখ্যাপত্র।

১৬ এ, এম, এসমাইল হোসেন সিরাজী, "মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি", 'ইসলাম-প্রচারক', জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯০২।

১৭ আবদুল মালেক চৌধুরী, "বঙ্গসাহিত্যে শ্রীহট্টের মুসলমান", 'আল-এসলাম', আশ্বিন ১৩২৩।

১৮ "মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান", 'নবনূর', পৌষ ১৩১০।

১৯ মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, "বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য", 'কোহিনূর', মাঘ ১৩২২।

২০ মোহাম্মাদ ওয়াজেদ আলী, "সাহিত্য-প্রসঙ্গ", 'আল এসলাম', মাঘ ১৩২৩।

২১ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, "দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ", 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', বৈশাখ ১৩২৫।

২২ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, "তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ", 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', মাঘ ১৩২৫।

২৩ যেমন, নওসের আলী খাঁ ইউসফজী, 'বঙ্গীয় মুসলমান' (কলিকাতা, ১২৯৭), পৃ. ৩৪ ; 'মিহির ও সুধাকর', ৮ পৌষ ১৩০৬।

২৪ বশারত আলী, "উর্দু-সমস্যা", 'আল-এসলাম', অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

২৫ গোলাম কাদের, "আঞ্জুমনে-ওলামার তৃতীয় অধিবেশনের চট্টগ্রাম অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ", 'আল-এসলাম', ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৫।

২৯ 'আল-এসলাম', আষাঢ় ১৩২৬ [শেখ আবদুল গফুর জালালীর প্রবন্ধের টীকা]।

২৭ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত।

২৮ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত।

২৯ শেখ আবদুল গফুর জালালী, "শিক্ষাবিস্তারের উপায়", 'আল-এসলাম', আষাঢ় ১৩২৬।

৩০ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, "উর্দু ও বাঙ্গালা সাহিত্য', 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', বৈশাখ ১৩২৮।

৩১ মোজাফ্ফর আহম্মদ, "উর্দু ভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান", 'আল-এসলাম', শ্রাবণ ১৩২৬ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত) পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

৩২ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত।

৩৩ "আলোচনা", 'মাসিক মোহাম্মদী', মাঘ ১৩৩৫।

৩৪ মাহমুদ হাসান, "অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ", 'শিখা', দ্বিতীয় বর্ষ, ১৯২৮।

৩৫ এস, ওয়াজেদ আলি, "বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা", 'মাসিক মোহাম্মদী', বৈশাখ ১৩৩৫।

৩৬ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান", 'আল-এসলাম', আশ্বিন ১৩২৫।

৩৭ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "বাঙলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য", 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা', মাঘ ১৩২৫।

৩৮ ঐ, সম্পাদকের টীকা।

৩৯ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "বাঙ্গালা ভাষা ও মোছলমান সাহিত্য", 'আল-এসলাম', ফাল্গুনে-চৈত্র ১৩২৫।

৪০ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, "ইসলামের আদর্শ ও আমাদের আশা", 'আল-এসলাম', পৌষ ১৩২৫।

৪১ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত।

৪২ যেমন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, পূর্বোক্ত ; মোহম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত ; মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত অভিভাষণ।

৪৩ "বিবিধ প্রসঙ্গ", 'সওগাত', আষাঢ় ১৩৩৩।

৪৪ "শিখা", ১৩৩৩, দ্রষ্টব্য।

৪৫ বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য আবদুল হক, 'ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব' (ঢাকা, ১৯৭৬) এবং বদরুদ্দীন উমর, 'পূর্ব বাংলার ভাষাআন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' (ঢাকা, ১৯৭০।

৪৬ আনিসুজ্জামান, 'পুরোনো বাংলা গদ্য' (ঢাকা, ১৯৮১), পৃ. ৩৮-৪০ ; ৪৩-৪৬ দ্রষ্টব্য।

৪৭ Bengal Revenue Consultations, Range 50, vol. 39. f. 397.

৪৮ সমাচার দর্পণ, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (তৃ-স ; কলিকাতা, ১৩৫৬), পৃ. ২২২।

৪৯ সমাচার দর্পণ, ২২ জুলাই ১৮৩৭। ঐ, পৃ. ২২১।

৫০ বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বাংলার নবা-সংস্কৃতি' (কলিকাতা, ১৯৫৮) দ্রষ্টব্য।

৫১ বিস্তৃত আলোচনার জন্য যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বঙ্গসংস্কৃতির কথা' (কলিকাতা, ১৯৭১), পৃ. ৫৫-৮৬ দ্রষ্টব্য।

৫২ বাংলার আইনবিষয়ক রচনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য পূর্ণেন্দু-নাথ নাথ, 'বাংলাভাষায় আইনচর্চার ধারা' (কলিকাতা, ১৯৮৪) দ্রষ্টব্য।

৫৩ মুনতাসীর মামুন, "বাংলা বইয়ের নির্বাচিত পঞ্জি ১৯ শতক" 'পরিচয়', বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯।

৫৪ যোগেশচন্দ্র বাগল, 'উইলিয়ম ইয়েট্স, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত' (কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃ. ১৫-১৮।

৫৫ ঐ, পৃ. ৪৭-৪৮ ও ৫৪।

৫৬ এইসব বইয়ের বিবরণ সংকলিত হয়েছে প্রধানতঃ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (তৃ-স ; কলিকাতা, ১৩৫৬) থেকে ; যোগেশচন্দ্র বাগলের সর্বশেষোক্ত বই এবং মুনতাসীর মামুনের পূর্বোক্ত রচনাপঞ্জী থেকেও কিছু তথ্য গৃহীত হয়েছে।

৫৭ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', অষ্টাদশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা, ১৩৬১), পৃ. ৪৯১-৫১২।

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

সেলিনা হোসেন

ভেড়িবাঁধের যে জায়গাটা বেশ খানিকটা ভেঙে নীচের দিকে নেমে প্রায় সমতলে মিলেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে বাতাসে গতি আঁচ করে মালেক। সব ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ ক'রে অনুভব করে উত্তুরে বাতাসের আগমন। অঘ্রান এলেই মালেকের নেশায় টান পড়ে। সারা বছর খিদে ভরাতে কতরকম কাজই তো করতে হয়, কিন্তু হাঙর ধরার নেশা ওকে একদম থিতুবিতু করে ফেলে। রক্তে উথলে ওঠে গরম স্রোতের টগবগানি—মনে হয়, শরীরে গিটগুলো বুঝি আলগা হয়ে যাচ্ছে। মালেকের বুকের ভেতর দারুণ শব্দের উরউরি। ও এলোপাথাড়ি হাঁটতে থাকে। তখনি ভেড়িবাঁধের ওপর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে টেকনাফ থেকে খোলা জীপটা এসে দাঁড়ায়। নোয়াব পাকা ড্রাইভার, টাল সামলে দারুণ চালায়, ঝাঁকুনি কম। মালেক দেখল তোরাব আলী নামছে, হাতে ছাতা। ঢালু বেয়ে উপরে উঠতে হাঁফিয়ে যায়। কাছে এসে মালেককে বলে, কালুয়া ব্যানে আসিস। কাম আছে। ও ঘাড় কাত করে। শাহপরি দ্বীপে হাঙর ধরার বড়ো নৌকাটাই তোরাব আলীর। ওর রক্তের টানের কথা তোরাব আলী জানে, সেজন্য পয়সাকড়ি ইচ্ছেমতো দেয়। শুধু ওই টানটুকুর জন্যে মালেক প্রতিবাদ করে না। ভেড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে ও। জীপটা ঘড়ঘড় শব্দ করে ফিরে যাচ্ছে। নোয়াবের জীপ নয়, নইলে টেকনাফ চলে যেত, রাত কাটিয়ে আসত। ভেড়িবাঁধের ওপর দিয়ে টেকনাফ পর্যন্ত এই ন মাইল রাস্তা ওর ভীষণ প্রিয়। ডানে প্যারা-বন, গাছের ফাঁকে নাফের নীল জল, ওপারে কুয়াশা-জড়ানো মুণ্ডো শহরের পাহাড়ের মাথা। বামে ধানখেত, আরো পরে নারকেল-সুপারির সারি। স্লুইসগেট পেরিয়ে গেলে মৌসুমে লবণের খেত, বর্ষায় সে জমিতে হয় চিংড়ির চাষ। আরো সামনে মরিচের খেত, সবুজ গাছে লাল মরিচের দৃশ্যে বুক জুড়িয়ে যায়। মালেক কখনো খেতের পাশে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মৌসুমে সাফিয়া মরিচ তোলার কাজ করে। ঠা-ঠা রোদে ওর বুকে-পিঠে দরদরিয়ে ঘাম নামলে ও আলের ওপর পা ছড়িয়ে চুরুট টানে। থাক এসব কথা, ও ছবিগুলো ঝেড়ে ফেলে।

হাঁটতে-হাঁটতে ভেড়ির শেষ মাথায় এসে দাঁড়ায় মালেক। ডানে বি. ডি. আর. ক্যাম্পের ছোট্ট ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে সব সময় পাহারা দেয় একজন সৈনিক।

চোখে চোখ পড়লে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়, কথা বলে না। অথচ ডিউটির বাইরে বন্ধু, আন্তরিকতায় হাত বাড়িয়ে দেয়। কতজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, কতজন বদলি হয়ে চলে গেল তার হিসেব ওর মনে নেই। কেউ স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে, কেউ ঝাপসা, কেউ একদম মুছে নিঃশেষ।

অনেকগুলো ট্রলার এসে থেমেছে। ছেলেমেয়েরা হৈ-চৈ করে মাছ কুড়োচ্ছে। একদিন ও আর রানী টেকনাফের সমুদ্রসৈকতে বালুর ওপর শুয়ে ছিল, চাঁদনি রাতের ঝকঝকে আলোয়। কিছু স্মৃতি মনের মধ্যে একদম গেঁথে থাকে। সেদিনের হুটোপুটি, হৈ-চৈ, হাসি-আনন্দ আর কোনোদিন ফিরে আসে নি। রানী ঠিক বাজারের মেয়েমানুষ নয়, একটু অন্যরকম। ওর মনে কষ্ট আছে, ঘরবাঁধার স্বপ্ন আছে, ভালোবাসা পেলে ও বর্তে যায়। আর দশটা মেয়েমানুষের মতো শুধু পয়সা ওকে টেনে রাখতে পারে না। ও উড়াল দেয়, সেজন্য ও মরবেই, ওকে মরতেই হবে। বুকের মধ্যে অত উথাল-পাথাল নিয়ে বাজারের মেয়েমানুষ হওয়া যায় না। রানী কেন অন্যরকম হল? না হলেই তো যে অবস্থায় আছে সেখানেই হেসেখেলে কাটিয়ে দিতে পারত। বুঝত ওদের শরীর তো জোয়ারভাটার খেলা। জোয়ারে ডগডগি, ভাটিতে থিতুবিতু। কাকঠুকরি গাছে লাথি দিয়ে অকারণে একদলা থুথু ফেলে। রানী মরে গেলে সমাজের কিছু এসে যায় না, বরং দায়মুক্ত হয়। মাথা ঝিমঝিমিয়ে উঠছে, অর্থাৎ রাগ বাড়ছে। তোরাব আলীর ওপর রাগ। তা আবার অল্প সময়ে ঠান্ডা হয়ে যায়। বেশিক্ষণ রাগ ধরে রাখতে পারে না। ওর নিজের নৌকা নেই বলে সাফিয়া ওকে পাত্তা দেয় না। সাফিয়ার আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন, তার সঙ্গে ও ভালোবাসার ওজন করে। টিকলে প্রেম দেয়, নইলে মুখনাড়া।

মালেক ভেবে দেখল ওর জীবনটা আসলে খোলা-তাঁতা। অভাব আর টানাটানি, কিছুতেই এসব কাটিয়ে উঠতে পারে না। চারপাশে কেবলই গ্লানি—তোরাব আলীর পায়ে ধরা—চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে না পারা—যা পায় তাতে খুশি হওয়া—পরের নৌকোয় সমুদ্রে যাওয়ার বুকটাটানি—দুর্বল অক্ষম বলে সাফিয়ার বাঁকা চোখের চাউনি। ও অনেক হিসেব করে দেখেছে যে মাটিতে ওর সুখ কম, মাটি ওকে খাবলে খায়। ওর সুখ জলে। জল ওকে আশ্রয় দেয়, বুকের ভেতর মাকড়-জোনাক ঘনিয়ে তোলে। অথই জলরাশিতে ও শক্তসমর্থ পুরুষ। সাফিয়া বিশ্বাসই করতে পারে না যে শান্ত-নিরীহ মুখচোরা মালেক হাঙরের মুখোমুখি কেমন দুরন্ত দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। কালো জাপটানো শরীর টানটান হয়ে থাকে, দূর-থেকে-উঠে-আসা কোনো আঘাতে তা বিদ্ধ হয় না, টুং শব্দে ফিরে যায়। ও নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, সাফিয়ার বিশ্বাসে কীই-বা এসে যায়। একজনের বিশ্বাস অপরজনকে আহত করলে জীবনযাপন উলটে যায়, কিন্তু সেটাই তো শেষবিন্দু নয়। বরং রক্তে ক্রোধের জন্ম হয়, ক্রোধ থেকে শক্তি বাড়ে, শক্তি বেঁচে থাকার পারাপারে ভিন্ন সেতু গড়ে।

ও এক-পা দু-পা করে ফিরতে থাকে। ডিঙিবোঝাই ঝিনুক এনে দিলেও সাফিয়া বলবে, তুমি একটা ঘুনটু, পার না কিছু। ও বড়ো স্পষ্ট কথা বলে, কোনো রাখঢাক নেই। সাঁই করে এসে সে কথা মালেকের বুকে বেঁধে। ওর বড়ো অসুবিধে, ও সোজাসুজি জবাব দিতে পারে না। সাফিয়ার সামনে ঘুংরিপোকা হয়ে যায়। তবুও কেন যে ওকে ভালো লাগে বুঝতে পারে না, ঘুরেফিরে ওর কাছে এসে দাঁড়াতে পরান আইঢাই করে। সাফিয়ার এখন থমথমা যৌবন। ঘর ভাঙলে কী হবে, চোদ্দজনের সঙ্গে আশনাই। তবুও ওর জন্যই মালেকের বুকে চৈ-চৈ ভালোবাসা। ঘিনশানি গরম যাচ্ছে দুদিন ধরে। অনেকেই ভেড়িবাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা বসে গালগল্প করছে। চারদিকে অন্ধকার জোরালো, অমাবস্যার দাপট যাচ্ছে। কাউকে তেমন চেনা যায় না। শুধু কণ্ঠস্বরে বোঝা যায়। কে যেন ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বলল, মালেক না?

—হ।

—কডে যর?

—ন যাইর, অ্যানে ঘুরির।

—অ।

আর কোনো কথা নেই। মালেক বুঝল শুকুর। ইদানীং সাফিয়ার সঙ্গে জমজমাট, সাফিয়া ওকে লুকোতে চাইলেও মালেক বোঝে। সাফিয়ার আচরণ বদলে যাচ্ছে, শুকুরের ঘনঘন যাতায়াতে কোনো লুকোছাপা নেই। বরং, ঔদ্ধত্যপ্রদর্শনে আনন্দ পায়। একটু এগিয়ে আসতেই শুনতে পেল ফ্যাসফ্যাসে চিবানো কণ্ঠ, শালা

পেইচ্চা কুত্তা। একদিন ধরিয়ারে জবাই দিয়্যম। তারপর খক করে একদলা থুথু ফেললে মালেকের শরীর চিড়-বিড়িয়ে ওঠে। অন্ধকারেই এভাবে অপমান করবে। দিনের বেলা সামনাসামনি হয় না। অন্ধকারে শুকুরের বিড়ি জ্বলছে। মালেক দু-পা পিছিয়ে একবার থামল। যাক, অযথা হাঙ্গামায় গিয়ে লাভ নেই। তারপর ভেড়ি-বাঁধ থেকে সমতলে নেমে আসে। মেঠো রাস্তা পেরোলেই ওর ঘর। শুকুর গুন্ডা, নেশাখোর, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, মানুষ খুন করে। ও রাগ ঝেড়ে ফেলে আস্তে-আস্তে হাঁটে।

আশেপাশের ঘরে টিমটিমে কুপি জ্বলছে। কোথাও-কোথাও গোল্লা-গোল্লা আলোর বৃত্ত। পুরো আঁধার দূর করে না, পরিবেশকে আরো ভুতুড়ে করে রাখে। মালেকের মনে হয় এর চাইতে থমথমে আঁধার ভালো, জমাট-ঘন এবং শক্ত। এই আঁধারকে ওর পুরুষ-পুরুষ মনে হয়। কোনো ধানাইপানাই নেই। সাফিয়ার মতো আলো-আঁধারি না। ও ঘরের কাছে আসতেই বুড়িমার নিস্তেজ কণ্ঠ শুনতে পায়—

—কনে? মালেক না?

—হ মা।

ও নিঃশব্দে ঢোকে। এটাই কি নাড়ির টান? মা কী করে বোঝে ওর আগমন? ও মার পাশে গিয়ে বসে, কপালে হাত রাখে। জ্বর নেই।

—তুঁই ভালা হই গিয়, মা?

—হ বাবা, শরীল পাতল লাগে।

—আলেক কডে গ্যাল? তারে না রাখি গেলাম তোঁয়ার কাছে?

—ফোলাপান কতক্ষণ আর বই থাকিত পারে।

ও দিয়াশলাই খুঁজে কুপি জ্বালে। মার কাছে রাত-দিন সমান, আলো জ্বালার প্রয়োজন হয় না। এখন ও কী করবে? শুয়ে থাকবে, না-কি ভাত বাঁধবে? মা গুনগুনিয়ে কাঁদছে। মন খারাপ হলেই কাঁদে। ইদানীং এই কান্না ওকে স্পর্শ করে না।

—মা, কান্দ ক্যা?

—তুই উগ্যা বিয়া কর, বাবা।

ও চুপ করে থাকে। মা এমনই, কোনোকিছু মনে উঠলেই কাঁদবে। আগাগোড়া কোনো পারম্পর্য থাকুক আর নাই থাকুক। ও হাঁড়ি উলটিয়ে দেখে দুপুরের ভাত আছে।

—মা, তোঁয়ারে ভাত দিয়্যম? খিদা লাইগ্যো না?

বুড়ি শব্দ করে কেঁদে ওঠে।

—তোর বিয়ার কথা কইলেই তুই অন্য কথা কস। তোর মনত যে কী আছে আল্লাহ্ই জানে।

মালেক কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। ঘরময় কান্নার শব্দ শুধু উড়ে বেড়ায়।

—মাগো, আঁই আইলেই ক্যান কাঁদি টের ফ? অ মা, উগ্যা কিচ্ছা কও না! ছোডবেলাত তুঁই কত কিচ্ছা কইতা।

বুড়ির কান্নার শব্দ থেমে যায়, কিন্তু কথা বলে না। কী যেন হাতড়ে বেড়ায়, কত কিছু ফেলে এসেছে, অনেক কিছুই হারিয়েছে। কত অজস্র কিচ্ছা জানত, তার একটাও মনে নেই, মনে থাকে না। মনে রাখার চেষ্টা করলেও সবকিছু গুলিয়ে যায়।

—মাগো, এইবার আঁই বেগুনতুন বড়ো হাঙর ধইরগাম। যেই হাঙর কেউ কোনোদিন ধরিত ন পারে।

পরক্ষণে ওর হাসি পায়। অতি বড়ো হাঙর ধরতে হলে তোরাব আলীকে টুকরো-টুকরো করে বড়শির টোপ বানাতে হয়। নইলে কি হাঙরের পিয়াস মেটে! হাঙর ধরার মৌসুম এসে গেছে, ওর এখন প্রস্তুতির সময়।

—অ মা, তুঁই কিছুই ন কইলা। তুঁই হুদা কান্দ ক্যা?

—আঁর কি দুঃখর শ্যাষ আছে!

—ঠিক কইয়্য। আঁরার দুঃখর শ্যাষ নাই, সুখর শ্যাষ নাই, কোনোকিছুরর শ্যাষ নাই। মাগো, তোঁয়ারে ভাত দি?

—এককানা বাদে খাইয়্যম। তুই ন খাবি? আলেক ন আইয়ের ক্যা? সালেক বুজি জিনজিরা গিয়ে? পোয়াডা কডে কডে যে থাকে?

দুজনে আবার চুপচাপ। বাইরে রাত বাড়ে। মালেকের বুকের ভেতর কেবল টারবর, টারবর। ও জানে না কিসের ডাক।

পরদিন সকালে ও তোরাব আলীর ঘর থেকে হাঙর ধরার বঁড়শি বের করে। লোহার একগুচ্ছ শেকল, এক-

একটাতে দুশ আড়াইশ বড়শি থাকে। উঠোনে বসে সেগুলো ঠিকঠাক করে মালেক। মেহের, মুনশী আর করম গেছে ষ্টেশনারে। ওরা চারজন যাবে সমুদ্রে, গতবারও তাই গিয়েছিল। বড়শি গোছাতে-গোছাতে ও গুন-গুনিয়ে গান গায়। উত্তুরে বাতাস মানেই মালেকের উসুমকুসুম সময়, তরতরিয়ে কাটে। তোরাব আলী এসে দাঁড়ায়।

—মৌসুমের অবস্থা ক্যা মনে হয় রে?

—আইজও হুশিত ন আইয়ে। আরো দু-একদিন যক।

—গত বছর অ্যান লাভ করিত না পারি। এই বছর এককানা মনোযোগ দিস ব।

মালেকের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কোনো বছরই তোরাব আলীর লাভ হয় না। অথচ পাঁচশো টাকার কয়েকটা নোট সবসময় ট্যাঁকে গোঁজা থাকে। মালেক ঘাড় ঘুরিয়ে প্রবল কাশির সঙ্গে থুতু ফেলে। সেই শব্দে হকচকিয়ে যায় তোরাব আলী, একটু আগেও টের পায় নি যে ছেলেটার বুকের মধ্যে এত কফ।

—কুইচ্চা ধরবি ক'ত্তে?

—পরয়াত্তুন।

তোরাব আলী অন্য কাজে চলে যেতে-যেতে বলে, দেইক্যা তাগড়া-তাগড়া কুইচ্চা ধইরাস। ভালা টোপ ন দিলে হাঙর কাছে ন আসিত।

তোরাব আলী চলে গেলে মালেকের বুক খাক হয়ে যায়। ও হাঙরের কলজে, মাংস, দাঁত, পাখনা—সব বিদেশে পাঠায়। কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা আসে পকেটে, তাই চর্বি জমতে-জমতে শরীর এখন থলথলে। হাঁটতে কষ্ট হয়। যৌবনে নিজে সমুদ্রে যেত, এখন যায় না। এখন মালেক ভরসা, কারণ হাঙর ধরার জন্য লোক রাখার ক্ষমতা হয়েছে। তার শরীরে হাঙরের মতো বিশাল ধারালো দাঁত, মালেকের মতো জোয়ান ছেলের যৌবন সে দাঁতে কামড়ে ধরে রাখে। বড়শি ঠিকঠাক করে রেখে ও নৌকার কাছে আসে। জোয়ার এসেছে, তাই নৌকা একদম কিনারে। মুনশী আর মেহের ঠকঠাক কাজ করছে, করম নেই। মালেক লাফিয়ে নৌকায় ওঠে।

—করম কডে রে?

—ন দ্যাখওন টলার আইস্যে? মাছ টোকাইতে গিয়ে।

—ও আঁরার ঘর খালি। মাছ পাইলে ভালা হইত।

—করমরে কই আঁরার বেগ্যানের লাই মাছ আইনতো।

মেহের বলে, মালেকভাই, এইবার মৌসুম ভালাই মনত হয়।

—কী জানি, মালেক আনমনা উত্তর দেয়।

—আপনার মন ভালা নাই।

ও সমুদ্রের ডাক শোনে। ওর মন, সেটার আবার ভালোমন্দ! হাঙর ধরার অজুহাতেই তো সমুদ্রে যাওয়া, বুকের উলিবুলি কাটে। অঘ্রান থেকে চৈত পর্যন্ত দুঃখ থাকে না। দক্ষিনা বাতাস শুরু হলে সমুদ্র গরম হয়, তখন হাঙরের মৌসুম শেষ। ডাঙায় ফিরতে হয় মালেককে। ডাঙায় সুখ নেই। সুযোগ পেলে সাফিয়া ছোবল মারে, উপেক্ষা করে, কখনো আশ্চর্যজনকভাবে কাছে টানে, কারণ বুঝতে পারে না বলে কষ্ট হয়। অথই পানির দিকে তাকিয়ে মনে হয় সামনে ডাঙা নেই, নৌকায় যতদূর যাবার ক্ষমতা ওর, তারপরও পানি। বুক শীতল করে দেয়, বাঁচতে ইচ্ছে করে, মানুষের জন্য ভালোবাসা বাড়ে। প্যারাবনের ভেতর থেকে কত পাখির ডাক ভেসে আসে। ও ষ্টলারভরতি গাদানো মাছ দেখে—গাঙচিলের ওড়া দেখে—কান পেতে কোলাহল শোনে—বার্মা সীমান্তের সবুজ গাছগাছালি দেখে। তবুও, ওর বুকে এখন ঢাপটুপ।

[ক্রমশ

ইন্দ্রাণীর খাতা

(নরেশ গুহ বন্ধুবরেষু)

শামসুর রাহমান

একে একে অতিথিরা বিদায় নিলেন। অকস্মাৎ
মঞ্চ থেকে সব আলো নিভে গেলে, নাটকের কুশীলব আর
দর্শক প্রস্থান করলে যে স্তব্ধতা নামে
যবনিকাপতনের পর, সেরকম
স্তব্ধতা আমার ঘরে প্রতিষ্ঠিত, রাত বারোটায়
শেয়ালের মুখের রোঁয়ার মতো কিছু
চোখেমুখে লাগে
এবং শিশিরভেজা ঘাসের কিরীচ স্পর্শ করে
অনিদ্রাকে। অবসাদ নাভিমূলে পদ্ম রচনার অছিলায়
আমাকে চকিতে ঠেলে দ্যায় অন্তহীন কানা গলির ভেতর।

কিসের আঁশটে গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে,
থাবারের প্লেটগুলি আগেই তো সরানো হয়েছে
কিচেনে। খানিক বাদে
সেডাকশান খেয়ে গৃহিণী গেলেন শুতে,
একা বসে থাকি বারান্দায়। হঠাৎ কে নাড়ে কড়া
এত রাতে? ঝুঁকে দেখি একটি তরুণী
দরজায় একাকিনী, সাত তাড়াতাড়ি
তাকে এনে বসালাম পাশের চেয়ারে। দেখে চেনা
মনে হল, অথচ সঠিক
কোথায় দেখেছি তাকে এর আগে, মনে পড়ছে না।
অগাধ সৌন্দর্যে তার লেপটে আছে অতীতের আভা
তন্বী গাছে ডুকরে-ওঠা কোজাগরী পূর্ণিমার মতো।
ক্যাসেট প্লেয়ারে
দরবারি কানাড়া গুমরে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে, আমি
অপলক চেয়ে থাকি তার দিকে, পেটরোগা মানুষ যেমন
তাকায় থালায় রাখা জ্বলজ্বলে সুখাদ্যের প্রতি।

'ভীষণ অবাক হয়ে গেছেন, তাই না?' মধ্যরাতে
কে যেন সেতারে টোকা দিল। যদি বলতাম তাকে
বিস্ময়ের ঝালর কাঁপে নি
মনের ভেতরে এতটুকু, তবে ভুল বলা হত।

'ইন্দ্রাণীকে মনে নেই?' এই প্রশ্ন আমার দৃষ্টিকে এ রাতের
অতিথির শরীরের অপরূপ রক্তদ্বীপ থেকে
চকিতে সরিয়ে আনে। কী করে ভুলব তাকে, মানে
ইন্দ্রাণীকে? তিপ্পান্নোর সাহিত্যমেলায়, মনে পড়ে,
গোধূলিবেলায় স্মিত হেসে
ইন্দ্রাণী একটি খাতা, সুখস্বপ্নের মতো আশ্চর্য সোনালি,

দিয়েছিল একজন বিশুদ্ধ কবিকে। আমি শুধু
দূর থেকে কাঙালের ধরনে দেখেছি সে অর্পণ। তারপর
হেঁটে চলে গেছি একা, বড়ো একা খোয়াইয়ের তীরে
ভাসাতে আমার হৃদয়ের কীটদষ্ট কিছু ফুল।

এতকাল পরে ফের কী ভেবে ইন্দ্রাণী
আজ ব্রহ্মচারিণীর ধরনে এসেছে এ শহরে সঙ্গে নিয়ে বীরভূমের
একরাশ শিমুল, পলাশ? প্রত্যাশায়
রক্তে বাজে সরোদের বোল,
আমি তাকে রুদ্রাক্ষের মালা খুলে নিতে
মিনতি জানাই, অথচ সে নিরাসক্ত কণ্ঠস্বরে তুলে নিয়ে
তিম্পাম্বোর রেশ বলে, 'আমি নি সোনালি খাতা, শুধু
আপনাকে দেখতে এসেছি।'

শুভ্র বালিহাঁস

জয়কৃষ্ণ কয়াল

লাভ নয়, ক্ষতি নয়
আরও কোনো নিগূঢ় প্রয়াস—
জীবনে বিষক্ত করে,
অথচ মৃত্যুর থেকে দূরে—
বাণে বেঁধে রেখে গেছে
শুভ্র বালিহাঁস।

স্বজন স্বদেশ নেই
থাকলেও বিচ্ছিন্ন সংযোগ—
সূর্যে করাতের টান,
রাত্রি কালসাপ—
সুখেও অসুখ লাগে
এই তার রোগ।

জীবনে বঞ্চিত বটে
মৃত্যু তারও খোলে নি দরজা,
স্পষ্ট যা যায় না বোঝা—
জীবনে মৃত্যুতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে
তাকে স্পষ্টতম করা—
এই তার সাজা।

ভিক্ষা

ওমর আলী

আমার ভেতরে শুধু অভিমান ফিরে এসে আমাকে আবার
দেখে যাক আমাকে আবার শুধু ছুঁয়ে যাক অভিমানী আলো
যেরকম ছুঁয়ে যায় রাজলক্ষ্মীর আলো আঁধারহৃদয় শ্রীকান্তের
শ্মশানযাত্রার অমানিশা কালো বিষণ্ণতা...
কে ওখানে জনশূন্যতায়? কে ওখানে খুঁজছে হারানো...
বালুর ভেতরে ডুবে আছে
সেই কোমল থমকে দাঁড়ানো
মাথাভরা কালো চুল নীলায়ত চোখ রূপকথার রাজপুত্র
গেঁয়ো পাঠশালা থেকে ফেরা স্বর্ণ-অপরাহ্ণ স্বপ্ন...
আর চারদিকে নিঃশব্দতা...নির্জন দ্বীপে রবিনসন ক্রুসো...
ওখানে কী করছ ওমর আলী?
—আমাকে প্রশ্ন করে আমার বয়স
চারদিকে বিবর্ণ শস্যের ডাঁটা মৃতপ্রায় পাখি ভাঙা ডিম
যেমন দেখেছিলেন সাতটি তারার তিমিরের জীবনানন্দ
মাটির তৃষ্ণা শুকনো ঘাস আর নিষ্প্রাণ সে কুশ্রী ফড়িং
টেনিসের দীর্ঘায়ুকোমী টিথোনাস
জরির মতো খুলে পড়া প্রজাপতি যেন রঙিন পাখা
মধ্যগ্রীষ্মরাত্রির স্বপ্ন পরীদের কিংবা
ছিটকে পড়ে আছে সাদা পাখি পিকাসোর তুলি থেকে...
যেন মরে পড়ে আছে এক-একটি বছর যেন নিঃশেষ উষ্ণতা
ও বিষণ্ণ হিথক্লিফ তোমার ক্যাথারিনের স্বপ্নে...
প্রাণপণে ডেকে উঠলাম—
নন্দিনী নন্দিনী কিংবা কিশোরী কিশোরী...
কেঁপে উঠল সমস্ত ঈথার নদী শূন্য প্রান্তর
ও মুমূর্ষু অপ্সরী ইনোনী তোমার আইডা গিরি উপত্যকা
কেঁদে উঠল আমার ভেতরে দুর্বলতা
উলাপুরের পোস্টমাস্টার আর তার কিশোরী...
বললাম—দ্যাখো আমার শূন্য করতল বিস্তৃত আঙুল
এই দ্যাখো আমি কিছু কিংবা কাউকে ধরে রাখতে পারি নি
আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা পড়ে গেছে সমস্ত তরল
সময়ের সোনার মোহরগুলো সব একে একে যেন রোদন শিশির
চৌচির দহনতাপে একটিও অবশিষ্ট নেই
মুগ্ধ সোনার মোহর কিংবা রৌপ্যমুদ্রা এসবের কোনোটাই না—
একটি ভিক্ষুক চায় শুধুমাত্র যৌবন ভিক্ষা...

ভারতে হিন্দুমুসলমান

সাধনা ও সমন্বয়

অমলেশ ভট্টাচার্য

ইতিহাসের ধারা

ইতিহাসের দুই ধারা। একটি মৃত্ত, আর-একটি ফল্গু। মৃত্তধারা জীবনপ্রবাহের উপর দিয়ে বয়ে যায় ভাঙাগড়ার দুই কূল ধরে, ঘটনাপুঞ্জের উত্তাল আবর্তসংঘাতে, সভ্যতার উত্থানপতনে। কোথাও সে কীর্তিনাশা, কোথাও বা প্রাণগঙ্গা।

আর-একটি ধারা তার অন্তঃসলিলা। খরবেগে তা বয়ে যায় গহনে গোপনে। তারই টানে কোথাও কূল ভাঙে, কূল গড়ে। জরমান তাত্ত্বিক ল্যামপ্রেকস যাকে বলতে চেয়েছেন সাইকোলজিকাল সাইক্। শ্রীঅরবিন্দ আরো বিশদ আর সম্পূর্ণ করে বলেছেন, সাইকোলজি অব সোস্যাল ডেভলাপমেনট্। বলা যায়, ইতিহাসের মনস্তত্ত্ব। এই শক্তি কাজ করে যায় গোপনে-গোপনে ভুবনে-ভুবনে। একজন ঐতিহাসিক তাই যথার্থই বলেছেন, "হিসট্রি অ্যাডভানসেস ইন ডিসগাইস"।

কেবল জীবনের উপরিভাগের ছোটো-বড়ো তরঙ্গগুলির পরিচয় নেওয়া নয়। দেখতে হবে, সেই প্রবাহের গভীরে কোন্ আবর্ত ঘূর্ণ্যমান, কোন্ অনুকূল-প্রতিকূল স্রোতের সঙ্গরঙ্গ। সমস্ত ঘটনাপুঞ্জকে একটি গভীর এবং সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা, তবেই জানা যাবে ইতিহাসের গতি কোন্ পথে, লক্ষ্য কী, ইঙ্গিত কোন্ দিকে।

ইতিহাসের কেন্দ্র

বিশ্বের ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করলে, তার উদ্দেশ্য আর সার্থকতা বিচার করতে গেলে, প্রথমেই একটা সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা দেখি, পৃথিবীর সকল সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হল এশিয়া। এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে জগতের বৃহত্তম ধর্মগুলি—হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলমান—এইসব সংস্কৃতির ধারা বিস্তারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে।

আবার এই এশিয়ার নাভিকেন্দ্র হল ভারতবর্ষ। তাই সমস্ত স্রোতের ঘূর্ণি এসে মিলছে ভারতে। তারই সংঘাতে বারবার ভারতের সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহ উদ্বেল হয়ে উঠছে।

সংস্কৃতির ত্রিবেণী

এশিয়ার সনাতন সভ্যতার দুটি ধারা—দক্ষিণে মোঙ্গলীয় সংস্কৃতি চীন-জাপানের পথে, আর বামে ইসলাম সংস্কৃতি বয়ে চলেছে মিশর-আরব-পারসোর পথে। তাদের আচারে ভাষায় প্রকাশে যত পার্থক্যই থাক, মূলত তারা এক। বিশ্বাসে প্রেরণায় লক্ষ্যে অভিন্ন এইসব সেমেটিক এবং আর্য-মোঙ্গলীয় সংস্কৃতি। এরই সঙ্গে আর-একটি স্রোত—মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদি-খ্রীষ্টান সংস্কৃতির ধারা ভারতে এসে সৃষ্টি করেছে এক ত্রিবেণী-সংগম একটা মহত্তম সমন্বয় আর সম্মেলনের জন্য। গড়ে উঠতে চাইছে একটা সাধারণ এশীয়-সভ্যতা। এই তিন ধারাকে বলা যেতে পারে ভারতের সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র। ভারতবর্ষকে শ্রীঅরবিন্দ তাই বলেছেন, "দ্য কাস্টোন অব দ্য আরচ"।

স্রোতের উৎস-সন্ধানে

এশিয়ার এইসকল সংস্কৃতির মূলধারার উৎস সন্ধান করতে গেলে আমাদের দেখতে হবে, কখন কোথায় কিভাবে এদের উৎপত্তি। কালের দিক থেকে ইসলাম অনেক পরবর্তী (হজরত মহম্মদ : ৫৬৯ থেকে ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। আবার খ্রীষ্টধর্ম ইহুদির পরবর্তী। এশিয়ার এইসব ধর্মসংস্কৃতির মূলে সর্বপ্রাচীন হল বেদ এবং বেদের প্রভাব। "সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা হিন্দুরা যাহা কিছু করিয়াছি, ভাবিয়াছি ও বলিয়াছি এবং সেইসকলের পশ্চাতে আমরা যাহা হইয়াছি এবং যাহা হইতে চাই সেসকলের মূলে নিহিত 'বেদ' নামক কিছু বাক্য-সংগ্রহ—তাহাই আমাদের সকল ধর্মের ভিত্তি, এবং সকল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। তাহার মধ্যেই আছে আমাদের নীতি ও সমাজের ব্যাখ্যা, আমাদের সভ্যতার সারাৎসার, আমাদের জীবনপ্রবাহ। এই একটিমাত্র বীজ হইতেই বৈচিত্র্যপূর্ণ আর সুবিশাল হিন্দুধর্ম নানারূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার অফুরন্ত জীবন সংগ্রহ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ও তাহার প্রশাখা খ্রীষ্ট-ধর্মও ওই একই মূল উৎস হইতে উৎসারিত। ইহা পারসোর উপর ইহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, পারস্যের মধ্য দিয়া জুডাবাদ, জুডাবাদের মধ্য দিয়া খ্রীষ্টধর্ম এবং সুফিবাদের মধ্য দিয়া ইসলামধর্মের উপর ইহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। বুদ্ধের মাধ্যমে কনফুসিয়াসবাদ এবং ক্রাইস্ট ও মধ্যযুগীয় অতীন্দ্রিয় ধর্ম, গ্রীক ও জারমান দর্শন ও সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে ইহা ইউরোপীয় চিন্তা ও সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যদি বেদের অস্তিত্ব না থাকিত তবে সমস্ত জগতের আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম ও চিন্তা আজ যেখানে পৌঁছিয়াছে সেখানে পৌঁছিতে পারিত না। সমগ্র বিশ্বে আর কোন বাক্য-সংগ্রহ সম্বন্ধে এরূপ উক্তি করা যায় না।"[১]—শ্রীঅরবিন্দ।

শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তি যে কতখানি ঐতিহাসিক সত্য তা ইতিহাসের পাঠকের কাছে অজানা নয়। ইহুদিদের 'তালমুদ', ইসলামের 'হাদিস' ও হিন্দুর 'মনু-সংহিতা' মিলিয়ে পড়লেই এই তিন সংস্কৃতির মধ্যে এমনকি সামাজিক বিধিবিধান আচারবিচারেরও অনেক আশ্চর্য সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে।

বস্তুত, হজরত মহম্মদ যখন যৌবনে পণ্যবাহী উটের ক্যারাভান নিয়ে আরবের হাচ্ছে উপজাতিদের সঙ্গে ইয়েমেন প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যদেশগুলিতে বাণিজ্য করতে যেতেন তখন সেইসব বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বহু পরিব্রাজক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দেখা যেত। এই-সমস্ত এলাকা তখন ছিল বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাবাধীন। তারই প্রমাণস্বরূপ আমরা কোরানে বিক্ষিপ্তভাবে বহু সংস্কৃত শব্দ দেখতে পাই : যেমন, 'তুবা', 'সুন্দস্', 'আবলাই' ইত্যাদি। এইসব শব্দ সংস্কৃত থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। তবে সে আলোচনা যথাস্থানে।

ইসলামের সঙ্গে হিন্দু আর বৌদ্ধ সংস্কৃতির এই সাদৃশ্যের মূলে আমরা জানি, ইসলামধর্ম প্রচারের বহু আগে থেকেই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এবং সমস্ত মোঙ্গলীয় এলাকা নিয়ে ছিল বৈদিক হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের একচেটিয়া প্রভাব।[২] একদিকে যেমন বৈদিক আর বৌদ্ধ প্রভাব, অন্যদিকে আবার ইহুদি ও জুডাবাদের প্রভাব, বলা যেতে পারে এই দুইয়ের সম্মিলনেই ইসলাম সংস্কৃতির প্রকাশ।[৩]

তখনকার ভারত

ভারতে ইসলামের প্রথম আগমনের সময়টা একবার দেখা যাক। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর কিছু পরেই ইসলাম ধর্ম

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের পরে। উত্তর-ভারতে তখন হর্ষবর্ধনের রাজত্ব। বঙ্গদেশে তখন রাজা শশাঙ্ক। সারা ভারতবর্ষে তখন শঙ্করাচার্য (৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) একেশ্বর বেদান্তবাদের প্রবক্তা। চীন থেকে হিউএন সাঙ এসেছেন ভারততীর্থ ভ্রমণে, জ্ঞান অন্বেষণে। আরবের শাসকেরা তখন ভারতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। জ্ঞানে সাধনায় বীর্যবত্তায় ভারতের গরিমা তখন অত্যুজ্জ্বল। এমনকি ৬৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে খলিফা ওমর পুণ্যভারতকে আক্রমণ করতে অস্বীকার করেন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা ভারত সম্পর্কে বলেছিলেন, "যে-দেশে প্রথম গ্রন্থ রচনা হয়েছে, যে-দেশ থেকে প্রথম জ্ঞানের আলো সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে সে দেশ ভারতবর্ষ।"[৪]

হজরত মহম্মদও বলেছিলেন, "সিন্ধুর শীতল বাতাস আমার অঙ্গ জুড়িয়ে দেয়।"

ইসলামের কাছে প্রতিটি ভারতবাসী তখন ছিল গ্রন্থবিদ জ্ঞানী।[৫]

এমনকি ভারতবর্ষে আসার পরেও বহুকাল পর্যন্ত মুসলমান সাধকদের মধ্যে অনেকে হিন্দুসাধনার সঙ্গে মিলিয়ে তাঁদের ধর্ম প্রচার করতেন। বঙ্গভাষাবর্ষের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামীয় গুরুরা ধর্মপ্রচার করলেন। তখন তাঁরা সম্পূর্ণ হিন্দুই হয়ে গেলেন। এখনও তাঁদের ঘরে হিন্দুর আচার, রামনবমী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পালিত হয়। এঁদের বলে "খোজা"। এখন আগা খাঁ এঁদের গুরু। এঁদের অনেকের নাম আজও মাধবজী, প্রেমজী, ফুলজী। অনেকে আবার বর্তমানে মুসলমান নাম গ্রহণ করছেন। এখনও দেখতে পাওয়া যায়, বহু মান্যগণ্য লোকের ছেলের নাম যদি মুসলমান বাবার নাম তবু হিন্দু।[৬]

ভারতীয় মুসলমান

ভারতীয় মুসলমানেরা যে কেবল ভারতীয় তাই নয়, মাত্র কয়েক পুরুষ আগেও তাঁরা ছিলেন হিন্দু। সকলেই প্রায় ধর্মান্তরিত হিন্দু। কোথাও কোথাও বিস্তীর্ণ জনপদ গ্রাম-কে-গ্রাম একসঙ্গে মুসলমান হয়ে গেছে। আর এই কারণেই তাদের সামাজিক আচার-বিচার, রীতি-নীতি, পোশাক-আশাক, এমনকি পূর্বের উপাস্য দেব-দেবী পূজারীতি পর্যন্ত সমস্তই অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। নামে মুসলমান হলেও অনেক জায়গায় তারা সাংস্কৃতিক জীবনে প্রায় হিন্দুই। এত অধিকসংখ্যক হিন্দু ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে মূল ইসলামের মধ্যেই বরং ব্যাপক এক হিন্দু সংস্কৃতির ছাপ এসে গেছে। অনেক স্থানে মুসলমান রমণী হিন্দু নারীর মতো বৈধব্যব্রত পালন করছেন। পূর্ববঙ্গে নাওয়া-মুসলিম সম্প্রদায় এখনও লক্ষ্মীপূজা করেন। বহু বাঙালি মুসলমান শীতলা, কালী, ধর্মরাজ আর বৈদ্যনাথের পূজা করেন। পানজাবের মেও-মুসলিম সম্প্রদায়ে দেবদেবীর পূজা প্রচলন আছে। তাঁদের দেবদেবীর নাম 'মাগাত', 'লাচি', 'সিংথাসি' ইত্যাদি। পানজাবের আভান-মুসলিম এখনও গার্হস্থ্য উৎসবে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োগ করেন। কচ্ছ অঞ্চলে মমিন-মুসলিম গোরুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, এবং রক্ষা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পূজা করে থাকেন। রাজপুতনার মুসলমানেরা অনেকে এখনও 'মিয়া-ঠাকুর' নামে পরিচিত। ভারতের লতিফ-সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা ও'-মন্ত্র জপ করে থাকেন। তা ছাড়া আফগানিস্তানের বহু পাঠান এখনও 'পাঠান-বৈষ্ণব' নামে পরিচিত।[৭] সাদসী সম্প্রদায়ের মুসলমান গীতাও মানেন, আবার মুসলমান গুরুদেরও ভক্তি করেন। গনজামের আরুবারা, দাক্ষিণের দুদেকুলেরা আর মায়াকায়ারা, তৈলঙ্গের কাটি-কেরাও একই রকম হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ আর মুসলমানের গুরু দুইই মানেন। ডাফলী আর ঘোসীরাও আধা-হিন্দু আধা-মুসলমান, এঁরা 'হুসেনী ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত।[৮]

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই প্রভাব আর মিশ্রণ কেবল ধর্মবিশ্বাসে আচরণে তাই নয়, তাদের ভাষায়, সাহিত্যে, সাধনায়, গানে, শিল্পে, স্থাপত্যে অত্যন্ত স্পষ্ট।

ভারতীয় মুসলমানের অধিকাংশের ভাষা উরদু। উরদু ভাষা হিন্দু-মুসলমানের মিলনসমন্বয়ের এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। উরদু প্রথমে ছিল মৌখিক ভাষা, পরে তা আরবি হরফে লিখিত হতে লাগল। কিন্তু উরদু তার গঠনে বাক্‌ভঙ্গিতে ব্যাকরণে সম্পূর্ণ হিন্দি। এর শব্দসম্পদ গড়ে উঠেছে আরবি, ফারসি ও হিন্দি থেকেই।

ইসলামের সাধনায় বেদান্ত, যোগ আর তন্ত্র

আমরা কোরানে সংস্কৃত শব্দের অবস্থিতি লক্ষ করেছি, একথা আগেই বলা হয়েছে। এ ছাড়া ইসলামের যে গুহ্য সাধনতত্ত্ব, (এসোটেরিক সাইড অব ইসলাম) তা রয়েছে সুফিবাদের মধ্যে। এই সুফিবাদ প্রায় আগাগোড়া বেদান্তভাবে ভাবিত। ইসলামের উপর হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব যে কতটা, তারই নিদর্শন হল এই সুফিবাদ। অধ্যাপক জেনার স্পষ্টই বলেছেন, "সুফিজম ইজ বেদান্ত ইন মুসলিম ড্রেস"। একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত নানাভাবে বেদান্তদর্শন ইসলামের সাধনায় প্রবেশ করতে থাকে।[৯] ইসলামের এই সুফিবাদ ভারতে এসে প্রথম প্রভাবিত হয় নাথযোগীদের দ্বারা। নাথ-পন্থ সেই সময় পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে পূর্বে আসাম পর্যন্ত অত্যন্ত সক্রিয় সাধনধারারূপে প্রচলিত ছিল। নাথগুরু গোরক্ষনাথের দুই শিষ্য অপানাথ আর গংগা, দুই মুসলমান যোগী রত্তন আর হাজীর কাছে সাধনা করেন। আজো পর্যন্ত ভর্তৃহরির গুহা মুসলমান ফকিররা পূজা করে থাকেন।[১০]

এই নাথযোগীদের থেকেই সুফিরা প্রাণায়াম শিক্ষা করেন। এমনকি মুসলমানদের 'জিকারা' একপ্রকার যোগসাধনাই।

যোগ আর তন্ত্রে যে ষট্‌চক্রের কথা আছে, ইসলামের সুফিদের মধ্যেও অনুরূপ যোগচক্রের ধারণা রয়েছে। ইসলামের এই ষট্‌চক্রসংস্থান তন্ত্রের থেকে সামান্য কিছু পৃথক হলেও মোটামুটি এক। তন্ত্রে আমরা জানি, ১. মূলাধার, ২. স্বাধিষ্ঠান, ৩. মণিপুর, ৪. অনাহত, ৫. বিশুদ্ধ, ৬. আজ্ঞা, ৭. সহস্রা। কিন্তু ইসলামে বলে, ১. নাফ, ২. কাল্‌ব, ৩. রূহ্‌, ৪. সির্‌, ৫. খাফি, ৬. আখ্‌ফা।

এর মধ্যে—

নাফ=মণিপুরচক্র
খাফি=আজ্ঞাচক্র
আখ্‌ফা=সহস্রা

পঞ্চদশ শতাব্দীর পর থেকে সুফিরা হিন্দুর যোগ-সাধনা প্রায় সবটাই গ্রহণ করে। বিখ্যাত ইসলাম ফকির গুলাম জিলানী রোহট্‌কি প্রকাশ্যেই তাঁর শিষ্যদের পতঞ্জলির যোগ সাধনা করতে বলতেন।

বৌদ্ধ সাধনা আর বেদান্তভাবের অর্থবাহী শব্দের তো অভাব নেই ইসলামে। যেমন,—

ফানা=নির্বাণ
তাত্তহিদ=ভাগবত একত্ব
তাকুনা আন্তা ঢাকা=অহম্‌ ব্রহ্মাস্মি
রাকা ইক=চরম সত্য
আনল হক্‌=সোঽহং
তারিকা=আত্মোপলব্ধি
তস্‌বিহ্‌=জপমালা
ধিকর=জপ
ইত্তিহাদ=মানুষ আর ভগবান এক
হালুল=অবতারবাদ
হামাউস্ত=সবই ভগবান, ইত্যাদি।

হিন্দু-মুসলমানের সবচেয়ে সহজ আর সুন্দর যোগ-সাধনা হয়েছে বাঙলার বাউলের মধ্যে। ইসলামের সুফি আর বাঙলার বাউল দেশের হাটে-মাঠে-বাটে তাঁদের ডুবকি আর একতারা বাজিয়ে সহজ সত্যের প্রেমের মিলনের যে গান গেয়ে চলেছেন তার উদার তানে দেশের অন্তরের আকাশ ভরা। বস্তুত, ইসলাম আর হিন্দু সংস্কৃতির এই সরস্বতীধারা ফল্গুস্রোতে বয়ে চলেছে দেশের প্রাণগঙ্গা দিয়ে। বৈদিক যুগ থেকে, এমনকি তারও আগে থেকে, আজ পর্যন্ত যুক্তে সাধনার গোপন শিখাটি এঁরাই জ্বালিয়ে রেখেছেন।[১১] এই বাউরা বা বাউল মানে খ্যাপা পাগল। অথর্ববেদে এঁদের সাধনাকে বলত 'ব্রাত্য', 'বাতুলা'—অর্থাৎ বায়ু-তাড়িত, ছন্নমতি। এঁরা 'মনের মানুষ' 'সহি দরদী'কে পাওয়ার জন্য প্রেমের পাগল। কোনো শাস্ত্র-আচারের শাসন এঁরা মানেন না। সুফি বলেন, তাঁরা শরিয়ত-এর শাসন এড়িয়ে পথে নেমেছিলেন হকিকত-এর খোঁজে অর্থাৎ সত্যের অনুসন্ধানে,—

না মর ভুখোঁ না কর রোজা
ন জ্যা মসজিদ ন কর সিজদা।
রজ্‌কা তোড় দে কুজা
শরাবে শৌক পীতা জা। (মনসুরে)

[না মরিস ক্ষুধায়, না মরিস রোজায় অর্থাৎ উপবাসে, না যাস মস্‌জিদে, না করিস মাথা নত। ওজু (নামাজের আগে হাত-পা ধোয়া) করবার জলপাত্রটি ভেঙে ফেলে দে। শুধু পান কর প্রেমের মদিরা।]

খ্যাপা বাউলও চলে এমনি উলটা পথে—

অনুরাগী রসিক যারা যাচ্ছে তারা উজান বাঁকে।/যখন নদীর "হুমো" ডাকে জাগায় তরীর ফাঁকে ফাঁকে।
(হারামণি)

বাউলের যা 'প্রেমসমাধি', সুফিদের তাই 'ফানা'। সুফি আলিরাজ গেয়েছেন,—

পিরীতি উলটা রীত না বুঝে চতুরে
যে না চিনে উলটা সে না জিয়ে সংসারে।

বাঙলার এই আউল-বাউল-দরবেশদের গান হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। বাউল-দের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের কোনো ভেদ নেই। লালন, হাসান, মদন প্রভৃতি বহু বাউল তো মুসলমান, এঁরাই গেয়েছেন,—

মন্তে তন্তে পাতলি যে ফাঁদ/দিবে সে কি ধরা

সাহিত্যে যুক্তসাধনা

যুগে যুগে ধরে ইতিহাসের বাইরের ঘটনাপুঞ্জের অন্তরালে সাংস্কৃতিক মিলনের এই ফল্গুধারা দেশের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। সেই অতলশায়ী স্রোতের মধ্যেই ভারতের প্রাণতরঙ্গ। তারই গতি নির্দেশ করছে দেশের ভবিষ্যৎ যাত্রা—সংস্কৃতির আগামী রূপ। দীর্ঘকাল ধরে ব্রাহ্মণ্য, জৈন, বৌদ্ধ, সিদ্ধাচার্য, নাথযোগী, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, আউল, বাউল, দরবেশ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের ধারা নিয়ে ভারতীয় সাহিত্য গড়ে উঠেছে। একদিকে গ্রামে-গঞ্জে প্রাকৃতজনের লোকসাহিত্য, লোকগীতি, অন্যদিকে অভিজাত শিক্ষিত উচ্চসমাজের উচ্চস্তরের সাহিত্য এবং রাজাবাদশার দরবারের দরবারি সাহিত্য।

সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষা ছাড়াও সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে অপভ্রংশ ভাষা। এইসব অপভ্রংশ ভাষাতে সন্ত আর মুসলমানদের সব রচনা বহুপ্রচলিত। ভারত-সংস্কৃতির যে মাটি, তা এঁদেরই সব ভাবসম্পদে গড়া। এই মাটির উপরেই রচিত হয়েছে দেশের উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসাধনার নন্দনকানন।

বহু মুসলমান সংস্কৃত সাহিত্য, যোগশাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, অলংকার, ব্যাকরণে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এঁদের মধ্যে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের মালিক মহম্মদ জায়সী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গজনীর সুলতানের সভাপণ্ডিত অলবিরুণীর সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান তো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। চট্টগ্রামের সৈয়দ সুলতান যে কেবল বৈষ্ণব কবি ছিলেন তাই নয়, তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থও রচনা করে-ছিলেন। তাঁর সেই গ্রন্থের নাম 'জ্ঞানপ্রদীপ'। বহু মুসলমান সুলতান হিন্দুর একাধিক ধর্মগ্রন্থ আরবি আর ফারসিতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাসিকো উপনিষদ অনুবাদ করেছিলেন ফারসিতে। এ ছাড়া গীতা, রামায়ণ আর যোগবাশিষ্টের অনুবাদও তাঁর। তা ছাড়া আরবিতে তিনি নিজে এক-খানি গ্রন্থ লেখেন 'মাজনা-আল-বাহরেন' নামে। এতে তিনি বলেছেন, কোরান আর উপনিষদের মধ্যে একই সত্য নিহিত।

গৌড়ের রাজা নাসির শাহ (১২৮৫-১৩২৫ খৃষ্টাব্দ) নিজের উৎসাহে কাশীরাম দাসকে দিয়ে মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ করান। হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫২৫ খৃষ্টাব্দ) মালাধর বসুকে দিয়ে ভাগবত-গীতার বাঙলা অনুবাদ করান। সুলতান নসরৎ শাহের উদ্যোগে পরগ-লাল খাঁ মহাভারতের আর-একটি অনুবাদ করেন, সেটি 'পরগলী মহাভারত' নামে খ্যাত। দৌলত কাজী হিন্দি মহাকাব্য 'নূরকচন্দ'-কে বাঙলায় অনুবাদ করেন 'লোর-চন্দ্রাবলী' নামে। মগন ঠাকুর (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী) নামে একজন মুসলমান উজির আরাকানের বৌদ্ধরাজার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং 'পদ্মাবতী পুঁথি' রচনা করেন।

বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে আমরা অনেক মুসলমান কবির নাম পাই; যেমন, আফজল, আমান, কবীর, ফয়জুল্লা, এবাদুল্লা, আলিমুদ্দিন, মহম্মদ হামীর ইত্যাদি। তা ছাড়া সংস্কৃত কবিদের মধ্যে দরাফ খাঁ, আবদার রহীমের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আর সেনাপতি—যিনি ভক্ত তুলসীদাস আর আচার্য বিঠলের অন্তরঙ্গ বন্ধু—আবদুর রহীম খাঁনখানা (১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ) সংস্কৃত, হিন্দি, ফারসি, আরবি, তুরকি—এই পাঁচটি ভাষাতেই বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। রহীমের দোঁহা এখনও লোকের মুখে মুখে :

যে গরিব কো আদরে তে রহীম বড়লোগ।
কহা সুদামা বাপুরো কৃষ্ণ মিতাই জোগ।

[যে-রহীম গরিবকে আদর করে সেই তো বড়লোক। কোথায় বেচারা দরিদ্র সুদামা! সুদামাকে আদর করে কৃষ্ণেরই মহত্ত্ব।]

সিন্ধুদেশের সুফিদের যে গান তাকে বলে কাফি।

সেই থেকে ভারতীয় সংগীতে একটি সুরের নামই হয়েছে কাফি।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাই বলেছেন, "মালিক মহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবতী', আলাওলের 'পদ্মাবতী', আবদুর রহীমের 'সংদেশ-রাসক' প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিলে বুঝা যায়, মুসলমান লেখকরাও গভীর শ্রদ্ধার সহিত সে যুগে সংস্কৃত-প্রাকৃত পড়তেন, শ্রদ্ধার সহিত পুরাণ এবং শাস্ত্রাদির আলোচনা করতেন। কাব্য অলংকার সাংখ্যযোগ প্রভৃতিতেও তাঁহাদের যেরূপ গভীর জ্ঞান তাহা এখনকার দিনে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যেও দুর্লভ।"[১২]

সংগীতে যুক্তসাধনা

সাহিত্য ছাড়াও ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সাধনার যোগ ভগবৎপ্রেমে ভক্তিতে সংগীতে। ইসলাম ধর্মে যদিও সংগীত নিষিদ্ধ, তবু বিশেষ করে সংগীতেই মুসলমানের দান বিস্ময়কর। ভারতীয় সংগীত 'নায়কি' থেকে 'গায়কি'-তে রূপান্তরিত হয় মুসলমান কলাবতদের দ্বারাই।

এইসব মুসলমান গুণীদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় আমীর খুসরুর। ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন দিল্লীর সুফিসাধক নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য—একাধারে ভক্ত, সাধক, কবি আর কলাবত। তিনি ভারতীয় প্রায় সব ভাষা আর বিদ্যা সাদরে অধ্যয়ন করেছিলেন। ভারতীয় লোকসংগীতের কিছুটা অদল-বদল করে তিনি সুলতান আলাউদ্দিনের সময় (১২৯৬-১৩১৬ খ্রী) ধ্রুপদ সংগীতের সৃষ্টি করেন। তখনকার লোকপ্রিয় রাগ পুরবী, ধানশ্রী, রামকেলি, কুরাই প্রভৃতির মিশ্রণে ধ্রুপদকে উচ্চাঙ্গ সংগীতে রূপান্তরিত করেন তিনি। তা ছাড়া, প্রাচীন দীর্ঘ তালের জায়গায় তিনি কাওয়ালি, দাদরা প্রভৃতি আট মাত্রার আর ছয় মাত্রার তাল প্রবর্তন করেন। পারস্য-সংগীতের ইমন রাগকে তিনি ভারতীয় বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করে প্রবর্তিত করেন ইমন-কল্যাণ, ইমন-পুরিয়া, ইমন-ভূপালী, ইমন-বেলওয়ালী, ইমন-বেহাগ, ইত্যাদি। ভারতীয় বীণা থেকে সেতার-যন্ত্রটিও খুসরুর সৃষ্টি।

ওস্তাদ তানসেনের নাম আমরা সকলেই জানি। তানসেন (১৫৩১-১৫৮৯ খ্রী) গোঁড়ের এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তানসেনের আসল নাম রামতনু পাণ্ডে। পিতার নাম মকরন্দ পাণ্ডে। তানসেন বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন। পরে সুফি ফকির মহম্মদ ঘৌসের শিক্ষা নিয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের পরিবারে জপতপধ্যানসাধনা এবং গোঁড়ীয় ব্রাহ্মণের আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। হিন্দুর ভক্তি-সংগীতে তানসেনের ছিল বিশেষ অনুরাগ। দীপাবলী উৎসবে গোবরজলে গৃহপ্রাঙ্গণ মার্জনা করে সারা রাত ধ্রুপদ সংগীত গেয়ে তিনি সরস্বতী পূজা করতেন। তাঁর কন্যার নামও ছিল সরস্বতী। স্ত্রী প্রেমকুমারী। চার পুত্রেরও হিন্দু নাম, সুরসেন, শরৎসেন, তরঙ্গসেন আর বিলাসসেন। তানসেনের দৌহিত্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন ভারতের বিখ্যাত ওস্তাদ সদারঙ্গ। আবার তানসেনের শিষ্য বৈজু বাওরা। আকবরের রাজসভায় সবচেয়ে গুণী কলাবত এই তানসেন। তিনি ছিলেন রবাবে সিদ্ধহস্ত। মল্লারের সঙ্গে গান্ধার মিশিয়ে তিনি সৃষ্টি করেন তাঁর বিখ্যাত মিঞা-কি-মল্লার। এ ছাড়া বাহার, দরবারি কানাড়া, দরবারি-টোড়ী প্রভৃতি রাগ তানসেনের সৃষ্টি। তিনি ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'সংগীতসার' এবং 'রাগকলা' নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

বেতিয়ার মহারাজা নন্দকিশোরের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন এই তানসেন পরিবারের গুণী প্যার খাঁ। গণেশপ্রসাদ দ্বিবেদী তাঁর 'রবাবী খাননদান' প্রবন্ধে লিখেছেন,[১৩] তানসেনের পরিবারের মর্মে সাধনার একটা তাপসজনোচিত ভাব ছিল। প্যার খাঁ শেষরাত্রে উঠে আপনমনে ধ্যানের জন্য দূরে অরণ্য আর গ্রামের দিকে চলে যেতেন। একদিন পর্বতের তলদেশে এক আভীর-পল্লীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন গ্রামের মেয়েরা জাঁতা পিষতে-পিষতে গান করছে। তাদের সেই গানের সুর প্যার খাঁকে মুগ্ধ করল। তিনি শেষ রাত্রের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এই গান শুনতে লাগলেন। তারপরে সেই সুর গুনগুন করতে-করতে ঘরে ফিরলেন। কদিন ধরে চেষ্টা করে সুরটিকে আপন যন্ত্রে তুলে দরবারে শোনালেন। শুনে সবাই মুগ্ধ। সকলে জানতে চাইল এই নতুন রাগের নাম কী। প্যার খাঁ তখন তাদের ঘটনাটা বললেন। সেদিন থেকে এই সুরের নাম রাখা হল তিলককামোদ।

এমনি করে অনেক দেহাতি ধুন থেকে উচ্চাঙ্গ রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁর 'হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি' গ্রন্থে (পৃ ৬) বহু গুণী ওস্তাদের নাম করেছেন; যেমন, হামিদ আলি খাঁ, মহম্মদ আলী, বাসিত খাঁ, রজীব খাঁ, আমীর খাঁ, পীর বক্স, নত্থন খাঁ, আবদুল্লা খাঁ, মিরাজ।

ওস্তাদ আলাউদ্দিনের নাম না করলে এ প্রসঙ্গ অসমাপ্ত থেকে যায়।

এঁর পৈতৃক বাসভূমি পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকট শিবপুর গ্রামে। এঁরা জাতিতে নট। নটেরা নামে মুসলমান, আচার আচরণে হিন্দু। এঁরা বাউল ভাবের সাধক। আলাউদ্দিন খাঁর সংগীত-প্রতিভা বর্তমানকালে কিংবদন্তীর মতো, এখানে তার আলোচনার প্রয়োজন নেই।

কেবল দরবারি আর উচ্চাঙ্গ সংগীতেই নয়, গ্রাম-বাঙলার আগমনী গানে, ভাসানে, যাত্রায়, জারি গানে, গম্ভীরায়, নীলপূজোয়, গাজনে, চপ-সংগীতে, মালসীতে, কবিগানে—সর্বক্ষেত্রে দেশের লোকায়ত জীবনযাত্রায় উৎসবে আনন্দে হিন্দু-মুসলমান একত্রে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। আমাদের লোকসংগীতে তা চিরপ্রাণ হয়ে আছে।

লোকায়ত গণসাধনার ধারা

জাতির মূক হৃদয়ে মৌন মন্ত্রের মতো সুপ্ত দু-একটি ভাব চিরকাল গুপ্ত থেকে কাজ করে। ইতিহাসের যে ফল্গুধারার কথা বলেছি তারই সঙ্গে থাকে তার নাড়ীর টান। অশিক্ষা অজ্ঞান জড়তা দারিদ্র্য এবং চেতনার অন্ধকারের তলে চাপা-পড়া সেই ভাব যেন দেশের মাটির মতো। যেখানে সাধারণ মানুষের ভক্তিবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আচারসংস্কার নিয়ে জীবন-ইতিহাসের যত উপাদানের স্তর জমাট হয়ে আছে। বহুলাংশে তা শিক্ষিতের রুচি, অভিজাতের শাসন, রাজাবাদশার আইনকানুন-দণ্ডবিধানের প্রতাপ এড়িয়ে সাধারণ মানুষের সরল হৃদয়কেই আশ্রয় করে থাকে সেইসব মূলাধার ভাব। গণজীবনের প্রাণতন্ত্রীতে বাঁধা দেশের সেই একতারা। স্মার্তপণ্ডিতের বিধানে, শাস্ত্রের অনুশাসনে, কিংবা সমাজের উচ্চশ্রেণীর জীবনকর্মে তাকে যথার্থ পাওয়া যাবে না; সেই মূল সুরটি পেতে হলে আমাদের যেতে হবে শহর নগর ছাড়িয়ে গ্রামের কুটিরে-আটচালায়, সাধারণ গ্রামীণ গৃহস্থের আঙিনায়, গ্রাম্য সমাজের চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারিতলায়, চাষির মাঠে, ফসলের খেতে, নদীর পাড়ে বটের ছায়ায়, এমনকি জনহীন শ্মশানের অন্ধকার অরণ্যে। যেখানে সাধারণ মানুষের জীবনে বিচিত্র আনন্দ-শোক-দুঃখ-মৃত্যুর ভিতর দিয়ে একটা উদাস সুর বেজে চলেছে। নানা ভাব আর বিশ্বাসের সংঘাতে মিলনে, হাসি-অশ্রু আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে, মানুষের আচার-অনুষ্ঠান ধর্মকর্ম রীতি-নীতির একটা সাধারণ স্বরলিপি গড়ে উঠছে।

অনেক ভাব-ভাবনা তার সমাজের উচ্চস্তরের প্রশ্রয়ের অভাবে বা প্রতিঘাতে সরে গিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে আশ্রয় নিয়েছে লোকালয়ের আড়ালে সাধু-সন্তের ঝুপড়িতে, সহজিয়া-আউল-বাউল-সুফি-দরবেশের গানে। কিংবা কোথাও বা গুহ্য সাধনায় সান্ধ্য ভাষায় আত্মগোপন করেছে। বিভিন্ন ধর্মের নানা বিশ্বাস আচার রীতি লোকসংস্কৃতির ভিতর দিয়ে দেওয়া-নেওয়া চলছে। এমনি করে একটা সাধারণ সমন্বয় আর মিলনের ভূমি তৈরি হচ্ছে।

আবার কোথাও-বা তারা কিছুটা শক্তিসঞ্চয় করে গ্রামের প্রান্তে, গাছতলায়, গ্রামাদেবতা, ধর্মঠাকুর বা পীরের থান রূপে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই পূজা আর বিশ্বাসের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। গ্রামের মুশকিল আসান, দর্গা, ফকির, সিন্নি, মানত ইত্যাদির ভিতর দিয়ে একটা মিলিত লোকবিশ্বাসের রূপ গ্রহণ করছে। তাই দেখি, বাঙলার মাঝি-মাল্লারা—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—দরিয়ায় পাঁচপীরের নামে জয়ধ্বনি করছে। বীরভূম-বাঁকুড়ার গ্রামের প্রান্তে যে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়, তার পূজা-পৌরোহিত্যের অধিকার তো কেবল চণ্ডালের।

আদিযুগ থেকেই এই মিলন-সমন্বয়ের কাজটি চলে আসছে কালের নিঃশব্দ ধারায়। কালপুরুষের সেই গতি অপ্রতিরোধ্য। গণসাধনার এই সুরটি আমরা শুনতে পাই সাধু-বৈরাগী-সুফি-ফকিরের গানে। পল্লীর সবুজ মাঠ আর নীল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে তাদের ডুবকি-

একতারার সুরের সঙ্গে মিলিয়ে শুনুন তাদের দু-একটা গান। মাড়োয়ারের মুসলমান সাধক দরিয়া সাহেব (১৬৭৬ খ্রী) গাইছেন—

আদি অন্ত মেরা হৈ রাম
উন বিন ঔর সকল বেকাম।
[আদি অন্ত সবই আমার রাম। রাম বিনা সবই আমার বিফল।]

কবি ফরহত গাইছেন—

মারো মারো হে শ্যাম পিচকারি হো
তাক লগায়ে খড়ী সখিয়ন সংগ
ওট লিয়ে রাধা প্যারী হো।
[মারো মারো, হে শ্যাম, তোমার পিচকারি। সখীগণের সঙ্গে আড়ালে রয়েছে রাধা প্যারী হে।]

অথবা মুসলমান কবি কায়েম কী বলছেন শুনুন—

গুরু বিনা হোরী কোন খেলারৈ।
কোঈ পংথ লখারে॥
[গুরু বিনা কে খেলাবে হোলী, কে দেখাবে পথ?]

ভারতের হৃদয় এক মহাসমুদ্রের মতো। কত সভ্যতার বিচিত্রধারা নদীর স্রোতের মতো এসেছে আর সেসব তার বিশাল উদার বক্ষে লীন হয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে গেছে।

আমরা দেখতে পাই, ইতিহাসের ঝোড়ো হাওয়ায় ধুলো উড়িয়ে এল কত শক-হূণ-যাবচী জাতির লোক। একদিন তারাই এই ভারতে শিবভক্ত নাথপন্থী হয়ে গেল। গ্রীকেরাও ভারতে এসে পর হয়ে থাকতে পারেন নি। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটা শিলালিপিতে দেখতে পাই তক্ষশিলার ডিয়সের পুত্র হেলিয়ডোর পরম বৈষ্ণব, তিনি বিষ্ণুমন্দিরের গরুড়ধ্বজ তৈরি করে দিচ্ছেন। কোডফাইসস হয়েছেন শৈব।[৪]

দক্ষিণ-ভারতে যখন প্রথম খ্রীষ্টানেরা এলেন তখন দক্ষিণের হিন্দু রাজারাই ভূমিবৃত্তি দিয়ে তাঁদের সাধনার পথ সহজ করে দিয়েছেন। পারস্য থেকে পারশিরা যখন এলেন, তখন গুজরাতের যদু রানা তাঁদের ভূমিবৃত্তি দিয়ে আশ্রয় দিলেন। জৈনদের পুরাতন পুঁথি থেকে আমরা জানতে পারি, দেবী অনুপমা ভক্ত মুসলমানদের জন্য চুরাশিটি মসজিদ তৈরি করে দিয়েছিলেন। মুসলমান সাধকদের জন্য হিন্দু রাজাদের ভূমিদানের বহু প্রমাণ প্রাচীন সব লেখে পাওয়া যায়।[৫]

ধর্মে সমাজে হিন্দু মুসলমান দীন দরিদ্র অন্তজ ব্রাত্য—এদের নিয়ে যে সমন্বয় আন্দোলন হয় মধ্যযুগে, তার শুরু রামানন্দ থেকে হলেও তার বহু আগে জৈনদের মধ্যে সেই ভাবের ধারা লক্ষ করা যায়। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে মুনি রামসিংহ-রচিত 'পাহুড়দোহা' তার দৃষ্টান্ত। রামানন্দ, রবিদাস, কবির, ধন্না, সেনা, পীপা, সদনা প্রভৃতি সন্তদের কথায় জীবনসাধনায় সারা ভারতের সেই মিলনের একতারাটি বেজে উঠেছিল। রামানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ, রবিদাস মুচি, কবির জোলা (মুসলমান), সেনা নাপিত, ধন্না জাঠ, পীপা রাজপুত এবং সদনা ছিলেন কশাই। দাদু আর রজব ছিলেন মুসলমান। ধর্মকে এমনি লোকায়ত সমন্বয়ে বাঁধবার এই শক্তি রয়েছে, পূর্বেই বলেছি, ভারতের মাটিতে; যেখান থেকে উঠেছে এই কথা—সব ঘট একৈ আত্মা ক্যা হিন্দু মুসলমান। (দাদু)

সংস্কৃতির স্বভাবপ্রতিভা

মানুষের অন্তরাত্মাকে ধরে যেমন তার দেহ-মন-প্রাণ বিচিত্র ধারায় সজীব হয়ে ওঠে, তেমনি ভারতের সমাজ-জীবনেও অধ্যাত্মচেতনাকে ধরে নানা ধর্মের স্বভাব-প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। তার মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব আছে, বিরোধ আছে, বিকার আছে, তেমনি আছে আবার স্বাশ্বা পুষ্টি জীবনশ্রী। সকল বাহ্য বিরোধ আর দ্বন্দ্বের পিছনে তাদের প্রতিভা একাত্মতা এবং সঞ্জীবনের পথে চলেছে।

ইসলামের মূল প্রতিভা হল তার দুর্দম প্রাণ—প্রাণের তেজ। মানুষের প্রাণবৃত্তিকে ধরে তাকে ভগবৎ-মুখী করতে চাইছে ইসলাম।[৬] খরস্রোতা নদীর মতো, বিপুল তুষারপ্রপাতের মতো সমষ্টিগত ঐক্যে বিধৃত আবেগের এক সংহত চাপ। সেই শক্তির মধ্যে রয়েছে আরবের মরুভূমির রুক্ষতা, আর মরুপর্বতের উপজাতীয় জীবনের দুর্দমতা। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পরস্পরসংগ্রাম-রত খণ্ড উপজাতিকে একত্র করবার জন্য ইসলাম গোড়ায় ছিল আরবের রাষ্ট্র এবং নেশন গঠনের ধর্ম। তাই "পরমার্থকে মোসলেম ততটুকু ধরিয়াছে বা সেইভাবে ধরিয়াছে যাহাতে তাহা মানুষের সমাজগত সমষ্টিগত সাধারণ জীবনে সহায় ও পরিপোষক হইয়া উঠিতে পারে।...মহম্মদ তাঁহার জাতি ও রাষ্ট্রগঠনের ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আরবের বিচ্ছিন্ন সত্তাকে এক-কেন্দ্রগত করিয়া জাগতিক প্রতিষ্ঠানে বাহির্জীবনে একটা সমর্থ শক্তিমান দেহের মধ্যে বাঁধিয়া দিলেন এই বীর সাধক।"[৭] শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মোসলেম প্রতিভা বিশ্লেষণ করে বলেছেন, মুসলমান মানুষে মানুষে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে তা "সৈনিকে সৈনিকে ভ্রাতৃত্বের" মতো একই সেনানীর অনুজ্ঞায় চালিত ঢালাই পেটাই করা একটা নিরেট ঐক্যে জাতিকে গড়ে তুলতে চেয়েছে। একটা সহজ শ্রদ্ধা সারল্য আর শক্তি—এই হল মুসলিমের প্রাণ।[৮]

পক্ষান্তরে হিন্দুর স্বভাবপ্রতিভার কথা বলতে গিয়ে শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন, হিন্দু ধর্মের বিশেষত্ব তার নানাত্বে, বহুত্বে, এমনকি অনন্ত বৈচিত্র্যে। মানুষের যে বিচিত্র স্বভাব, প্রকৃতির যে বহুধা গতি, তাকে মেনে তাকে আশ্রয় করেই হিন্দুর জীবনব্যবহার গড়ে উঠেছে। তার এই ব্যষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য আর বৈচিত্র্য ছিল বলেই সর্বাধিক সৃজনপ্রতিভায় ভারত পৃথিবীর শীর্ষস্থানে আসন পেয়েছে।

এই দুই প্রতিভার প্রভাব ভারতীয় জীবনে যে কতটা কাজ করেছে তারই প্রমাণ হিন্দুদের মধ্যে মারাঠা আর শিখ জাতির অভ্যুত্থান। অন্যদিকে ইসলামও যত প্রসারিত হয়েছে, নানা ধর্মের নানা জাতির সংস্পর্শে এসেছে, ততই তার আদিম দুর্ধর্ষ ভাব এবং গোষ্ঠী-প্রাধান্য অনেক কমে এসেছে। তার প্রাণসত্তার মধ্যে আজ না হোক আগামীকাল একটা বহুমুখী মানসসত্তার হাওয়া খেলবে হয়তো। ইসলাম-প্রতিভার অন্তরের এই অভাবের দিকটাই আজ তার সম্মুখে বড়ো সমস্যা।

অন্তর্হীন ভেদের মধ্যে মহাসমন্বয়ের এক মহা-তপস্যা ভারতের জন্য বিধাতা চিরদিন ভিতরে-ভিতরে নির্দেশ করে আসছেন। ভারতের সেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—সেই উদার হৃদয়ের উন্মুক্ত দৃষ্টি ভারতের মাটির সেই বিশেষ গুণ যা "মুসলমানের একটা আসল মুসলমানত্ব"ও[১০] অঙ্গীভূত করে নিতে পেরেছে।

একটা নেশন-বোধ—তার মধ্যে ধর্ম হিসাবে জাতি হিসাবে ভাষা হিসাবে বিভিন্ন এমনকি বিরোধী গোষ্ঠীও থাকতে পারে। ইউরোপের সব নেশনগুলির মধ্যেও কি এই বিরোধ, এই বিভিন্নতা নেই? ইউরোপের সব নেশনগুলির মধ্যেও তো রয়েছে নানা মিশ্রজাতির রক্ত। ইংরেজের মধ্যে কেলটিক আর জারমান; ফরাসিদের মধ্যে কেলটিক, ইবেরিক আর জারমান; জারমানিতে জারমান আর শ্লাভ, রুশদের মধ্যে মোঙ্গলীয় আর শ্লাভ নেই কি? বিভিন্ন ভাষাও তো অন্তরায় নয়। তাহলে সুইজারল্যান্ড একটা নেশন হয় কী করে?

একই আলোবাতাসের মধ্যে একই মাটিতে একই অন্নে পুষ্ট হিন্দু মুসলমান দীর্ঘদিন একসঙ্গে সুখে দুঃখে বাস করছে। হয়তো সুখের চেয়ে দুঃখই পেয়ে আসছে বেশি। কিন্তু একসঙ্গে দুঃখ ভোগ করা, তাতেই তো মানুষকে মানুষের হৃদয়ের কাছে নিয়ে আসে। নিবিড় করে মিলিয়ে ধরে। একই দুঃখে পরস্পর যখন চোখের জল ফেলি, তখন তো আর আমরা পর নই, আমরা ভাই। স্মরণ করি আমাদের দেশের একজন মহা-পুরুষের মহামন্ত্র, যার মধ্যে পাব আমরা হিন্দু মুসল-মানের মিলনের সূত্র—"দ্য প্রাইড ইন দ্য পাসট, দ্য পেন ইন দ্য প্রেজেনট, দ্য প্যাশন ইন দ্য ফিউচার।"

গ্রন্থনির্দেশ

১ বর্তিকা, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৭, পৃ ২৬
২ Before the advent of the Islam, throughout the Middle-East region from Samarquand to Egypt, there were prevalent some ascetic systems, such as Buddhism, Gnosticism, etc. (*Sufi Thoughts*, S.R. Sharda, p. 6)
৩ *Judaism on Islam*, Abraham I Katsch, pp xiii-xiv
৪ *India & World Civilization*, D.P. Singhal, Rupa & Co., p. 161
৫ Ibid, p. 162
৬ ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ ১৭
৭ *Outlines of Islamic Culture*, A.M.A. Shushtry, Bangalore, 1954
৮ ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন ১৩৫৬, পৃ ১৮
৯ *Sufi Thoughts*, S.R. Sharda, p. 51
১০ Ibid, p. 71

১১ While they remain outside the orthodox tradition of India, the Bauls nevertheless represent one of the underground currents of spiritual life which remain entensely alive. This current can be traced to a time even before that of the Vedic religions."—Sri Anirvan. (*To Live Within*, Lizelle Reymond. Penguin Books, p. 341

১২ ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ ৬১

১৩ উদ্ধৃতি : তদেব, পৃ ১০৩

১৪ ভারতের সংস্কৃতি, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ ৩১

১৫ তদেব, পৃ ৩১

১৬ ভারতে হিন্দু মুসলমান, নলিনীকান্ত গুপ্ত, প্রথম সংস্করণ, আর্য পাবলিশিং হাউস, পৃ ৬৭

১৭ তদেব, পৃ ৬৪

১৮ তদেব, পৃ ১৫

সহায়ক গ্রন্থ

১৯ *The Foundations of Indian Culture*, Sri Aurobindo.

২০ *Bandemataram*, Sri Aurobindo.

২১ *The Human Cycle*, Sri Aurobindo.

২২ 'নাথপন্থ', কল্যাণী মল্লিক

২৩ ভারতীয় সাধনার ঐক্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত

২৪ *The Web of Indian Life*, Nivedita.

২৫ বাঙ্গালীর ইতিহাস, নীহাররঞ্জন রায়

২৬ ভারতরহস্য, নলিনীকান্ত গুপ্ত

ক্রান্তদর্শী

অন্নদাশঙ্কর রায়

একুশ

সুকুমার সপরিবারে বিলেত ফিরে যাবার সময় যে চিঠি লিখেছিল তার জবাবে মানস বলেছিল, "ভালোই করেছ। দেশটা এখন একটা আগ্নেয়গিরি। যে-কোনো দিন লাভাবর্ষণ শুরু হতে পারে। তার আগেই ইংরেজরা সরে পড়বে মনে হচ্ছে। এই তো সেদিন এই স্টেশনের শেষ ইংরেজটিও বদলি হয়ে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন একজন মুসলমান। পূর্বপরিচিত। অসাম্প্রদায়িক। জেলা ম্যাজিসট্রেটও তেমনি অসাম্প্রদায়িক মুসলমান। কিন্তু আমাদের সকলেরই অগ্নিপরীক্ষার দিন আসবে, যেদিন পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে পলিটিসিয়ানদের বিরোধ সম্পূর্ণ অমীমাংসা হবে। এক উত্তরাধিকারী, না দুই উত্তরাধিকারী—এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হবে। যাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তাদের ডাক দিলে কেউ হাঁক দেবে, 'আল্লা হো আকবর', কেউ হাঁক দেবে, 'সৎ এ অকাল', আবার কেউ হাঁক দেবে, 'দুর্গামাতা কী জয়'। একজনও হাঁক দেবে না, 'বন্দে মাতরম' বা 'ভারতমাতা কী জয়'। জান তো, গতবার যুদ্ধে যাবার সময় এরা কেউ দেশের নামে প্রাণ দিতে যায় নি। রাজার নামেও নয়। রাজার প্রতি আনুগত্যের স্থান নিয়েছে ধর্মের প্রতি আনুগত্য। বিপ্লববাদিনী মধুমালতী আর সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে এখন সিপাহিদের উপর শেষ ভরসা রেখেছেন। কিন্তু ইংরেজরা চলে যাবার আগে যদি উত্তরাধিকারী কারা হবে, এই প্রশ্নের সর্বসম্মত মীমাংসা না করে যায়, তবে ধর্ম অনুসারে বিভক্ত সিপাহিরা পরস্পরের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করে এর একটা ধর্মসম্মত মীমাংসা করবে। ভারত স্বাধীনও হবে, বিভক্তও হবে। মধুমালতী কি এরকম এটা সমাধান চান? কেন তবে সিপাহি-বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখছেন? শুধু তিনি নন, বামপন্থী-দের অনেকেই। জনগণকে তাঁরা সঙ্গে নিতে পারেন নি, সেই অভাব পূরণ করতে চাইছেন জওয়ানগণকে সঙ্গে নিয়ে। নৌসেনাবিদ্রোহ তারই প্রথম ধাপ। মধুমালতী ঘটনাচক্রে সেই ধাপে পা দেন। পা ভুল জায়গায় ফেলে-ছিলেন। ফিরে গিয়ে ভালোই করেছেন।"

এর উত্তরে সুকুমার এক লম্বা চিঠি লেখে। তার সঙ্গে গোঁজা ছিল একটা ছোট্ট চিঠি। মিলি লিখেছে

যূথিকাকে। "ছ বছর বিদেশে থাকার পর দেশে ফিরে দেখি, আমি আর-একটি রিপ ভ্যান উইঙ্কল। বিদেশই আমার কাছে দেশ, দেশ আমার কাছে বিদেশ। ভুল-ভ্রান্তি স্বাভাবিক। তবে একটা বিষয়ে আমি ভুল করি নি। লক্ষ করেছি ইংরেজরা ভারত ছাড়বে, তবু মুসলমানদের ছাড়বে না। আর কংগ্রেসওয়ালারা গদি ছাড়বে, তবু মুসলমানদের ছাড়বে না। কংগ্রেস নেতারা একজন মুসলিমকে সঙ্গে না নিয়ে ইনটারিম গভরনমেনটে আসবেন না। বরং ওয়েভেলের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন। ওয়েভেলের এর পরে কর্তব্য কী? জিন্নাকে কথা দিয়ে কথা না রাখা? জিন্না সেই অভিযোগই করেছেন। কেয়ারটেকার গভরনমেনট গঠন করা? ওয়েভেল সেই পন্থাই ধরেছেন। এটা তৃতীয় পন্থা। কিন্তু এ পথে কারো সঙ্গেই মিটমাট হতে পারে না। তালা যেমন বন্ধ তেমনি বন্ধই থাকবে। সকলেই বলাবলি করছে এবার কংগ্রেস করবে কী? গণসত্যাগ্রহ? লীগ করবে কী? গণহত্যাগ্রহ? রাজদ্রোহ নয়। সেটা তার ইংরেজ মিতারা বরদাস্ত করবেন না। বেড়াল তা হলে কোনদিকে ঝাঁপ দেবে? জান তো ভিতরের খবর দিয়ে। জুলি তো তার বরকে নিয়ে মেতে আছে। তা ওরা সুখী হোক। রণকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছি। সে কেবল দাদু-দিদুর কথাই বলছে। তাঁদের খুঁজছে।"

মিলির চিঠি যূথিকাকে দিয়ে মানস সুকুমারের চিঠি পড়তে বসে।

সুকুমার লিখেছে, "জাহাজে এবার বিষম ভিড়। সাহেব মেমসাহেবে বোঝাই। আমরা কজন কালা আদমি একেবারে কোণঠাসা। আলাদা একটা ডাইনিং টেবিলে স্বাপান্তরিত। আমাদের মুখোমুখি যাঁদের আসন তাঁরা এক গুজরাতি মুসলিম দম্পতি। সুলেমান সোমজী আর আয়েশা সোমজী। আমরা তখন ধর্মসচেতন নই, চর্মসচেতন। ইংরেজিতেই কথাবার্তা চালাতে হয়, তাই বেপরোয়াভাবে সাহেবলোকের বর্ণবিদ্বেষের নিন্দাবাদ করতে পারি নে। বরং একটু অনুকম্পা বোধ করি। আহা, বেচারিরা ছ-সাত বছর পরে দেশে ফিরছে। ডেকে যখন বেড়াই একসঙ্গে বেড়াই। সেই সূত্রে মনের কথা খুলে বলি। ওঁরা মধ্যবয়সি। যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্য লনডনে। মাস ছয়েক থাকবেন। ভদ্রলোক একটা গুজরাতি পত্রিকার সম্পাদক। সেটার কয়েক পাতা ইংরেজি।

বললেন, গান্ধীও গুজরাতি, জিন্নাও গুজরাতি, বল্লভভাই গুজরাতি, মুন্‌শীও গুজরাতি, আমিও গুজরাতি। আমরা পরস্পরের জ্ঞাতি। তা হলে দুই নেশন বলে দাবি করতে যাই কেন? মেজরিটি মাইনরিটি কোন্ দেশে নেই? তা বলে কি তারা দুই নেশন? একথা যুক্তিযুক্ত নয়। তবু অর্থবহ। আসলে যা হয়েছে তা এই যে বৃদ্ধ বাদশাহ শাহ্‌জাহান এখন মুমূর্ষু। তাঁর পুত্রদের মধ্যে বেধে গেছে উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব। মোগলদের মধ্যে এমন কোনো নিয়ম ছিল না যে জ্যেষ্ঠপুত্রই হবে পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী, অন্যেরা হবে তাঁর অধীন অনধিকারী। এই নিয়ে প্রত্যেকবারই গোলমাল বাধে। এর নিষ্পত্তি হয় গায়ের জোরে। জোর যার মুলুক তার। শাহ্‌জাহানের নিজের বেলাও তাই হয়েছিল। এখন আমাদের সামনেও আছে একই প্রশ্ন। বর্তমান শাসনতন্ত্রে এমন কোনো ব্যবস্থা নেই যে ইংরেজরা চলে যাবার সময় ক্ষমতার হস্তান্তর করে যাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার মেজরিটির হাতে। মেজরিটি রুল একটা বিদেশী কনভেনশন। এদেশে সেটা প্রথাসিদ্ধ বা বিধিবদ্ধ হয় নি। কংগ্রেসকে আমরা একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিতে পারি নে। এ যুগের আওরংজেব এ যুগের দারাকে আপসে দিল্লী ছেড়ে দিতে রাজি, কিন্তু দারাকেও আপসে কলকাতা আর লাহোর ছেড়ে দিতে হবে।

তা শুনে আমি চমকে উঠি। বলি, জানেন না, কলকাতা হচ্ছে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের ডেন। বাঘের বাচ্চারা কেউ বা টেররিসট, কেউ বা কমিউনিসট। দারার কথায় আওরংজেবকে ওরা ওদের আস্তানা ছেড়ে দেবে কেন? উনি বলেন, ইংরেজরা যদি যাবার আগে অ্যাওয়ার্ড দিয়ে যায়? আমি বলি, তা হলে প্রথম কামড় বসবে ইংরেজদেরই ঘাড়ে। ওদের রাজস্ব তো যাবেই, বাণিজ্যও যাবে। দ্বিতীয় চোট পড়বে লীগপন্থী মুসলমানদের গায়ে। ওঁরা কেমন করে রাজত্ব করেন দেখে নেবে বামপন্থীরা। তিনি বলেন, এ তো বড়ো অন্যায়! আমরা গুজরাতি মুসলমানরা রাজ্য চাই নে, বাণিজ্য চাই। বোমবাই হাতছাড়া হলে কলকাতাই হত আমাদের বাণিজ্যকেন্দ্র। কলকাতা না থাকলে পাকিস্তান কানা হয়ে

যাবে। আমি বলি, তা হলে পার্টিশনের দাবি তুলে নিন। কোয়ালিশনের জন্যে চেষ্টা করুন।

ওদিকে আয়েশা বেগমের সঙ্গে মিলির খুব ভাব। বেগম বলছিলেন, লনডনে আমরা মহামান্য আগা খানের অতিথি হব। তিনি আমাদের ধর্মগুরু। তাঁর অসংখ্য হিন্দু শিষ্য। তাঁদের কাছে তিনি বিষ্ণুর দশম অবতার। আমরা হিন্দুবিদ্বেষী নই।

লনডনে ফিরে আমার প্রথম কাজ হল ক্যাবিনেট মিশনের ভারত রওনা হবার মুখে ক্রিপসের অন্তরঙ্গ মহলে খোঁজখবর নেওয়া। ওঁরা কি কোনোরকম অ্যাওয়ার্ড হাতে করে নিয়ে যাচ্ছেন? তাই যদি হয় কলকাতা কার ভাগে পড়বে? জানেন তো ওটা টেররিসট আর কমিউনিসটদের আস্তানা। তারা সবাই বাঙালি হিন্দু। ওঁরা আমাকে আশ্বাস দিলেন মিশন এখনো মনঃস্থির করেন নি, বিভিন্ন পার্টির নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব দিক বিবেচনা করে তাঁদের অ্যাওয়ার্ড নয়, সুপারিশ ঘোষণা করবেন। এখন থেকে এবং এখান থেকে বলতে পারা যায় না কী কী সুপারিশ। তবে ব্রিটিশ পলিসির সার কথা কী সেটা বলতে বাধা নেই। এককালে ব্রিটিশ পলিসি ছিল, র‍্যালি দ্য মডারেটস। তার পরে হয়, র‍্যালি দ্য মুসলিম। যুদ্ধের পর থেকে হয়েছে, র‍্যালি দ্য রাইটিসট। এখন সবচেয়ে বড়ো আপদ হয়েছে বামপন্থীরা। চন্দ্র বোস নেই, কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণ আছেন। তাঁর পেছনে আছেন পণ্ডিত নেহরু। নেহরুর পিঠে চেপে রয়েছেন সিন্ধবাদ নাবিকের সেই বৃদ্ধ। ব্রিটিশ অফিসাররা কেউ আর কংগ্রেসের সঙ্গে লড়তে চান না, অথচ ব্রিটেনের একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে একমাত্র তারই হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর করতেও অনিচ্ছুক। শেষ পর্যন্ত হয়তো তাঁরা ক্ষমতার হস্তান্তর না করেই ভারত ত্যাগ করবেন। তার পরে ভারত যদি এক থাকে তবে ভারত সরকারের সঙ্গে সন্ধি, যদি দ্বিধা হয় তবে দুই সরকারের সঙ্গে সন্ধি, যদি তিন হয় তবে তিন সরকারের সঙ্গে সন্ধি। আমি বলি তিন কেন? এর উত্তরে তাঁরা বলেন, শিখদের আলাদা একটা রাষ্ট্র থাকতে পারে। পাটিয়ালা, কাপুরথালা, নাভা প্রভৃতি শিখ রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটিশশাসিত জেলা জুড়ে-জুড়ে শিখস্থানও কি গড়ে উঠতে পারে না? শিখেরা পাকিস্তানের মাইনরিটি হতে চাইবে কেন? আমাকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে বাঙালি, অসমীয়া আর পানজাবি হিন্দুদেরকেও পাকিস্তানের মাইনরিটি হতে বাধ্য করা হবে না। এসব সমস্যার মীমাংসার জন্যে কনস্টিটুয়েনট অ্যাসেমবলির অধিবেশন ডাকা হবে। অ্যাসেমবলির তৈরি শাসনতন্ত্রই ব্রিটেন গ্রহণ করবে। যদি সর্বসম্মত হয়। মেজরিটির ভোটে মাইনরিটির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে না। তা সে শিখ মাইনরিটিই হোক আর মুসলিম মাইনরিটিই হোক আর হিন্দু মাইনরিটিই হোক।"

সুকুমার আরো লিখেছে, "ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ কংগ্রেস তার আপত্তি সত্ত্বেও মেনে নিয়েছে দেখে প্রীত হয়েছি। এ না হলে কনস্টিটুয়েনট অ্যাসেমবলিই বসত না। কিন্তু বড়লাটের প্রাণপণ প্রয়াস সত্ত্বেও কংগ্রেস তাঁর ইনটারিম গভনরমেনটে যোগ দেবে না শুনে মর্মাহত হয়েছি। আমার বাজির ঘোড়া তো নেহরু। তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী না হন তো আমিই বা কার ভরসায় চাকরির খোঁজে স্বদেশে ফিরব? একা মুসলিম লীগ যোগ দিয়ে আখের গুছিয়ে নেবে। কিন্তু শুনে অবাক হয়েছি যে বড়লাট ইনটারিম গভরনমেনট গঠন স্থগিত রেখে কেয়ারটেকার গভরনমেনট গঠন করেছেন, তাতে শুধু অফিসিয়ালরাই থাকছেন। খোঁজ নিয়ে শুনতে পাই তিনি জিন্নাকে ডিফেন্স আর লিয়াকৎ আলী খানকে হোম দিয়ে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে শিখদের আর কংগ্রেস সদস্যদের যোগদানের পথ রুদ্ধ করবেন না। তাঁদের জন্যে দুয়ার খোলা রাখাই তাঁর পলিসি। জিন্না বলছেন, বড়লাট তাকে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করেছেন। বলবেনই তো। 'পারফিডিয়াস আলবিয়ন' বলে একটা প্রবাদ আছে না? এখন তিনি কী করবেন? বিদায় করছ যারে নয়নজলে আবার ফিরাবে তারে কিসের ছলে?"

ইতিমধ্যে যমুনা নদীর জল অনেক দূর গড়িয়েছে। জিন্না সাহেব এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন। কনস্টিটুয়েনট অ্যাসেমবলি আর ইনটারিম গভরনমেনট। শুধু তাই নয়, ডাইকেরট অ্যাকশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছেন। অগস্ট মাসের দুদিন আগে হলেও এই তাঁর অগস্ট প্রস্তাব। গান্ধীজীর অগস্ট প্রস্তাবের মতো এটাও বোমবাইতে গৃহীত। কিন্তু কী আশ্চর্য! কেউ তাঁকে বা তাঁর ওয়ারকিং কমিটির সদস্যদের গ্রেফতার করে

নজরবন্দী করে নি! উলটে বড়লাট তাঁকে আবার আমন্ত্রণ করেছেন, কিন্তু কংগ্রেস-মুসলিমদের একজনকে বড়লাটের ক্যাবিনেটে নেওয়ার উপর ভীটো জারি করতে দেন নি। এটা যে কেবল কংগ্রেসের উপরেই নিষেধাজ্ঞা তাই নয়, বড়লাটের উপরেও নিষেধাজ্ঞা। মুসলিম লীগ তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেও কংগ্রেস তা করে নি। কংগ্রেস মুসলিম লীগের উপর কোনোরকম ভীটো জারি করে নি। বড়লাট কংগ্রেসের নতুন সভাপতি জবাহরলাল নেহরুকে ইনটারিম গভরনমেনট গঠনের ভার দেন, কিন্তু নিজে সাক্ষীগোপাল হতে নারাজ হন। তিনি ব্রিটিশ পারলামেনটের কাছেই দায়ী থাকবেন, ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে নয়। সে দায় কংগ্রেসের। লীগ থাকলে লীগেরও। মতবিরোধ বাধলে নেহরু সদলবলে পদত্যাগ করতে পারেন। বড়লাট তাঁকে ঢালা অনুমতি দিলেও জিন্নার সঙ্গে পরামর্শ করতে বলেন। জিন্না যদি আসতে রাজি হন তা হলে কোয়ালিশন গভরনমেনট হবে। সেটাই বড়লাটের অন্বিষ্ট। আপাতত না হলেও পরে হয়তো সেটা সম্ভব। তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তাই ডাইরেকট অ্যাকশন শুরু করলেও মুসলিম লীগের সাত খুন মাফ।"

চিঠি দুটো পড়ে যুথিকা বলে, "আমি তো দেখছি ইংরেজদের আর ভারতশাসনে রুচি নেই। ওরা মানে-মানে ক্ষমতার হস্তান্তর করে দেশে ফিরে যেতে পারলে বাঁচে। তবে, হ্যাঁ, ভারতের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক পাতাতেও চায়। যাতে তাদের বাণিজ্যে হাত না পড়ে, যাতে তাদের শত্রুরা ভারতে এসে তাদের স্থান না নেয়। তারা এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করেছে যে কানু বিনে গীত নেই, কংগ্রেস বিনে কেন্দ্রীয় গভরনমেনট নেই। একক-ভাবে মুসলিম লীগের সে কর্ম নয়। তাই কংগ্রেসের অবর্তমানে মুসলিম লীগকে গভরনমেনটের দায়িত্ব দেয় নি। বাধ্য হয়ে কংগ্রেসকেই তারই শর্তে দিতে হয়েছে। তার শর্ত তার ভাগ থেকে একটি আসন সে একজন মুসলমানকে দিতে পারবে, বিশেষত যখন একটা প্রদেশ কংগ্রেস-মুসলিমরাই শাসন করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁদের কি কোনো প্রতিনিধি থাকতে মানা? মানা করছেন যিনি তিনিই তো অনধিকার।"

মানস স্বীকার করে। "কিন্তু জিন্নার ধারণা মুসলিম ঐক্যের খাতিরে মুসলিম লীগকেই একমাত্র মুসলিম প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে হবে। কংগ্রেস মুসলিমরা কুইসলিং। নরওয়ের নাৎসি সমর্থক কুইসলিংএর অনুরূপ। এই মহান সত্যটা চারচিল হলে মেনে নিতেন, অ্যাটলি মানতে রাজি নন। নেহরুকে বন্ধুরূপে পেতে হলে নেহরুর বন্ধুকেও পেতে হবে। মওলানা আজাদও নেহরুর মতো যুদ্ধে সহযোগিতা করতে রাজি ছিলেন, যদি গান্ধী বিমুখ না হতেন। আর ইউনিয়নিস্টরা তো অকৃপণ সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের কেমন করে কুইসলিং বলে গণ্য করা যায়? বড়লাট তাঁদের একজনকে একটা আসন দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, জিন্নার আপত্তি থাকায় তিনি পেছিয়ে যান। নইলে এক বছর আগেই ইনটারিম গভরনমেনট গঠন করা সম্ভব হত। ইংরেজদের দিক থেকেও অনিচ্ছা ছিল না, কংগ্রেসের দিক থেকেও অনিচ্ছা ছিল না, ইউনিয়নিস্ট মুসলিমদের দিক থেকেও অনিচ্ছা ছিল না। একমাত্র মুসলিম লীগের দিক থেকেই ছিল অলিখিত এক ভীটো। সে ভীটো লেবার গভরনমেনট অস্বীকার করেছেন। এইটেই ডাইরেকট অ্যাকশন প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত কারণ। জিন্নার বোধহয় ধারণা ছিল যে এবারেও তিনি বড়লাটকে নিবৃত্ত করতে পারবেন। কিন্তু ঘটনার গতি বড়লাটকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের রদবদল জরুরি। ইউরোপীয় অফিসাররা ছ-সাত বছর হল দেশে ফেরার অনুমতি পান নি। পাবেন পয়লা জানুয়ারি থেকে। স্ত্রীদের পাঠাতে আরম্ভ করেছেন, তাই জাহাজে এত ভিড়। ক্ষমতা হস্তান্তরের তাড়াহুড়ো ইউরোপীয়দের মধ্যেই বেশি। জিন্না সাহেব ডাইরেকট অ্যাকশনের হুমকি দিচ্ছেন, কিন্তু গান্ধীজী হুমকি না দিলেও সকলে জানে যে তিনি আবার গণসত্যাগ্রহের ডাক দিতে পারেন। সেটা আরো মোক্ষম।"

যুথিকা তা শুনে তর্ক করে। "কিন্তু ইংরেজ যদি স্বেচ্ছায় ভারত ছাড়ে তবে আবার গণসত্যাগ্রহের কী প্রয়োজন? সঙ্গে-সঙ্গে যদি গৃহযুদ্ধ বেধে যায় গণ-সত্যাগ্রহ কোন্ কাজে লাগবে? দেখতে-দেখতে সেটা গণহত্যাগ্রহে পরিণত হবে। তখন তাকে থামানোই দায়। তাতে মুসলিম লীগেরই সুবিধে। হিন্দুদের হাতে সংখ্যালঘু মুসলমানরা যদি মরে মুসলিম জওয়ানরাও যুদ্ধে নামবে। শহরকে শহর লুটে করবে, পুড়িয়ে দেবে। সংখ্যালঘু হিন্দুরা প্রাণ নিয়ে পালাবে। তখন সেইসব

ছেড়ে-আসা জায়গা নিয়ে পাকিস্তান হবে। অহিংসা দিয়ে তা রোধ করতে পারা যাবে না। সারা দেশে একশো জন সত্যিকার অহিংসাবাদী আছেন কি না সন্দেহ। সৌম্যদা পর্যন্ত ডাইনামাইট দিয়ে পুল উড়িয়েছেন। মানুষ মরে নি, এই তাঁর সাফাই। যারা রেল স্টেশন পুড়িয়েছে তারাও তো সেই সাফাই দেবে। না, একমুঠো সত্যিকার সত্যাগ্রহীকে নিয়ে গণসত্যাগ্রহ হয় না। ইনডিয়ান আরমিকে ইংরেজদের হাত থেকে নিজেদের হাতে নিতে হবে। ক্ষমতার হস্তান্তর বলতে এই বোঝায়। মুসলিম রেজিমেনটগুলো কংগ্রেসের হাতে পড়তে রাজি হবে না, তারা লীগকেই পছন্দ করবে। শিখ রেজিমেনটগুলোর বোধহয় শিখিস্থানের উপর ঝোঁক। সময় এসেছে রিয়া-লিস্ট হবার। ইংরেজের সঙ্গে আপস করতে হবে। কিন্তু মানে-মানে আপস। অ্যাটলি কংগ্রেসের মুখ রেখেছেন, লীগের মুখ রাখেন নি। তাই লীগ খেপেছে। কিন্তু ইপ্স-বপ্স এক হলে রণে ভপ্স দেবে। কী ভাগ্য লেবার ক্ষমতায় এসেছে। সূর্যের আলো থাকতেই ঘর ছেয়ে নাও। চারচিল ফিরে এলে পশতাবে। পাঁচ বছর পরে লেবার থাকবে কি না কে বলতে পারে? আরো আগেই যাবে, যদি আবার যুদ্ধ বেধে যায়। বারলিন নিয়ে বাধতে পারে।"

একেই বলে কান্তাসম্মিত। মানস হাসে, "এই প্রথম শুনছি যে তুমি আপসের পক্ষপাতী। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে আপস তো মুসলিম লীগের সঙ্গেও আপস। লীগ মুখে যাই বলুক তার পিস্তল একজন ইংরেজেরও গায়ে লাগবে না। লাগলে লাগবে শত-শত হিন্দুর গায়ে। হ্যাঁ, জিন্না বলছেন তাঁর হাতেও একটা পিস্তল আছে। তিনি আর কনস্টিটিউশনাল উপায়ে আন্দোলন করবেন না। গৃহযুদ্ধ বাধাবেন। গৃহযুদ্ধ থামাবার জন্যে তাঁকে আপসে কতক জায়গা ছেড়েই হবে। আর নয়তো লিঙ্কনের মতো এসপার কি ওসপার না হওয়া পর্যন্ত লড়তে হবে। সে দায়িত্ব কংগ্রেস নেবে না। সে সত্যাগ্রহই শিখেছে, হত্যাগ্রহ শেখে নি। চরিত্রও হারাবে, যুদ্ধেও হারতে পারে। ওদের ছিল স্বাধীন দেশ, এদেশ তা নয়।"

দিনকয়েক পরে খাদি কর্মী বঙ্কিম কর দেখা করতে আসেন। বলেন, "সৌম্যদার বার্তাবহ হয়ে এসেছি। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ওদের ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। ও দফায়-দফায় নিমন্ত্রণ করছে ওর পুরনো সহকর্মীদের। উদ্দেশ্য বউদির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেওয়া। উনি তো গান্ধীমার্গে নবীন আগন্তুক। আমরা কারা, কী আমাদের সাধনা, কেন সত্যাগ্রহ, গঠনকর্মের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে বউদিকে খুব কম সময়ের মধ্যে তৈরি করে নিতে হচ্ছে। তাঁকে বোঝাতে হচ্ছে বীরত্বের আরো একরকম অর্থ আছে। অন্যায়ের যে প্রতিরোধ করে, অথচ তা করতে গিয়ে নিজে অন্যায় করে না, সেও একজন বীরপুরুষ বা বীরাঙ্গনা। গত পঁচিশ বছরে আমি বহু দৃষ্টান্ত দেখেছি। এক-এক করে বিবরণ দিই। বউদি আগ্রহ নিয়ে শোনেন। তার পরে সৌম্যদার সঙ্গেও তাত্ত্বিক আলোচনা চলে। আমরাও একজাতের ডায়ালেক-টিকসে বিশ্বাস করি। ডায়ালেকটিকাল ননভায়োলেনস। এইসব নিয়ে দিন সাতেক কেটে যায়। বাঃ! চিঠিখানাই দিতে ভুলে গেছি! এই নিন।"

মানস চিঠিখানা খুলে পড়ে। সৌম্যদা লিখেছে, "আমাদের খবর বঙ্কিমের মুখে শুনবে। আমরা নতুন বাসায় এসে নতুন করে জীবন আরম্ভ করেছি। কিন্তু সামনে আসছে এক প্রাণান্তকর পরীক্ষা। এত বড়ো চ্যালেনজ আমাদের জীবনে আর আসে নি। জিন্না সাহেবের ডাইরেকট অ্যাকশনের কথা বলছি। উনি নাকি নিজেই বলেছেন যে ওটা কেবল ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসেরও বিরুদ্ধে। এ তো বড়ো মজার কথা! কংগ্রেস কি জিন্না সাহেবকে আশা দিয়ে আশাভঙ্গ করেছে? কংগ্রেস তো চায় নি যে বড়লাটের শাসনপরিষদে মুসলিম লীগের সদস্যসংখ্যা কমুক। তাদের সংখ্যা কমেও নি। নিজের সদস্যদের একজন হিন্দু না হয়ে মুসলিম হোন, এটাই তার অনুরোধ। বড়লাট তার অনুরোধ রক্ষা করেন নি বলে কংগ্রেস ওঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। কংগ্রেস কী করে জানবে যে বড়লাট মুসলিম লীগকে গভরনমেনট গঠনের ভার না দিয়ে কেয়ারটেকার গভরন-মেনট গঠন করবেন? এটাই বা কী করে সে জানবে যে তার একজন মুসলিম কর্মীকে নিজের ভাগের একটি আসন ছেড়ে দেবার অধিকার তার আছে এটা বড়লাট তাঁর পরবর্তী প্রস্তাবে মেনে নেবেন? এর ফলে বড়-লাটের শাসনপরিষদে মুসলমান সংখ্যাই তো একটি বেড়ে গেল। হিন্দু সংখ্যা তো একটি কমে গেল। হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা সমান-সমান হল। অন্যায়টা হল কোথায়? কার প্রতি? মুসলমানরা সম্প্রদায়ই হোক

আর নেশনই হোক, তাদের প্রতি বড়লাট বা কংগ্রেস কেউ কোনো অন্যায় করেন নি। কিন্তু মুসলিম লীগ যদি ডিরেক্ট অ্যাকশন চালায় তবে ইংরেজ এবং হিন্দু উভয়েরই বিপদ। যদি না অহিংসা পালিত হয়। এঁরা যদি একই মুদ্রায় শোধ দেন তবে দুই পক্ষেই অন্যায় হবে। আমরা পড়ব মুশকিলে। সত্যাগ্রহ বলতে এতদিন আমরা বুঝেছি একপক্ষে অন্যায় আর অপর পক্ষে ন্যায়। আমরা ন্যায়ের পক্ষ নিয়েছি। এবার সম্ভবত হবে দুই পক্ষেই অন্যায়। দুই পক্ষেই বহু নিরীহ মানুষ হতাহত হবে। আমরা তবে কোন্ পক্ষে দাঁড়াব? কোনো পক্ষেই না। আমাদের কর্তব্য হবে মাঝখানে দাঁড়িয়ে উভয়কে থামানো আর থামাতে গিয়ে উভয়ের হাতে মার খাওয়া। হয়তো মার খেয়ে মরা। বলা বাহুল্য আমরা আর কজন। এইটুকুতে কি গৃহযুদ্ধ থামবে? যেখানে ইংরেজরাও স্বীকার করছে যে কংগ্রেসের অধিকার আছে সেখানে ন্যায় তো কংগ্রেসেরই পক্ষে। কিন্তু হিংসার দুষ্ট বৃত্তে জড়িয়ে পড়লে অন্যায় দুই পক্ষেই হবে। হিংসার উত্তর অহিংসভাবেই দিতে হবে। সহিংসভাবে নয়। এ এক প্রাণান্তকর পরীক্ষা। আমরা এ পরীক্ষায় সফল না হলে গান্ধীজীর শিক্ষা ব্যর্থ হবে। তিনি কি আর বাঁচতে চাইবেন?"

চিঠিখানা যূথিকার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মানস বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আলাপ করে। জিজ্ঞাসা করে জুলিকে তিনি কেমন দেখলেন।

"ঝি-চাকর রাখেন নি। নিজেই যাবতীয় গৃহকর্ম করেন। ঘর ঝাঁট দেওয়া, মেজে নিকোনো, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, তরকারি কোটা, রান্না করা—সমস্তই তাঁর একার কাজ। আশ্রমের কর্মশালায় গিয়ে সুতো কাটেন, কাপড় বোনেন, লঙ্গরখানায় গিয়ে পরিবেশন করেন, কারো অসুখ করলে সেবা করেন। আশ্রমে একটা লঙ্গর-খানা আছে। নিখরচায় কর্মীরা সবাই দুপুরবেলা খেতে পায়। ডাল, ভাত, একটা ছক্কা, তার সঙ্গে চাটনি আর স্যালাড। পুরুষেরা সবাই এক পঙ্‌ক্তিতে। কী হিন্দু, কী মুসলমান। কী ব্রাহ্মণ, কী হরিজন। তেমনি মেয়েদের সবাই এক সারিতে। একটু তফাতে। পরিবেশনটা মেয়েরাই করে। রান্নাটা পুরুষেরা। সবাই স্বেচ্ছাসেবক আর সেবিকা। অবশ্য কর্মীরা যে যার কাজের জন্যে মজুরি পায়। যার যেমন মজুরি। কামার আছে, কুমোর আছে, তাঁতি আছে। কাটুনি আছে, তেলি আছে। আর আছে ছুতোর মিস্ত্রি। তবে সোমাদার সহকর্মীরা অনেকে সরে পড়েছেন। তাঁদের কেউ বা এখন কমিউনিস্ট, কেউ বা নেতাজী-ভক্ত, কেউ বা সাবারকর-শিষ্য। কয়েকজন এখনো টিকে আছেন শত প্রলোভন আর নির্যাতন সত্ত্বেও। আশ্রমের কাজকর্ম সংকুচিত হয়েছে। কয়েকটা বিভাগ উঠে গেছে।" বঙ্কিমবাবু দুঃখ করেন।

যূথিকা জানতে চায়, "জুলি কি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে?"

"না, ছেড়ে দেন নি। কিন্তু ওঁর স্বামীর সঙ্গে পা মিলিয়ে নিচ্ছেন। হিংসা আর অহিংসা এদের মধ্যে মাত্র একটি অক্ষরের ব্যবধান। তবু তা গভীর এবং দুস্তর। উনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন স্বামীর রাজনীতিকে নিজের রাজনীতি করতে। তবে ওঁর নিজেরও তো একটা সাধনা আছে। উনি চান একই পুরুষের বউ হতে, বোন হতে, মা হতে, মেয়ে হতে, বান্ধবী হতে, প্রেমিকা হতে, সঙ্গিনী হতে। অথচ বিপ্লবের ভূত ওঁর ঘাড় থেকে নামছে না। উনি চান ওঁর বন্ধু বাবলীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে। চাষানির সঙ্গে চাষানি, মজুরানির সঙ্গে মজুরানি। অমনি করে শ্রেণী-চ্যুত হয়ে বিপ্লব ঘটাতে। ওঁর মাথায় কি একটু ছিট আছে?" বঙ্কিমবাবু হাসতে-হাসতে বলেন।

"শুধু ওর মাথায় কেন? ওর পতিদেবতার মাথায়ও।" যূথিকা খিলখিল করে হাসে। "উনি ভেবে-ছেন শহীদিয়ানা দিয়ে উনি হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান করবেন। এদেশে চল্লিশ কোটি ভারতীয়, আর ইংরেজ মাত্র চুয়াল্লিশ হাজার। চল্লিশ কোটি ইচ্ছা করলে চুয়াল্লিশ হাজারকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে। ইঙ্গ-ভারতীয় সমস্যা তো একটা সমস্যাই নয়। অপর পক্ষে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা একটা অমীমাংসা সমস্যা। আমরা ওদের তাড়িয়ে দিতেও পারি নে, আপনার করতেও পারি নে, রাজা করতেও পারি নে, প্রজা করতেও পারি নে। ওরাও আমাদের তাড়াতেও পারে না, কনভার্ট করতেও পারে না, রাজা করতেও পারে না, প্রজাও করতে পারে না। সেই যে আরব আর তার উট—তারই মতো ব্যাপার। আরব ছিল তার তাঁবুতে, উট শীতে কাঁপতে-কাঁপতে এসে আশ্রয় চায়। প্রথমে ঢোকায় মুখ, তার পরে গলা, তার পরে সামনের দুটো পা, তার পরে

ধড়, তার পরে পেছনের দুটো পা। উটই তাঁবু জুড়ে শোয়। আরব হিঁহিঁ করে কাঁপতে-কাঁপতে তাঁবু ছেড়ে আর-কোথাও আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। তেমনি, এদেরও কি দাবির অন্ত আছে? এক-এক করে কত কী না পেয়েছে, এবার চায় পাকিস্তান। সেইখানেই কি ইতি? না, পরে একদিন বলবে, হিন্দুস্থান হামারা। ভাগো হিঁয়াসে। ইংরেজের মতো আমরাও তাড়া খেয়ে পালাব। কিন্তু কোথায়? দেয়ালে পিঠ রেখে লড়তেই হবে একদিন না একদিন। সেদিন কজন অহিংস থাকতে পারবে, শহীদ হতে পারবে?"

বঙ্কিমবাবু নিরুত্তর। চা শেষ করে বিদায় নেন।

জিন্নার সঙ্গে জবাহরলালের সাক্ষাৎকার নিষ্ফল হয়। এখন ষোলোই আগস্টের প্রতীক্ষা। তার দুদিন আগে দেবাদিদেব গৃহ এসে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ বসেন। মুখ ফুটে একটি কথাও বলেন না। শুধু একখানা খবরের কাগজ পড়তে দেন। তেরোই তারিখের 'স্টার অভ ইনডিয়া'। ন্যাজিমউদ্দীনের দৈনিকপত্র। তাতে ছিল 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' কেমনভাবে পালন করতে হবে তার নির্দেশ। শেষের দিকে কলকাতা জেলা মুসলিম লীগ সেক্রেটারির আবেদন :

"I appeal to the Musalmans of Calcutta, Howrah, Hooghly, Matiaburz and 24-Parganas to rise to the occasion and make the rally a unique success. We are in midst of the rainy season and the month of Ramazan fasting. But this is a month of real Jehad of God's grace and blessings, spiritual armament, and the moral and physical purge of the nation. It is a supreme occasion of our trial. Let Muslims brave the rains and all difficulties and make the Direct Action Day meeting a historic mass mobilisation of the Millat.

Muslims must remember that it was in Ramazan that the Quran was revealed. It was in Ramazan that the Battle of Badr, the first open conflict between Islam and Heathenism was fought and won by 313 Muslims and again it was in Ramazan that 10,000 under the Holy Prophet conquered Mecca and established the kingdom of Heaven and the commonwealth of Islam in Arabia. The Muslim League is fortunate that it is starting the action in this holy month."

মানসও গম্ভীরমুখে কাগজখানা যূথিকার হাতে বাড়িয়ে দেয়। একটি কথাও বলে না। যূথিকার মুখও গম্ভীর। চারদিক নিঃশব্দ।

"তবে আসি।" গুহ ওঠেন। কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে ভরেন। অনেক সাধাসাধির পর এক পেয়ালা কফি খেয়ে যান।

মানস বলে যূথিকাকে, "এর শুরু কোথায় আর কবে তা তো জানা গেল। সারা কোথায় আর কবে তা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। জিন্নাহ্‌ও জানেন না। লক্ষ লক্ষ মানুষ মরবে, কিন্তু মীমাংসা এর ফলে হবে না। মীমাংসার পথ এ নয়।"

"মীমাংসা কি ওরা সত্যি-সত্যি চায় যে মীমাংসা হবে? ওরা চায় বলপরীক্ষা। বেশ! তাই হোক।" যূথিকা বলে দৃপ্ত কণ্ঠে।

বাইশ

মাস মোবিলাইজেশন? বদরের লড়াই? মক্কার যুদ্ধ? এ কি সেই ধরনের যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব? কার সঙ্গে কার যুদ্ধ? হাঁদেনের সঙ্গে মুসলিমের? হাঁদেন কারা? ইংরেজরা নয় নিশ্চয়। এমনিতেই তারা মুষ্টি-মেয়। তাদের বিরুদ্ধে মাস মোবিলাইজেশন যেন মশা মারতে কামান দাগা। তা ছাড়া তাদের হাতে যেসব মারাত্মক অস্ত্র আছে তা দিয়ে একশোটা জালিয়ানওয়ালা-বাগ হত্যাকাণ্ড ঘটানো যায়। মিঞা সাহেবরা পলাশির পুনরাবৃত্তি চাইবেন না। তা হলে এটা হিন্দুদেরই উপর আক্রমণের তোড়জোড়।

তাই যদি হয়ে থাকে বাঙলার গভরনর কী মনে করে ষোলোই অগস্ট পাবলিক হলিডে ঘোষণা করলেন? এটা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টানদের কারো পরব নয়। রাজার জন্মদিন বা ব্যাঙ্কের হিসাবের দিনও নয়। মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের এমন কী গুরুত্ব? ওরা হরতাল করতে চায় তো করুক। আর কেউ হরতাল করবে কেন? কিন্তু পাবলিক হলিডে হলে সরকারি আপিস-আদালতও বন্ধ থাকবে, সেটাও প্রকারান্তরে

সর্বজনীন হরতাল। মানসের মতো অফিসারদেরও। সেদিনকার জন্যে যেসব মামলার শুনানি নির্দিষ্ট রয়েছে সেসব মুলতুবি রাখতে হবে। আরো একটা দিন খুঁজে বার করতে হবে। দায়রার মামলা দিনের পর দিন লাগাতারভাবে চলে। শুক্রবারের মামলা শনিবার শুনতে হবে, শনিবারের মামলা সোমবার শুনতে হবে। সোমবার থেকে তো অন্য এক মামলা। একটা শেষ না হলে তো আরেকটা শুরু হতে পারে না। একটা দিন হঠাৎ বন্ধ হলে কত লোকের সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট! সাক্ষী, আসামি, জুরি। আসামি যদি নির্দোষ হয়ে থাকে তবে কেনই বা বেচারা জেলে আরেকদিন আটক থাকবে? জুররদের কি নিজেদের কাজকর্ম নেই? আর সাক্ষীরা কোথায় রাত কাটাবে? এ ছাড়া উকিলদেরও অসুবিধে আছে।

গভরনরকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি মন্ত্রীদের প্রত্যেকটি পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন। তিনি পাবলিক ইনটারেসট দেখবেন। পাবলিক বলতে শুধু মুসলিম পাবলিক বোঝায় না। এটা লীগ মন্ত্রি-মণ্ডল। এঁদের ম্যানডেট পাকিস্তান হাসিল করা। আর পাকিস্তান মুসলিম লীগ ভিন্ন আর কারো স্বার্থে নয়। অন্তত আর কেউ সেই দাবি নিয়ে নির্বাচনে নামেন নি। গভরনর হয়তো ইউরোপীয়দের নিরাপত্তার খাতিরে তাঁদেরই পরামর্শে পাবলিক হলিডে ঘোষণা করেছেন। এতে তাঁদের মুখরক্ষা হয়। নয়তো আপিসে গেলে তাঁরাও মার খেতেন, দোকান খোলা রাখলে তাঁদেরও দোকান লুট হত। হিন্দু নেতারা মিরজাপুর পারকে সভা করে জানিয়ে রেখেছেন যে হিন্দুরা নিজেদের ক্ষতি করে দোকানপাট বন্ধ রাখতে বাধ্য নয়। হরতাল যারা করতে চায় তারা করুক, কিন্তু যারা নারাজ তাদের উপর যেন জোর জুলুম না হয়। হলে নেতারা বাধা দেবেন। আইন তাঁদেরই পক্ষে। পাবলিক হলিডেতে প্রাইভেট দোকানপাট খোলা থাকা তো বেআইনি নয়। অন্যান্য পাবলিক হলিডেতে খোলা রাখাই রেওয়াজ। সরকারি অফিসারদের উপরে সরকার নির্দেশ জারি করতে পারেন, বেসরকারি সাধারণের উপরে নয়। তারা কি তাজা মাছ কিনে খেতে পারবে না?

মানসের ঘুম আসে না। সে অনেক রাত অবধি তার কুঠির দোতালার লম্বা বারান্দায় নিঃশব্দে পায়চারি করে। মুসলিম লীগ তা হলে এমনি করে ওয়ার অভ্ সাকসেশন শুধু করে দিচ্ছে। পারলামেনটারি ইলেকশন যথেষ্ট হল না। কনস্টিটিউশনাল মীনস যথেষ্ট হল না। জিন্না সাহেব বলেছেন তাঁরও একটা পিস্তল আছে। এবার তিনি পিস্তল হাতে নিচ্ছেন। ষোলোই অগসট তাঁর সেনাবাহিনীর D-Day. কুরুকাওয়াজের দিন। বলা যেতে পারে সেটা তাদের D-Day, যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংগ-মারকিন-ফরাসি বাহিনীর নরমানডির উপকূলে অবতরণের জন্যে নির্দিষ্ট দিবস।

দেশের অবস্থা এখন অগ্নিগর্ভ। একটি দেশলাইয়ের কাঠিও একটা দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। জিন্না এ করছেন কী! গোটা দেশটাই যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাঁর সাধের পাকিস্তান কি আস্ত থাকবে? তিনি কি জানেন না যে শিখ বলেও একটি সম্প্রদায় আছে, তারও ধারণা সেও একটি নেশন, তারও একটা হোমল্যান্ড চাই। প্রত্যেক সম্প্রদায় যদি স্বতন্ত্র হোমল্যান্ড চায় তো দেশ দু ভাগ কেন, বহু ভাগ হবে। আর নেশন কি কেবল ধর্ম অনুসারে হয়, ভাষা অনুসারে হয় না? মতবাদ অনুসারে হয় না? ইউরোপের ইতিহাস কী বলে? ভারত যদি একবার ভাঙতে আরম্ভ করে তো পাকিস্তানও পরে একদিন ভাঙতে পারে। তার আগে বাঙলাদেশ যে অবিভক্ত থাকবে তা নয়। পানজাবও না। এসব যদি হবার থাকে তো কনস্টিটুয়েনট অ্যাসেমবলিতে বসেই হোক। কেন ইংরেজদের সহায়তায় হতে চাওয়া? তাদের রোয়েদাদ যদি সবাই মেনে না নেয়? তবে কি গৃহ-যুদ্ধের ভিতর দিয়েই যেতে হবে? বেশ, তাও সই। কিন্তু ষোলোই অগসট থেকেই তা শুরু হবে কেন? তবে কি এটা ইনটারিম গভরনমেনট ঠেকিয়ে রাখার জন্যে হচ্ছে? অমন করে কি ব্রিটিশ গভরনমেনটকে নিবৃত্ত করা যায়? কিংবা কংগ্রেস হাই কমানডকে? ওয়েভেল বার বার ওয়েভার করছেন, কিন্তু তিনিও উপলব্ধি করেছেন যে কেয়ারটেকার গভরনমেনট দিয়ে আর চলছে না। বড়ো রকম রদবদল চাই। মেজরিটিকেই তার উদ্‌যোগ নিতে হবে। মেজরিটি মাইনরিটিকে ডেকে আনবে। যেমন অন্যত্র হয়ে থাকে।

কংগ্রেস আর লীগের বিবাদটাই হিন্দু-মুসলিম বিবাদে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু বিবাদটা আসলে কংগ্রেস মুসলিমের সঙ্গে লীগ মুসলিমের বিবাদ। হতে পারে কংগ্রেস মুসলিমরা সংখ্যায় কম, লীগ মুসলিমরাই সংখ্যায় বেশি। তা বলে কি তাদের পক্ষে একবিন্দুও সত্য নেই? এমন কথা কি বলতে পারা যায় যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ মিথ্যা, ১৯৪২ সালের সত্যাগ্রহ মিথ্যা? গত নির্বাচনেও তো ভোটে জিতে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেছে। তার মানে ওরা ভারতেই থাকতে চায়, পাকিস্তানে থাকতে চায় না। কংগ্রেস তাদের মনোনীত একজন মুসলমানকে নিজের ভাগের একটি আসন দিতে বদ্ধপরিকর। বড়লাট যদি কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট আকাঙ্ক্ষা করেন তো তাঁকে এ সত্য স্বীকার করতেই হবে। এ ছাড়া তিনি আর কী করতে পারতেন? কংগ্রেস-লীগের বিবাদের মূলে রয়েছে আরো এক কারণ। সেটা আরো ফানডামেনটাল। লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে সমান আসন, সমান-সংখ্যক পোর্ট-ফোলিও, সমান গুরুত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও, সমান মর্যাদা দাবি করে। যেন সে আইনসভায় মাইনরিটি নয়, সারা ভারতেও মাইনরিটি নয়। বড়লাট ওয়েভার করতে-করতে শেষকালে এ দাবিটাও মেনে নিতে নারাজ হয়েছেন। নয়তো কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটের আশা ছাড়তে হত। লীগের শেষ তুরুপের তাস পাকিস্তান, বিকল্পে গ্রুপিং। বাঙলাদেশের সঙ্গে আসামও গোষ্ঠী-ভুক্ত হবে। পানজাবের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও গোষ্ঠীভুক্ত হবে। কে না জানে যে অসমীয়াতে বাঙালিতে আদায় কাঁচকলায়? তেমনি, পাঠানে আর পানজাবিতে ভাষা নিয়ে, রেস নিয়ে রেষারেষি। প্রাদেশিক সরকার বন্ধনীভুক্ত হতে অনিচ্ছুক, তবু অনিচ্ছুকের উপর গ্রুপিং চাপিয়ে দিতে হবে। এই প্রশ্নে বড়লাট কংগ্রেসকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছেন না, বিবাদটা ফেডারল কোর্টের ব্যাখ্যার জন্যে ঝুলে থাকছে। জিন্না সাহেবের আশঙ্কা—বড়লাটের আশঙ্কা—ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের ভাষায় গলদ আছে। কংগ্রেস তার সুযোগ পাবে। কিন্তু কোর্টের বিচারের উপর কথা বলা চলে না। বড়লাট অপেক্ষা করবেন না, গভরনমেনট ঢেলে সাজাবেন। জিন্না অপেক্ষা করবেন না, কংগ্রেস গদিতে বসার আগেই তিনি যুদ্ধে নামবেন। যুদ্ধটা ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধেও বটে, কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধেও বটে। শ্বেতাঙ্গদের গায়ে হাত দিতে সাহসে কুলোবে না, হিন্দুদের মাথায়ই বাড়ি পড়বে, হিন্দুদের পিঠেই ছোরা বসবে।

মনটা খারাপ হয়ে যায়, উদ্বেগে ভরে যায়। এই কি ভারতের স্বাধীনতার মাশুল? এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ? জাতীয়তাবাদের কতটুকু এই অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষত থাকবে? এটা কি কোনোমতেই এড়ানো যায় না? থাকুক না ইংরেজরা আরো কয়েক বছর। কিন্তু তাতে কি সমাধান সুগম হবে? না সাম্প্রদায়িকতা আরো জোরদার হবে? সময় কার পক্ষে? কংগ্রেস-মুসলিমদের পক্ষে, না লীগ-মুসলিমদের পক্ষে? গত দশ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস-মুসলিমদের জোর কমছে, লীগ-মুসলিমদের জোর বাড়ছে। কংগ্রেসে মুসলিম সদস্য-সংখ্যা বাড়ছে না, কমছে। দশ বছর পরে কংগ্রেস সত্যি-সত্যি মুসলিমবর্জিত দল হবে। দুজন কি তিনজনই ততদিন কংগ্রেসে থাকবেন। যদি ততদিন বাঁচেন। এটা এক নিদারুণ সত্য যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ মুসল-মানদের কাছে ততখানি আকর্ষণীয় নয়, যতখানি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ। সাম্প্রদায়িকতাবাদকেই ওরা জাতীয়তাবাদ বলে ভ্রম করছে। এ ভ্রমটাতে মেজরিটি বনবার প্রত্যাশা। আজকাল সব রাষ্ট্রেই মেজরিটিই তো ক্ষমতাসীন। ডিকটেটরশাসিত রাষ্ট্রও মেজরিটির মুখ চেয়ে কাজ করে। আমাদের মুশকিল এইখানে যে লোকে রাজনীতিক্ষেত্রেও ধর্মকে টেনে আনতে অভ্যস্ত। মুসল-মান বা শিখ বলে পরিচয় না দিলে নির্বাচনে নামতে দেওয়া হয় না, নির্বাচনকেন্দ্রেই ভেদবুদ্ধি। চাকরির ক্ষেত্রেও তাই। সেকুলার স্টেট আমাদের কল্পনাতীত। সেরকম একটা রাষ্ট্রের কনস্টিটিউশন রচনা করতে দিচ্ছে কে? ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা একধার থেকে বাধা দেবে। জিন্না এখন থেকেই কনস্টিটুয়েনট অ্যাসেমবলি বয়কট করছেন। কেবল ইনটারিম গভরনমেনট নয়। দশ বছর সময় দিলে কি তাঁর সেকুলার স্টেটে রুচি হবে? হবে না, কারণ তার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব। তাঁর দলের পক্ষে সেটা একটা জীবনমরণ প্রশ্ন, গান্ধী নেহরু আজাদের দলের পক্ষে নয়। মুসলিম লীগ যে মরণ কামড় দেবে, এটাই ধ্রুব। কালহরণ এক্ষেত্রে নিষ্ফল।

জিন্না সাহেবের নির্দেশে মুসলিম লীগ যে আগুন জ্বালাতে যাচ্ছে সে আগুন নেবানোর সামর্থ্য বা ইচ্ছা ইংরেজদের নেই। তাঁরা দমননীতি অবলম্বন না করে তোষণনীতিই অবলম্বন করবেন। তা হলে দমননীতি

অবলম্বন করবে কে? আটটি প্রদেশের কংগ্রেস গভরনমেনট। পানজাবের ইউনিয়নিসট গভরনমেনট। মুসলিম জনতা যদি বেপরোয়া হয়ে খুন জখম ঘর জ্বালানো ইত্যাদি অপরাধ করে তবে তাকে শায়েস্তা করা খুব সহজ ব্যাপার হবে না। অপোজিশনে থাকলে মুসলিম লীগ এতে উশকানি দেবেই। তার হারাবার কী আছে? সে যদি জানত যে সেও একদিন গভরনমেনট গঠন করবে বা কোয়ালিশনের পার্টনার হবে তা হলে সে সংযত হত, সংযম শেখাত। কংগ্রেস থাকতে তার কি সেরকম কোনো আশা ভরসা আছে। কংগ্রেসও এটা বোঝে। সেও এটা এড়াবার জন্যে পদত্যাগ করে অপোজিশনে যেতে তৈরি। কিন্তু ইংরেজ থাকলে তো। কংগ্রেসের উৎপত্তি ইংরেজের অপোজিশন হিসাবে। সে চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে মুসলিম লীগের অপোজিশন হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। লক্ষ্য তার ভারতবর্ষের স্বরাজ। আর মুসলিম লীগের লক্ষ্য হয় কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন, নয় যেখানে সম্ভব সেখানে স্বতন্ত্র গভরনমেনট গঠন। এক-এক করে পাঁচটি কি ছটি প্রদেশ। পরে দুটি স্বতন্ত্র গ্রুপে। অবশেষে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে। এক কথায়, মুসলিম লীগের লক্ষ্য হয় পার্টনারশিপ, নয় পার্টিশন। পার্টনারশিপ ইংরেজ থাকতে হয় নি, ইংরেজ গেলেও যে হবে তেমন অঙ্গীকার নেই, যেমন দেখা যাচ্ছে সে চিরকাল অপোজিশনেই থাকবে, কেন্দ্রে তো বটেই, অধিকাংশ প্রদেশে। তা হলে পার্টিশনই একমাত্র গতি। আর সেটা ইংরেজ থাকতেই সমাধা হোক।

এর প্রতিকার কি পালটা পার্টিশন? বাঙলা ভাগ? পানজাব ভাগ? আসাম ভাগ? মানস তা মনে করে না। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে যারা প্রাণ দিয়েছে, ধন দিয়েছে, জীবিকা দিয়েছে, জেলে গেছে, আন্দামানে গেছে, তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে তাদের উত্তরপুরুষ যদি আবার সেই বঙ্গভঙ্গকেই সাদরে বরণ করে। কিন্তু মুসলমানদের মনোভাব আঁচ করে সে গভীর বেদনা বোধ করছে। এরা কি পাকিস্তানি হতে চায়, না বাঙালি থাকতে চায়? এরা কি বুঝতে পারছে না যে পাকিস্তান আর বাঙলাদেশ সমার্থক নয়? বাঙলাদেশ বাঙালিমাত্রের দেশ। একে কেবল মুসলমানের দেশ করতে গেলে বিহার থেকে, যুক্তপ্রদেশ থেকে, মধ্যপ্রদেশ থেকে, ওড়িশা থেকে মুসলমান এসে বাঙালি হিন্দুকে ভিটেছাড়া করবে। মানস ভাবতেই পারে নি যে পাকিস্তানের পক্ষে বাঙলাদেশে এত বেশি ভোট পড়বে আর তার ফলে মুসলিম লীগ একাই একটা গভরনমেনট গঠন করবে। সঙ্গে একজন তফশীলি হিন্দু। পেছনে কয়েকজন ইউরোপীয় বণিক। বাঙালি হিন্দুরা এমনিতেই তাদের প্রাপ্য ক্ষমতার ভাগ থেকে বঞ্চিত, তার উপর তাদের পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত তাদের না থাকার আশঙ্কা। এতদিন ইংরেজই ছিল তাদের একমাত্র বৈরী, এখন দেখছে ব্রিটিশ রাজ গেলে মুসলিম রাজ হবে। ইসলামী স্বার্থ ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। বাঙলাদেশ তার কাছে আর একটা আরব কি ইরান কি আফগানিস্তান। হিন্দু মনোভাব আঁচ করেও সে গভীর বেদনা বোধ করছে।

দুই-নেশন-তত্ত্ব অসত্য হলেও দুই-রাষ্ট্র-তত্ত্ব অসত্য নয়। অবিভক্ত ভারতে মুসলিম লীগ চিরকাল অপোজিশনে থাকতে পারে না, তার পক্ষে যদি অধিকাংশ মুসলমান ভোট দিয়ে থাকে তবে অধিকাংশ মুসলমানও চিরকাল রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে না। এরূপ স্থলে কোয়ালিশনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। তা যদি অকেজো হয় তবে পার্টিশনের ব্যবস্থাও থাকা যুক্তিযুক্ত। মানস এই পর্যন্ত লীগপন্থীদের সঙ্গে একমত হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যে উপায় তারা অবলম্বন করতে যাচ্ছে তা কখনো সহ্য করা যায় না। সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে সাধারণ হিন্দুর সম্পর্ক অহিনকুলসম্পর্ক নয়। ঝগড়া মাঝেমাঝে বেধেছে, ঝগড়া মিটেও গেছে, তার পর ওরা একসঙ্গে বাস করেছে। একসঙ্গে চাষ করেছে। একসঙ্গে মাছ ধরেছে। একসঙ্গে শিল্পদ্রব্য নির্মাণ করেছে। এখন এমন কী হয়েছে যে ওরা বরাবরের মতো পরস্পরকে ছেড়ে ভিন্ন রাষ্ট্রে চলে যাবে। মুসলিম ও হীদেন এই ভেদবুদ্ধি কেন? হীদেনকে মুসলিম করাই ছিল সেকালের নীতি। সেটা কি একালেও অনুসৃত হবে?

আর ওই যে মাস মোবিলাইজেশন, ওর পরিণাম তো মধ্যযুগের ফ্রানসের মতো সেনট বার্থোলোমিউজ ডে। মুসলিম লীগের ডাইরেকট অ্যাকশন ডে মানসকে আতঙ্কিত করে। বাংলাদেশের হিন্দুরাও কি ফ্রানসের প্রোটেসটানটদের মতো ঝাড়েমূলে সাবাড় হবে? মাইনরিটি সমস্যা বলে কোনো সমস্যা থাকে না। আরবে ইরানে তুরস্কেও নেই। তুরস্ক থেকে আরমেনিয়ানদের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। গ্রীকদের খেদিয়ে দেওয়া

হয়েছে। এবার হবে পাকিস্তান থেকে, যদি ডাইরেকট অ্যাকশন সফল হয়।

পরের দিন পনেরোই অগসট মানস কোর্টে গিয়ে কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থাকে। ফাঁকতালে একদিন ছুটি পাচ্ছে বলে অনেকেই উৎফুল্ল। যারা রোজা রাখছে তাদের তো কথাই নেই। কেউ বিশ্বাস করে না যে ষোলোই অগসট অঘটন কিছু ঘটবে। ঘটলে কলকাতায় ঘটবে, এ শহরে নয়। শহরে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি। মুসলমানরাও শান্তিপ্রিয়। গ্রামে অবশ্য মুসলমানের সংখ্যাই বেশি, কিন্তু খুনোখুনি হরদম হলেও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নয়। তবে ইদানীং একটি গনজে হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট যারা লুট করে পুড়িয়ে দিয়েছে তারা মুসলমান। কারণটা বোধহয় অর্থনৈতিক। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা যদি হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয় তবে তার প্রধান হেতু অর্থনৈতিক। জমিদার, মহাজন, নায়েব, পেয়াদা—কে না তাদের শোষণ করেছে? কিন্তু শুধু কি তাদের? হিন্দুদেরও কি নয়?

কোর্ট থেকে উঠে সে যখন চেমবারে যায় তখন নাজির সাহেব এসে তাকে সেলাম করেন। বলেন, "সার, অনুমতি পাই তো একটা কথা নিবেদন করি। কালকের বাজারটা আজকেই করে রাখলে ভালো হয়। শুনছি হিন্দুরাও কাল হরতাল করবে। পাছে দোকানপাট লুট হয় কি পুড়ে যায়। সাবধানের মার নেই।"

মানস মনে মনে চটে যায়। বলে, "কেন, ওরা কি মগের মুলুকে বাস করছে? সরকারকে ট্যাকস দেয় না? সরকার ওদের প্রোটেকশন দিতে বাধ্য নয়? ডি. এম. কী করছেন? এস. পি. কী করছেন?"

নাজির নিরুত্তর। তখন মানস টেলিফোন করে জেলা ম্যাজিসট্রেট, তার নিজের সারভিসের বাঙালি সিনিয়র অফিসার মির্জা আফজল সিরাজীকে। "শুনছি কাল শহরসুদ্ধ সব দোকানপাট বন্ধ থাকলে জেলা জজও শাকসবজি কিনতে পারবেন না। তাঁকেও কি সপরিবারে রোজা রাখতে হবে?"

সিরাজী লজ্জিত হয়ে বলে, "পাবলিক হলিডেতে আপিস আদালত বন্ধ হয়। হাটবাজার কখনো বন্ধ হয় না। আমিও শুনছি সেরকম কিছু হবে। ওটা কিন্তু সরকারের হুকুমে নয়, মল্লিক। হুকুম যদি কেউ জারি করে থাকে তবে সে এখানকার মুসলিম লীগ জেলা কমিটির সেক্রেটারি শফিকুদ্দীন। সে এবার জেলা স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। আমার সঙ্গে ভারিক্কি চালে কথা বলে। তা কাল সকালেই শাকসবজির বোঝা নিয়ে একজন ফেরিওয়ালি হাজির হবে। আপনার যেটা খুশি কিনবেন। নো প্রবলেম। সপরিবারে রোজা রাখতে হবে কেন? ইউ আর নট আ মুসলিম। আমিও কি রাখছি নাকি? রোজা রাখি তো অত খাটব কী করে?"

এর পরে মানস পুলিশম্যানকে ফোন করে। ইনি ওর পূর্ববর্তী কর্মস্থলে ওর প্রতিবেশী ছিলেন। টুর করে বেড়াচ্ছেন, বাড়িতে স্ত্রীর প্রসবব্যথা। অন্য কোনো স্ত্রীলোক নেই যে সাহায্য করে। জজ-গৃহিণী খবর পেয়ে ছুটে যান। রাত জেগে সেবাযত্ন করেন। ডাকতার ডাকতে হয় না। সুপ্রসব হয়। সেই থেকে ওঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রমোটেড অফিসার। পানজাবি মুসলমান। চিয়াং কাইশেক যখন এদেশে আসেন তখন তাঁর স্পেশাল ট্রেনের ডাইনিং কারের ওয়েটার সেজেছিলেন ফিন্দা হোসেন খানকে। রাজপুতবংশীয় বলে গৌরব বোধ করেন। বংশের একটি শাখা এখনো হিন্দু। দুই শাখার মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান চলে। কন্যা ধর্মান্তরিত হয় না। এটা নাকি ওই বংশেরই প্রথা। পাকিস্তান পছন্দ করেন না। তাঁর মতে জিন্না নিজে সাচ্চা মুসলমান নন।

"হরতাল হবে শুনছি। মীটিঙ, প্রোসেসন এসব কিছু হচ্ছে না তো? আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে কমিউনাল মোড় নিতে পারে, খান। জানি, আপনি সব সময় সতর্ক। আপনাকে সতর্ক হতে বলা অনাবশ্যক। প্লীজ ডোনট মাইনড।" মানস তাঁকে বলে।

পুলিশ সাহেব তাকে আশ্বাস দেন যে শান্তিভঙ্গের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই। আজ সন্ধ্যায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে প্রোসেসনের অনুমতি দেওয়া হবে কি না। দশ হাজার লোকের মিছিল যদি বেরোয় আমার অত লোকবল নেই যে সামলাতে পারব। ওরা যদি হাতিয়ার হাতে নিয়ে বেরোয় তবে ওদের নিরস্ত্র করাও তো দুষ্কর। তবে মীটিঙের ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে। ডাইরেকট অ্যাকশন নাকি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে। কিন্তু রাজদ্রোহের অপরাধে মামলা হলে জেলে যাওয়ার মুরোদ একজনেরও নেই। আর হিন্দুবিরোধী আস্ফালনে মুসলমানের কতটুকু

লাভ? নেহরু যাচ্ছেন ইনটারিম গভরনমেনটের প্রধান মেমবর হয়ে। তিনি কি বেঙ্গলের হিন্দুদের প্রোটেকশন দেবেন না? বড়লাট দেবেন। গভরনরও দেবেন। দেখবেন কলকাতা কাল নরমাল থাকবে। গোলমাল বাধতেই দেওয়া হবে না। বাধলে সঙ্গে-সঙ্গে ঠান্ডা। তবে একটা খবর আপনাকে জানিয়ে রাখছি। বাইরে থেকে এখানে হিন্দু এজেনট প্রোভোকেটর এসেছে। স্থানীয় হিন্দু জনতাকে উশকানি দিতে।"

পরের দিন ষোলোই অগসট। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি দিকনির্ণায়ক দিবস। মুসলীম লীগের লক্ষ্য স্থির হয়ে যায় ছ বছর আগে লাহোরে। আজ কলকাতায় স্থির হবে লক্ষ্যভেদের উপায়। গোলমাল হয়তো হবে না। না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। স্বয়ং গভরনর রয়েছেন, ফোর্ট উইলিয়ামে আরমি রয়েছে, লালবাজারে পুলিশ রয়েছে। সুহরাবর্দী একজন সুদক্ষ প্রশাসক। পরিস্থিতিকে তিনি আয়ত্তে রাখতে পারবেন। তিনিও জানেন যে দিন-কয়েক বাদে নেহরু সদলবলে ক্ষমতায় আসছেন। জিন্নার রাজনৈতিক জীবনের সর্বপ্রধান ভুল ইনটারিম গভরন-মেনটে যোগ দেবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা। তাঁর হাতের তাসের ট্রাম্প করার শক্তি অনুপাতে তিনি অত্যধিক 'কল' দিয়েছেন। ব্রিজ খেলার পরিভাষায় একে বলে 'ওভারকল'।

কিন্তু মাস মোবিলাইজেশন যদি হয় তার ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। কার এত সাধ্য যে সেই ধর্মোন্মাদ জনতাকে আয়ত্তে রাখবে? তারা মারবে, মরবে, সামনে যাকে পাবে তাকেই। কী ইংরেজ, কী হিন্দু। গভরনরের প্রশ্রয়ে সুহরাবর্দী মন্ত্রিমণ্ডল যা করছেন তা আগুন নিয়ে খেলা। আজকের এই দিনটা শান্তিতে কাটলেই রক্ষা। মানস আর যূথিকার মনে একটা কী-হবে কী-হবে ভাব। মানস কিছু লিখতে চেষ্টা করে। কিন্তু সময় পেলেও মুড পায় না। সাতপাঁচ ভাবে।

টেনিসের সময় হলে সে ছটফট করে। খেলতে গিয়ে খেলবে কার সঙ্গে? কেউ কি আজ আসবে? খেলাতেই বা মন লাগবে কেন? এমন দিনে কি খেলা যায়? রেডিও খুলে বসে থাকে। যদি কলকাতার কোনো খবর দেয়। তেমন কিছু পায় না। নো নিউজ ইজ গুড নিউজ। নেই খবর তো ভালো খবর।

সন্ধ্যাবেলা পাবলিক প্রোসিকিউটর রায় শরদিন্দু নিয়োগী বাহাদুর আসেন দেখা করতে। বলেন, "শুনলুম আপনি খুবই চিন্তিত। তাই জানাতে এলুম আজকের দিনটি শান্তিতে কেটেছে। হিন্দুরাও উৎসাহের সঙ্গে হরতাল পালন করেছে। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা সাজে না। এখানে একজনও ইংরেজ অফিসার নেই, জেলা ম্যাজিসট্রেট আর পুলিশ সাহেব দুজনেই মুসলমান। দুজনেই প্রো-হিন্দু। ম্যাজিসট্রেটের কুঠির সভায় আমাকেও ডাকা হয়। জিজ্ঞাসা করা হয় মিছিল বেরোতে দেওয়া সমীচীন কি না। আমি বলি, আলবত। তবে তাকে কনট্রোলের মধ্যে রাখতে হবে। আমি থাকব মিছিলের সঙ্গে। হিন্দুরা যে যোগ দিচ্ছে এটা জানলে তাদের মনোভাব বদলাবে। হিন্দুরা পাকিস্তানের বিরোধী নয়। মোগল রাজত্বেরও বিরোধী ছিল না। তবে রাজপুতদের মতো তাদেরও বিশ্বাস করতে হবে, বড়ো-বড়ো পদ দিতে হবে, তাদের উপর জিজিয়া বসানো চলবে না। আমি আল্লা হো আকবরও বলেছি, পাকিস্তান জিন্দাবাদও বলেছি। মিছিল শহর ঘুরে আসে। কারো উপরে হামলা করে না। মীটিঙও হয়েছিল। সেখানেও আমি একজন বক্তা। শফিকুদ্দীন ইংরেজদের বাঁচিয়ে বক্তৃতা দেয়, জানে যে ইংরেজ চটলে গভরনরস রুল হবে, তখন আমিই তাকে প্রোসিকিউট করব। হিন্দুদের উপরেই গাছের ঝাল ঝাড়ে। বিশেষত মহাত্মা গান্ধীর উপরে। কিন্তু শ্রোতারা তারিফ করে না। আমার উকিল বন্ধু আবু হেনা তরফদার উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, গান্ধীজী কুইট ইনডিয়া না বললে কি কায়দে আজম ডিভাইড অ্যানড কুইট বলতেন? ইংরেজরা কুইট না করলে কি মুসলমানরা পাকিস্তান পাবে? পরের নিন্দা না করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"কলকাতার সংবাদ না শোনা পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে, রায়বাহাদুর। তবু ভালো যে এখানকার সব খবর ভালো।" মানস এতে খুশি।

"কলকাতা আমার এলাকা নয়, তার জন্যে আমার কোনো নৈতিক দায়িত্ব নেই। সেটা যাঁদের এলাকা তাঁরাই ঈশ্বরের কাছে দায়ী থাকবেন। আমরা কেন ধরে নেব যে কলকাতায় এমন কিছু ঘটবে যেটা ইতিহাসের স্রোত ঘুরিয়ে দেবে? বাঙলাদেশ বাঙলাদেশই থাকবে, যদিও এর নতুন নাম হয়তো হবে পূর্ব পাকিস্তান। হোক না, তাতে কী এসে যাবে? গোলাপকে আপনি যে নামেই ডাকুন সে গোলাপই থাকবে। হাজার বছর আগে আমা-দের পূর্বপুরুষদের নাম কি হিন্দু ছিল? সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও এর উল্লেখ আছে? আমাদের বাস-ভূমির নাম কি হিন্দুস্থান ছিল? প্রাচীন সাহিত্যে পড়েছেন এ নাম? তা হলে পাকিস্তান আর পাকি-স্তানিতে এত আপত্তি কেন? পাকিস্তানের পাঁচটি কি ছটি প্রদেশের মধ্যে বেঙ্গল বা বাঙলাদেশও থাকবে। অধিবাসীরা বাঙালিই থাকবে। আমরা হিন্দু মুসলমান মিলে তামাম পাকিস্তানে মেজরিটি হব। পশ্চিমারা যদি ডিভাইড অ্যানড রুল না করে তবে আমরাই কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করব, প্রধানমন্ত্রী হব, প্রেসিডেনট হব। মিলিটারি পাওয়ার হয়তো ওদের হাতে থাকবে, সিভিল পাওয়ার আমাদেরই থাকবে। ঝগড়া যদি করতে হয় পশ্চিমা মুসলমানের সঙ্গে করব, বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে কদাচ নয়। আমাদের হাতে যে তাস আছে সে তাস বুদ্ধিমানের মতো খেললে পাকিস্তানের রাজধানী হবে কলকাতা। কিন্তু এক শ্রেণীর মুসলমান আছে তারা বাঙালি বলে পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করে। পাছে কেউ মনে করে নেটিভ মুসলমান। ওঁদের মতে ওঁরা আরব ইরান আফগানিস্থান থেকে এসেছেন বিজয়ীর দেশে। চেহারাটা কিন্তু আমাদেরই মতো।" রায়বাহাদুর হাসেন।

যূথিকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় মানস। তিনি বলেন, "আপনার ছেলে আর আমার নাতি একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। ওরা অন্তরঙ্গ বন্ধু। একদিন আমাদের কুটিরে পায়ের ধুলো দিলে কৃতার্থ হব।"

আপ্যায়নের পর তিনি বিদায় নেন।

এখানে কোনো অনর্থ ঘটে নি জেনে মানস আর যূথিকা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। কিন্তু ঝড়ের কেন্দ্র বা ভূমিকম্পের এপিসেনটার তো কলকাতা। কলকাতায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটলে এখানেও তার প্রতিক্রিয়া হবে। তাই ভাবনা থেকে যায়।

রাত নটায় রেডিওতে শোনায় কলকাতায় হাঙ্গামায় পাঁচ হাজার জন হতাহত। লুটপাট। অগ্নিসংযোগ। কারফিউ জারি হবে।

"সেনট বারথোলোমিউজ ডে ম্যাসাকার!" মানস বলে ওঠে।

যূথিকার মুখ চুন। তার মা-বাবা যদিও তাকে ত্যাজ্য করেছেন তবু সে তো তাঁদের ত্যাগ করে নি। তাঁরা অবসর নিয়ে কলকাতায় বাস করছেন। কে জানে তাঁদের কী অবস্থা। সে কান্না চাপতে পারে না।

"ও কী। তুমি কাঁদছ কেন? তুমি তো খুব শক্ত মেয়ে। কখনো কাঁদ না। ছি! কাঁদতে নেই। যাও, শুতে যাও।" মানস নিজে কিন্তু শুতে যায় না।

অর্ধেক রাত অবধি পায়চারি করতে-করতে ভাবে হিন্দু-মুসলমানের এই দ্বন্দ্ব কি একদিনেই থামবে? গড়াবে অনেক দিন, যতদিন না একটা রাজনৈতিক সমাধান পাওয়া যায়। দুই পক্ষই দোষী, কোনো এক পক্ষকে নির্দোষ বলা যায় না। কিন্তু সে কি মহাযুদ্ধের মতো গৃহযুদ্ধের কোনো নীরব সাক্ষী হবে?

[ক্রমশ

কোজাগরী

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

রাতে জাগালদার মাঠ জাগে। পৌষ মাসের মাঠ। আকাশের ঝোর ফেটে হিম নামে। ধানের লাটে খড়ের উজাল ভিজে সপসপ করে। পাথর ফুটো করে হিম নেমে যায় পাতালে। জাড়ে মানুষের গা বাসি আশকে পিঠের মতো ইট হয়ে যায়। তখন পরতে-পরতে জমে শীত। যার কাঁথা আছে সে তার কাঁথার তলায় নিজেকে চালান করে দেয়, যার নেই সে কাঁপে হিটিহিটি। আর ডাহি জমির উপর দিয়ে দখিনশোল থেকে রাতচরা পাখির দল বয়ে যায়, আশ্‌থে ফল খাবে। বাপের কালের আশ্‌থে গাছটা খুব ফলেছে, মাসভজা পুয়াতির মতো লদরপদর করে। এককালে বন্ধ্যাদোতা থাকত। এখন থাকে পেঁচা, পাখি আর বুড়োথুড়ো ডাল। তাতে আবার কচি-কচি পাতা গজালে ঢিলে বাতাসে বারো বছরের ছুঁড়ির মতো ফরফর করে। ভয় হয় উড়ে গেলে গাছটা আবার না ন্যাড়া হয়ে যায়।

বাবু দনপাটের বউ সাদা থান পরে শালুকফুলটি হয়ে বসে ছিল। জাড়ে কুত্তার লেজের মতো গুটিয়ে গেছে সানু। রাতের হিম চরাচর জুড়ে কলকল করে। হাতপা সেঁকে নিতে পারলে গা জুড়ায়, ঘুমটা ভালো হয়। গাদা থেকে এক আঁকড় পুয়াল টেনে আনে সানু। ডিবরি বাতি থেকে একটুকুন কেরাসিন ফেলে আগুন ঠেসিয়ে দিলে দুলদুল করে জ্বলে ওঠে পুয়াল। মড়ার ধুঁয়ার মতো সাদা ধোঁয়া, নীল ধোঁয়া। মশা পালায় পাঁই-পাঁই করে। হাতে পায়ে আসান হয়।

রাতে ঘুমাতে না পারলে সকালে তার হ্যাপা পুয়াতে হয় সানুকে। সকাল-সকাল মাঠে গিয়ে ধান বাঁশতে হয়। একদফুর রোদ যখন মাঠের ঘাসগাছাড়িতে ফকফক করবে তখন মুড়ি খাবার বেলা। মুড়ি খেয়ে ধান কাটতে লাগে। বৈকাল, তেপহর নাগাদ বাঁকে-বাঁকে লক্ষ্মী উঠে আসবে খামারঘরে। বাবু দনপাটের তুলা কাপড়ের মতো দুধে-দুধ বউটা তখন শাঁখে ফুঁ দেবে ; ঠোঁটটি তখন একটি নিখুঁত গোল আধুলি। কিংবা সাইজে ছোটো-খাটো সিকিটি।

'ও—জা-গো—ও—ও—ও—'

কে জাগে, গগন ঘোষ জাগে। রাত জেগে গাঁ পাহারা দেয়। সেই জাগালদার সেই চৌকিদার। ধান আগলায়, মান আগলায়। রাত নিকষ হলে, বাতাসে সাঁ-সাঁ শব্দ নেই—গগন ঘোষ তার পেটা শরীরটা খাড়া

করে। খেজুরগোড়ার মতো থাম্বা পা দুটি মাটিতে পড়লে গমগম শব্দ ওঠে। গগন ঘোষ চরতে বেরয়।

জ্যোৎস্না উঠেছে বড়ো গামলার মুখের মতো। চারদিকে তার ছই নেমেছে। বরফকুচির ধোঁয়া, চাঁদকে ঘিরে মেঘ গোল। সভা বসেছে। শীতকালের বৃষ্টি, আলু-গাছের সর্বনাশ করবে। বৃষ্টি নামলে শীত পড়বে ঘন করে, তবে দুদিনেই সব ফরসা হয়ে গিয়ে উত্তর মাঠের গরম হলকা ছুটতে থাকবে গাঁয়ে-ভিতে। তখন ডোব-ডাবাড়ি থেকে বেরবে হেলা সাপ, বিষ সাপ—গায়ের জ্বলনে রাতেভিতে রাস্তায় শুয়ে থাকবে লম্বা খড়ের বিচালিটি হয়ে। পারলে খোলস ছাড়বে। কেউ-কেউ পেট ফাটিয়ে ছ্যানা বিয়াবে—, তারা হল গিয়ে জলঢোঁড়া।

আশ্‌থে গাছে বেশ বাদুড় জুটেছে। কিঁচকিঁচ ডাকে, ছটপট করে, ফল খায়, ঝটপটিয়ে উড়ে যায়। উড়ে যায়, আবার টানা হয়ে আসে গাছের ডালে। যেন আশ্‌থে-আঠায় চিটিয়ে আছে রাতপাখির জিভ। উঠানের পাশে মধ-দুয়ার, বাবু দনপাটের বউ বসে ছিল সেই দুয়ারে। গাছের গায়ে চোখ লেপটে বসে আছে বউটি। জাড়ের দিনে গাছ ফলে ঝুলে পড়ে, গরম ফুটলে পালা ঝরে গিয়ে ঘাটকামানো পুরুষের মতো ন্যাড়া। বর্ষার জল পেলে ফল-থেকে-খসে-থাকা বীজ ফুটে পুয়াগাছ বেরয়। বড়ো হতে পায় না, ছাগলে মুড়ে খেয়ে যায়। বড়ো হলে, ওই গাছের বংশধরেরা একটি ছোটোখাটো গোদা-পিঁশালের বন গড়তে পারত। কিন্তু আঁতুরেই সব নষ্ট হয়ে যায়। গাছ বেচারি বড়ো একা-একা থাকে। রোদ উঠলে হাসে, রাত নামলে ঘুমিয়ে পড়ে—তখন পাখিতে ঠোকরায় গাছের নরম বুক। গাছ ঠায় নিসাড় দাঁড়িয়ে থাকে। দিনে কাঠঠোকরা, রাতে বাদুড়।

'কারা ফাঁদ পেতেছে—'

'বাগদীরা—আবার কারা—'

'কী কাঁটা রে সানু—'

'পাখিধরা কাঁটা—। বেতকাঁটা—'

'বাদুড়পাখি খেতে ভালো—'

'খুব মিঠা—'

'তুই খেইচু কবে—যে মিঠা জানলি'

'লোকে বলে ত বলি, তারা মিছা বলবে ক্যানে—'

সানু আগুনের তাপে কালো কুচকুচা পাটাকে বাড়িয়ে দেয়। গরম ভাপ লাগে। জলকাদার সময় ওই পায়ের পাতায় হাজা হয়। তার দাগ পড়ে বেশ ঘন করে। বেঁটে-বেঁটে নারকলকুলের মতো তার পায়ের আঙুল ; না আছে ছিরি না আছে ঢঙ। সেই পাদুটি সেঁকতে-সেঁকতে বাবু দনপাটের বারমাস্যা বাগাল সানু আরামে শব্দ ছাড়ে, 'আঃ, বোডো জাড়—'

'একটা পাখিতে কতটা মাংস হয় রে—'

'কতটা আর—, দু পুয়া-আড়াই পুয়া—'

বাবু দনপাটের বউ বসে-বসে নিজের তেলে চুলে বিলি কাটছিল। কলিঙ্গতে রেডিও ছাড়া আছে। আকাশবাণী কলকাতা থেকে খবর পড়ছেন বরুণ মজুমদার। তার মানে, রাত বেশি হয় নি। কিন্তু শালবনীর উত্তরে মড়ুরকুপি গাঁয়ে সূর্য ডুবলেই নিশাভর রাত। মানুষজন ঘুমে কাদা হয়ে থাকে। গেরস্থঘরের খোড়-চালে বিড়ালেরা মদ্দ-মাদায় মিলে মাছের কাঁটা নিয়ে ঝগড়া করে। শব্দ করে, যেন আশি বছরের বুড়ির গলায় কফ জমেছে ঘড়ড়—ঘড়ড়—।

বেশ পাখি লেগেছে গাছটায়। জালে, কাঁটায় না পড়ে পাখি গিয়ে পড়ছে গাছের মগডালে। চালাক পাখি ফাঁদটিকে পাশ কাটিয়ে দিব্যি উড়ে যাচ্ছে। স্বচ্ছ আরশির মতো জ্যোৎস্না, জ্যোৎসনা কথা বলে, কান খুব খাড়া করে শুনলে শোনা যায় মিহি চিনির দানার মতো সেই কথা—এক-একটা কথা যেন ছোটোখাটো এক-একটি চারকোনো ঘর, মাদুরপাটি—দেহ এলিয়ে শুয়ে থাকতে পার। ফাঁদ আর জাল দেখা যায় সেই স্পষ্ট আলোয়। অন্ধকার না পড়লে পাখি মারা পড়বে না। শুধু দুধের সরের মতো ভেসে বেড়াবে পাতলা আলোয়, থিরথির করবে।

কই মাছ দিয়ে ভাত খাচ্ছিল সানু। লই দীঁঘিতে টাঙা এড়েছিল জানত কেঁচ দিয়ে। কইমাছ গিলেছে সেই চোপ। তারপর উঠে এসেছে সটান সানুর থালায়—একে-বারে ভাজা হয়ে। সেই মাছ ভেঙে ভাত খাচ্ছে সানু। মাছের কানসিতে খানিকটা হলুদ, বোধহয় কাঁচা রয়ে গেছে, আঁশটে লাগে নাকে, 'উহ, গন্দ'। নাকের পাটা কোঁচকায় সানু।

'অ্যাকটুন পিঁয়াজ দও দিকি—'

'ক্যানে, মাছটা ভাল লয়—'

'গন্দ—'

'সেবেলার আলুচটকা আছে, দুব—'

'দও—'

'আর দুটি ভাত দি—'

'ন্না—'

'ক্যানে—'

'জলঢালা ভাত, এলি গ্যাছে—'

'মুড়ি খাবি—দুব—'

'থাক, আর খাব নি—'

গোরুকে ছানি কেটে দেয় সানু। দুটা হেলা, একটা গাই, একটা বকনা বাছুর। ঝিঙাশাল খড়, নরম ঘাসের মতন। প্রাণীগুলি নাকেমুখে গিলতে থাকে। ছানিকরাতে ঘসর ঘসর খড় ছিয়াতে থাকে সানু, বাবু দনপাটের বউয়ের কানে আসে। ধারাল বঁটি, শান দিয়ে একেবারে দাড়িচাঁছা লাপিতের খুরটি হয়ে বসে আছে। লোহার পাতকেও কুচিয়ে ছন বানিয়ে ছাড়বে।

'দেখে কাটবি, হাত পেলেই কু-চিয়ে দুফালা—'

'দ্যাখা আছে, কাহন-কাহন খড় গলে গেল আর—'

'কি ডাকে রে—'

'কি আবার, আখ বিলে শিয়াল ঢুকেচে—'

রাত বাড়ে। সিদ্ধেশ্বরের মাঠ পার হয়ে গগন চারির ছিয়াতে এসে হাজির হয়। মাঠে চাষিদের যে যার খড়ের ড্যারা। লন্ঠন জ্বলছে টিমটিম। মাঠের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে গগন। পুরন্ত ধানের গাছ দাঁড়িয়ে নেই, ফলন ভালো ছিল, লেপটে পড়েছে মাটির সঙ্গে। সেই খড়ের লাটে জ্যোৎসনা পড়ে ভেসে গেছে। কাদা হয়ে গেছে—তরল এঁটেল কাদায় ডুবে আছে মাঠ, মাটি, দিগন্ত। পাতলা, ছাঁকা, পরিষ্কার রাত সেই আলোয় দাঁড়িয়ে উদোম নাচ নাচে ডিগডিগ করে। হলুদ নাচ।

বাবলাগাছে এ সময় শীতের হলুদ কুচিফুল ফোটে। নাক খুব ছাঁকা হলে, ফাঁকা হলে সেই ফুলের ফিকে গন্ধ এসে নাকে লাগবে। মাতাবে না, খ্যাপাবে না—শুধু মেয়েমানুষের হলুদমুখের কথা মনে ধরিয়ে দেবে। গগন কিছুক্ষণ বাবলাগাছের ছায়ে দাঁড়ায়। বাবলাকাঁটা পায়ের গোড়ালিতে ফুটে ভেঙে যায়। অন্য পা হলে টনটন করত। এ আলাদা জাতের পা, তেজি সমত্ত পা, মানুষের পা। কাঁটার মুখ মাথা ভেঙে তাকে মুড় করে ছাড়ে। তারপর গাছের দিকে তাকিয়েই চিল্লা দেয়। সেই হাঁক মাঠ ঘাট ঘুরে ফিরে এসে তারই প্রকাণ্ড ছাতিতে ধাক্কা মারে সজোরে, 'ও—জা-গো—ও—ও—ও'

বাবলাগাছের নীচে হরিসাধনের কাঁদি, ইঁদুরে ডোব করেছে। ডোবের মুখ থেকে পুরু মাঠের বুক বরাবর ধুয়ো রাস্তা দেখা যায়। ধানঝাড়ের ঘোলে-ঘোলে সেই রাস্তা সোজা বাঁকা চলে গেছে। শালবনী রানীগঞ্জ লাইন পোতের চেয়েও ফাঁকা পরিষ্কার রাস্তা, চেষ্টা করলে বাস, লরি এসবও ছুটতে পারবে সি সি করে।

ডোবের মুখে ইঁদুরমাটির ছের, নুড়ি। ধান চুরি করে আনে নিঃশব্দে। বড়ো চুপচাপ শৌখিন কাজ। মানুষের চোখের সামনে কেমন খোলামেলা চুরি। জাগালদার সতর থেকেও কিনারা করতে পারে না। চুরি হয়ে যায়। মানুষের সাধ্য কি চোরকে রুখে দেয়, চুরিকে হটিয়ে দেয়। রাত জাগে জাগালদার রাত জাগার নেশায়। চোর-তদারকির সে কে। স্বয়ং ভগবানের বাবা এলেও এসব কাজে ছরছর করে মুতে দেবে। যে দেখেছে ইঁদুরের কুটকুট ধানকাটা সে জেনে গেছে এও এক ধরনের গান। মন ভরে ওঠে সেই বাউলগানে, তখন আর হুঁশ থাকে না—কে চোর আর কে সাধু—সব একসা হয়ে যায়। তখন প্রায়ই গগনের মনে হয়, 'নাহ্, আর রাত জাগব নি। ইবার একটুন ঘুমাব। এতকাল ত জাগলুম। আমার রাত জাগার ফাঁকে রাতই ব্যাটা জেগে থাকে, আমি শালা ঘুমাতে থাকি ভসভস করে।'

ছ্যানাপানা ঘরে ঘুমায়। বউয়ের বছরবিয়ানি ধাত। মরা-মরা ড্যালা বিয়ায় বউটা। কাঁচা রক্তের মণ্ড। ত, ছ মাসের পেটটি তার নদীধেরা পাকা ফুটিটির মতো ফাঁপা। দেখলে বলবে, কালকেই যেন না ফেটে যায় আবার। ভাত খেয়েদেয়ে বলে, 'গাটা কেমন গুলাচ্ছে। জিভে স্বাদ নাই।' ত তারা ঘুমাতে থাকে ঘরে। গোরুর ঘুম পাতলা, একঝটক ঘুমিয়ে নিয়ে হেলা দুটা নিশ্চয় লেজ ঝাপটে মশা খেদাচ্ছে। বকনাটির লেজে চুল নাই, বেচারির পায়ে গোল-গোল সাগুদানার মতো রক্ত ফুটেছে, মশায় বিঁধেছে, আহা—অবলা জাত, মা ভগবতীর অংশে জন্ম। মোটমাট ঘর-গেরস্থ এখন ঘুমে চিত, মরে কেঠিয়ে আছে। উঠান, দুয়ার, জল আনার কলসিটা আর বউছ্যানা এখন সব একাকার। হাতে করে ধরে আছাড় মারলে ফটাস করে হাঁড়িভাঙার শব্দ উঠবে তা হাঁড়িই ভাঙুক আর মানুষই ভাঙুক। সবাই ঘুমিয়ে, শুধু একা গগন জেগে আছে ধনজাগার মতো বিশ্বসংসারের ধন আগলে।

কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে একটি কানি ছেঁড়া আর দশ পয়সার পাথর লাইটে ভরে নিলে সাতদিন আর চিন্তা নাই। চোখ বুজে চাকায় ঠেলা মারো, চকমকি পাথরের কেরামতিতে আগুন জ্বলে উঠবে ঝক করে। শালপাতার চটা ধরিয়ে নিয়ে গগন হাঁটতে থাকে। ওদিকে দর্‌গা-বাঁধ, এদিকে বাবা বাঁশিরায়ের থান। যত-দূর চোখ যায় সব চুপ। নিথর। জনপ্রাণিহীন পৃথিবী তার হাত পা ছড়িয়ে ঘুমচ্ছে। রাতের আকাশে শুধু পাখি হুটোপাটি করে। আর শীতের চাঁছা খেজুরগাছ থেকে জিরানকাটের রস নামে—টিপ, টিপ—টিপ, টিপ—। কান পেতে শুনলে সে শব্দটিও শোনা যায় স্পষ্ট। মিঠা রসের নেমে আসার শব্দটিও মিঠা, গুড়পারা।

হাঁটতে-হাঁটতে গগন বাবু দনপাটের ঘরের সামনা-সামনি হয়। জানালার ফাঁকে আলো ; চোখ বাড়ালে হয়তো দেখা যাবে,—মানুষ আর বিড়াল একসাথে নাক ডাকাচ্ছে। গগন সজনাগাছের দিকে না তাকিয়ে তার তলায় চোখ ফেলে, সাদা-সাদা ফুল পড়ে বিছিয়ে গেছে, যেন বিধবারা সব গাদাগাদি করে রাত কাটাচ্ছে। মাথার উপর পাকা ফলের আশুথ গাছে পাখির দল পাকা ফলে ঠোঁটের গুঁতো মারে। এ ত আর দিনের গরাস তোলা নয়, রাতের গণ্ড গেলা। রাতের পেট, তার ছিরিছাঁদটাই আলাদা।

'কে—'

'আমি—। গগন ঘোষ—'

বাবু দনপাটের বউ সাদা কলার থোড়ের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে দরজার মুখে। তার মুখটি ফলেছে কলা ফুলের মতো পরিপাটি। শীত নামছে এক পা এক পা। শাড়িটিকে বুকে পিঠে পাছায় জড়েসাপটে দাঁড়িয়ে আছে। সানু ঘুমচ্ছে ঘরের ভিতর, ঘুমে পাথর। বাবু দনপাটের বিধবা বউ তার সমত্ত, পুরু শরীরটা নিয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন—তার লোক নাই, মরে গেছে। শরীর শুকিয়ে মাঘ মাসের খাল, বুক দুটা কিন্তু থিতান টুকচা জলের নীচে পড়ে আছে জ্যান্ত দুটা শামুক। নড়ে না, চুপচাপ পড়ে আছে। শরীরটা মরে গেছে, কিন্তু পেশি দুটা বেঁচে আছে অবাকভাবে।

'ঘুমাও নি ক্যানে'

'বাদুড় দেখি'

'উঁহু, নাম কর নি তা বলে—'

'ক্যানে'

'রাতের পাখির তবে খাবার জুটবে নি—'

'যত সব বাঁজা কথা—'

কথাটি বলে ফেলে দনপাটের বউ মুখ টিপে হাসে। আলুগাছের গোড়ায় দেওয়া ভেলিধরানো মিহি মাটির মতো সেই হাসি। দাঁতগুলি যেন মাটি ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে ঝোঁকাঝোঁকা কচি আলু, রঙ টকটক করে। ধবধব করে।

'একটুন আগুন দাও ত, বিড়ি ধরাই জুত করে—'

'এত রাতে কি তবে আগুনের তরে—'

আবার হাসে দনপাটের বউ। এবার হাসিটি ভিন্ন। তার থানটির মতোই সাদা, ম্লান। গগন মাঠে চোখ দিতে ভুলে যায়। জাগালদার গগন বিড়ি ধরিয়ে ফসফস টানতে থাকে। কথা বলে না। ঘরে বউ ঘুমায়, গাঁয়ে লোকজন।

'তুমি ক্যানে জাগ—'

'জাগি, যদি কেউ পাখি চুরি করে—'

'তমার কী—উ ত বাগদীদের ফাঁদ—'

'তুমি যদি চুরি কর—'

'আমি—'

'হ্যাঁ গ—তুমি—'

'আমি ত জাগালদার—চোর ধরি—'

'তবে চুরি করে কে—'

আবার হেসে ওঠে দনপাটের বউ। এবার তার হাসিটি একটু লম্বা ; শাঁখ-আলুর মতো সাদা, মিঠা। শরীর বেড় করে যেটুকু শাড়ি তাই তিরতির কাঁপে, কিন্তু কোথাও কোনো হাওয়া নাই। তার হাসিটি ছড়িয়ে যায় মাঠ, গ্রাম, আড় চরাচরে। বাতাস ডানায় মেখে বাদুড় ফল খায়। আর সমস্ত রাতটুকু গায়ে মেখে হাসতে থাকে বউটা। কোথায় যেন ভয় ছিল গগনের। সে ভয়ে হাঁফাতে থাকে—সকাল হয়ে গেল নাকি? পুব আকাশে চোখ পাতে গগন—না, নিকষ আছে নিশি।

বেতের কাঁটায় বাদুড়ের ডানা আটকে গেলে পাখি চিঁ চিঁ করে। লোকে তাদের মেরে ঝোল খাবে। পাখির মাংস কলাপাতে ফেলে খেতে বেশ। গগন ঘোষ চোখ চালিয়ে দেয় ফাঁদ বরাবর। পাখিটা বসেছে ঠিক।

'এই—'

'কি—'

'পাখিটা পেড়ে দও না গ—'

ঠিক বউয়ের মতো করে কথা বলে মাগী। যেন ভাতারের কাছে আবদার করে, 'দও না গ'। আহারে তোর মরা ভাতার? যদি চিয়ান থেত?

দরজার মুখ থেকে বাইরে এসে বউটা গগনের পাশে দাঁড়ায়। খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলে। গগনের শক্ত পুরুষালি হাত, পারবে কেন চটকাতে। গগন তাপ অনুভব করে। আগুন আছে বউটার শরীরে। বিড়ি ছুঁয়ালে বুঝি ধরে যাবে। গগন বলে ওঠে, 'গরম'। বিষম ঢঙে, গতর দুলিয়ে, খিলখিলিয়ে বউটা বলে, 'বিষ আছে এই গতরে।' গগন ঘোষ তাকিয়ে দ্যাখে ঠাসা গতর, কলার মতো আঁত। কাড়ান ছাতুর মতো ফুটে আছে বুক দুটা, রাত এখনও পোহায় নি, তাই আধফোটা। হিমে কলকল করে গগনের পা। বিষধর সাপের শরীর যেমন হিম, গগন ঠিক তেমন হিম হয়ে যায়।

যে জ্যোৎস্নাটুকু গগনের কালো মুখে পড়ে মরে গেছে সেই জ্যোৎস্নাই বউটির কলা-মুখে পড়ে হাট হয়ে আছে। পৃথিবীতে ঈশ্বরের দাক্ষিণ্যটি সবার ওপর সমান নয়। গগন বউটির মুখের দিকে ঠিকমত চাইতে গিয়ে হোঁচট খায়, শীত ঝাড়াপাড়া দিয়ে কুত্তা চেঁচায়। গগন ঘোষ বলে ওঠে, 'কে যায়'। আবার কুত্তা চেঁচায়। কার হেঁসেলের হাঁড়ি ভেঙে গলায় পরেছে হাঁড়িমুখের মালা। লেজটি বড় আঙুল হয়ে বেঁকে গিয়ে কাঁচকলা—কি পাহারা দিবি, রাত জাগবি! গগন তাড়াতে গিয়ে বলে ওঠে, 'হ্যাট'—। কুত্তাটি এবার না চেঁচিয়ে পাড়ার মুখ্যার মতো করে হাসতে-হাসতে দৌড়ে ওঠে। হাসিটি বেশ স্থির, গম্ভীর।

'কি গঅ—'

'পাখি কি হবে—'

'ক্যানে, পুষব—'

'বাদড়ু আবার পোষ মানে—'

গগন এগিয়ে গিয়ে বাঁশে-বাঁধা বিচালি টেনে ফাঁদ নামায়। পাখিটি খুলে হাতে নিয়ে দ্যাখে, পো দুই মাংস হবে। মনে-মনে বলে,—'একটা পাখি ত, চাইচে ত দিলম —ইটা কখনঅ চুরি বলে নি।' বউটার হাতে পাখি দিয়ে বিচালি টেনে ধরলে ফাঁদটি সরসর করে আকাশে উঠে যায়। বাদড়ুের ডানাঝাপটায় বউটির বুক থেকে কাপড় সরে যায়। গগন দ্যাখে, মেয়েমানুষের ছাতির ওপর কেমন দুটা মন্দির বসে আছে—মড়া শ্মশানের সাদা-সাদা মন্দির। মন্দির দুটোর মাঝে সেই মাঘ মাসের শুখা খাল ; কিংবা তমাল নদী বয়ে গেছে— ; জল নাই— নদীর বুকের মাটিটি জেগে আছে। আহা, কী মিহি মাটি—ধান লাগালে ধান হয়, গম দিলে গম। গগন আস্তে আস্তে বউটির খোলা কাঁধে হাত রাখে,

'এই—'

'এই কী, নাম নাই?'

'কী বলব—'

'ক্যানে, কল্পনা।'

'কল্পনা—'

'.....'

কল্পনা সাড়া দেয় না। সাড়া দেয় লইদীঘির জলে সাইপ্রিনাস মাছ, ঠোঁট তুলে ফুটে ছাড়ে। পাড়ে কলআলা চণ্ডী ঠাকুরের ধানভানা কল হিমে থ। চাষির বিলে সদ্য-ফলা শীষে পরতে-পরতে দুধ জমতে থাকে—গম জন্মাচ্ছে। মাঝপুকুরে শালুকফুলের ওপর পোকা বসে বিঁধতে থাকে ফটাস ফটাস। ঘাস শরীর ভরে হিম খায়। রাত কাঁপে হিটিহিটি। এরই ফাঁকে কখন ভোর হয়ে গেছে। বোস্টম খুড়ো 'রাই জাগো রাই জাগো' সুরে নগরকীর্তনে বেরিয়ে পড়েছে। সেই সুরে 'জেগে গিয়ে' দুটা মানুষ কলঘরে ছটপট করে। তখন রাতের পাখি ধুয়ো আকাশ চিরে উঠে যায়, ফল থেয়ে বীজটি ফেলে দেয়—হজম করতে পারে না। সেই বীজ এসে মাটিতে পড়লে,—মহাপৃথিবী ধারণ করে।

আমাদের সবার আপন

ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

৮

শোলক-বলা কাজলাদিদি

তারিখের সঙ্গে-সঙ্গে একেকটা বারও জীবনের শেষ অবধি কেমন যেন মনে থেকে যায়।

মা বলতেন, বুধবারে আমার নখকাটা বারণ। ওটা আমার জন্মবার।

ঢোলগোবিন্দর আসলে বুধবারটা মনে আছে সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে। বুধবার ছিল দিদির ইস্কুলের ছুটির দিন। যতদিন হরি ঘোষের গোয়ালে ভরতি হয় নি, ততদিন বুধবারটা সারাদিন সে দিদির কাছে থাকতে পারত।

উঠোনে গাছে জল দেওয়া, লক্ষ্মীগাইকে খেতে দেওয়া, বেলা পড়ে গেলে পুকুরপাড় থেকে চই-চই করে হাঁসগুলোকে ফিরিয়ে আনা, এসব কাজে দিদি ছিল মা-র হাত-নড়কুত। মাচায় শশা আর উচ্ছে, রান্নাঘরের চালে কুমড়ো, কাঁটাঅলা বোঁটায় বেগুন, মাটির তলায় পেঁয়াজ, গাছে লঙ্কা বিস্তর হত। সন্ধেবেলায় তুলসীতলায় পিদিম দেওয়া, শাঁখ বাজানো—এসব দিদিই করত।

গরমকালের কাঠফাটা রোদ্দুরে শুকিয়ে-যাওয়া তুলসীর মাথায় ঝোলানো ফুটো সরা থেকে টুপ-টাপ টুপ-টাপ করে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল পড়ার দৃশ্যটা ঢোলগোবিন্দর চোখে আজও লেগে আছে। গরমকালে সকালে উঠে দিদির প্রথম কাজই ছিল সরাটাতে জল ঢেলে কানায় কানায় ভরতি করা।

এ বাড়ির অত আদরের এমন যে দিদি, যার বাপের বাড়ির নাম 'খুকী' আর বাইরের পোশাকি নাম 'রেণুকা' বা 'রেণু'—তার একদিন বিয়ে হয়ে গেল।

দিদির বিয়ের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িতে ব্রত করার পাট সেই যে উঠে গেল, পরে আর কখনও তা ফিরে আসে নি।

কিন্তু দিদির ব্রত করার সেই ছবিটা ঢোলগোবিন্দর বুকের মধ্যে চিরদিনের মতো রয়ে গেল।

গোবরজলে নিকোনো মেঝে। তাতে পরিপাটি করে পিটুলিগোলার আলপনা। মধ্যিখানে মাটির বাঁধ দিয়ে হয়েছে পুকুর। তার মাঝখানে পাতাসুদ্ধু বেলের ডাল। পুকুরপাড়ে ছড়ানো রকমারি ফুল। দিদি বসেছে কাঠের পিঁড়িতে। বামুনপুরুতের কোনো বালাই নেই। মেজো-

কাকিমা দিদিকে সব বলে-বলে দিচ্ছেন। বাইরের উঠোনে ঝাঁ-ঝাঁ করছে চোতমাসের রোদ্দুর।

ফুলচন্দন হাতে নিয়ে দিদি বলছে :

পুনিপকুর পুষ্পমালা, কে পুজে রে দুপুরেবেলা?
আমি সতী লীলাবতী, ভাইয়ের বোন, পুত্রবতী।
হয়ে পুত্র মরবে না, পৃথিবীতে ধরবে না।

তারপর অঞ্জলি করে দিদি যখন বলত :

পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে,
মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে—

মনটা যে কী খারাপ হয়ে যেত বলার নয়।

দিদির বিয়ে হয়ে মা বেশ একটু ঝাড়াহাতপা হতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া মা-র কাজের বোঝা হালকা হয়েছিল মেজোকাকিমা আসার পর।

সে সময়ে বাবুদের বাড়িতে জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজই করত বাবুদের অবাঙালি পিওনেরা। মাসে একবার করে তারা আপিসে যেত শুধু টিপসই দিয়ে মাইনে আনতে। থাকার জন্যে তাদের ছিল দুটি বেডের একটি করে ঘর। সে ঘরে চাকরিপ্রার্থী দেশোয়ালি আদমিদের ভিড় সারা বছরই লেগে থাকত। আবগারির লোক বলে বিনা পয়সায় ওদের ঘরে হরবখত গাঁজার জমাটি আড্ডা বসত।

বাবার যে বাড়ির পিওন ছিল, তার নাম শুভলাল। আমাকে 'রামবাহাদুর' আর দাদাকে 'জংবাহাদুর' বলে ডাকত। সামনের দুটো দাঁত ছিল সোনা-বেঁধানো। একটা হাতে উলকি। যেমন আমাদের ভালোবাসত, তেমনি শাসনও করত। আর দেওতার মতো ভালোবাসত বাবাকে।

আপিসের পিওন ছিল স্থানীয় এক মুসলমান। মাঝে-মাঝে তগিতে-ধরা জিওল মাছ এনে আমাদের খাওয়াত।

ইস্কুলের ক্লাসঘরে বা খেলার মাঠে যে বন্ধুত্ব তার মধ্যে জাত-ধর্মবর্ণের কোনো খাদ থাকত না। মুশকিল হত কেউ কারো বাড়িতে গেলে। জীর্ণ সংস্কারের কাপড়ে সেই বৈষম্য কিছুতেই ঢাকা যেত না।

কেউ এক গ্লাস জল চেয়ে বসলে কিংবা বাইরের কাউকে খেতে বললে তার এঁটো ধোয়া নিয়ে বাড়ির কাজের লোকেরাই বেঁকে বসত। আমাদের বাড়িতে এ নিয়ে কোনো মুশকিল ছিল না। আগে থেকেই সবাইকে বলা থাকত, বাইরের লোকের এঁটো থালাগেলাস মা নিজেই সব ধুয়ে রাখবেন।

ছোঁয়াছুঁয়ির এই ব্যাপারটা যোলো আনা চাপা যেত না। যার মনে লাগার তার ঠিক লাগত। তখন নিজেদের খুব বোকা-বোকা মনে হত।

উচ্চবর্ণের বলে সে আঁচ আমাদের গায়ে লাগত না। মনে-মনে অস্বস্তি হওয়ার সেটাও ছিল একটা বড়ো কারণ।

বাবার চাকরির সূত্রে নওগাঁকে যতটুকু জেনেছিলুম, আড়ে-বহরে তা খুব বেশি নয়।

গাঁজার জায়গা বলে দেশের লোকে তখন একডাকে নওগাঁকে চিনত। গাঁজা ছাড়া ছিল পাট।

নওগাঁয় ছিল পাটের বিরাট সমবায়। সে সময়ে সমবায়ের প্রাণপুরুষ ছিলেন সরকারের এক বড়ো আমলা। যামিনী মিত্তির মশাই। শয়নে জাগরণে তাঁর স্বপ্ন ছিল সমবায়। বাবা তাঁকে চিনতেন। তাঁর অত সাধের সমবায় আন্দোলন মার খাওয়ায় শেষ জীবনটা তাঁর কী রকম মনঃকষ্টে কেটেছিল, বাইরে-ঘরের সেসব আলোচনার ছিটেফোঁটা মাঝে-মাঝে আমাদের কানে ছিটকে আসত।

গাঁজা-চাষের বাঁধা-ধরা একটা এলাকা ছিল। যারা গাঁজার চাষ করত তাদের বলা হত খেতোল।

বছরের একটা সময়ে আমাদের কোয়ার্টারের সামনে রথের মেলার মতন ভিড় জমে যেত খেতোলদের। তারা আসত পাট্টা বদলাতে। কলকাতা থেকে বাড়তি লোক আসত চাতোরের ডিউটিতে। 'চাতোর' কথাটা তখনই যা শুনেছি। ঠিক মানেটা কখনও জেনে নেওয়া হয় নি।

চাতোরের বাবুরা এসে তাঁবুতে থাকত।

এই সময় আমি আর দাদা একটা কেটলি আর একটা ঘটি নিয়ে খেতোলদের জল দিতাম। তারা যে কত দোয়া দিত বলার নয়। আমাদের কাছে ওটা ছিল খেলা।

খেতোলদের মধ্যে যারা ছিল শাঁসালো, তারা খাতির পেত—বসবার জন্যে তাদের চেয়ারও জুটে যেত। বাকিরা সবাই ঘাসের ওপর ঘট হয়ে বসে থাকত। পাট্টা বদলানোর দিনগুলোতে মাঠে তিলধারণের জায়গা থাকত না। খেলা বন্ধ করে আমরা তখন পুকুরে ছিপ নিয়ে বসে যেতাম।

এরই কাছাকাছি একটা সময়ে নদীর ধারের গাঁজা-

গোলায় মন-মন বাতিল গাঁজা যখন পুড়িয়ে ফেলা হত, রাস্তার মানুষ কাপড়ের খুঁটে নাকচাপা দিয়ে হাঁটত। সে গাঁজার কতটা আগুনে আর কতটা কলকেয় পুড়ত কে তার হিসেব রাখে?

এমনি একটা সময়ে বিমলকাকাবাবু এসেছিলেন। উনি বড়ো চাকুরে। ওঁর জন্যে খাটানো হয়েছিল একটা বড়ো তাঁবু। বিমলকাকা ছিলেন খুব শৌখিন লোক। সাহেবি মেজাজ। ওঁর স্ত্রীকে সবাই মেমসাহেব বলত। উনি ছিলেন বেশ খাণ্ডারনি মহিলা। সন্ধেবেলা অরগান বাজালে কী হবে, চাকরবাকরদের ইংরিজিতে ড্যাম-ইস্টুপিড বলতেন। বিমলকাকাবাবু ছিলেন নাকি পাঁড় মাতাল। নইলে কারো চোখ ভাঁটার মতন হয়!

সন্ধে হলে ছুতোনাতায় আমরা একবার অন্ধকারে তাঁবুর পাশ দিয়ে ঘুরে আসতাম। তাঁবুর একধারে ছিল রসুইঘর। সেখানে বিমলকাকাবাবুর বাবুর্চি মুরগি রাঁধত। মশলাদার মাংসের ঝাঁঝালো গন্ধে আমাদের জিভে জল আসত। মাঝে-মধ্যে যে দু-চারজন ইয়ার-দোস্তদের নেমন্তন্ন করে ওঁরা খাওয়াতেন তারা সবাই ছিল সরকারের ওপরমহলের লোক। ফলে, বাবুর্চির অত ভালো রান্না কোনোদিন আমরা চেখে দেখার সুযোগ পাই নি।

কিন্তু সকালে যখন দেখতাম রাস্তার পাশে মুরগির পালকগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে, মানুষগুলোকে ভারি নিষ্ঠুর বলে মনে হত।

পাড়ার ছাঁ-পোষা লোকজনেরা ওঁদের সাহেব কেতা আদৌ পছন্দ করত না। বিমলকাকাবাবুর দামি ছুঁড়ি, ফেলে-দেওয়া মদের বোতল আর আয়াবাবুর্চি রাখার মধ্যে তারা এমন এক লাটসাহেবির গন্ধ পেত, যেটা মাইনের টাকায় হওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়।

সকলের ভাগ্যি ভালো, নওগাঁর মতো ছোটো জায়গায় বেশিদিন ওঁদের মন বসে নি।

আমাদের পাশে বিরাট টানা বারান্দাঅলা ব্যারাকবাড়িটাকে সবাই বলত মেসবাড়ি। আজকের দিনে হলে নাম দেওয়া হত অতিথিনিবাস।

যাদের পাকাপাকিভাবে কোয়ার্টার মেলে নি, যারা আসত এটা-সেটা অস্থায়ী কাজে—শীল্ডে ফুটবল খেলতে, বছরের শেষে ইস্কুলে-ইস্কুলে বই ধরাতে, গ্রামাঞ্চলে বন্যার ঠেলায়। এইরকম নানা সুবাদে আসা মানুষজনের পায়ের ধুলো পড়ে মেসবাড়িটা সম্বৎসর সরগরম থাকত।

পুকুরের তিন পাড়ে তিনটে দোতলা বাড়ি। লাল ইঁটের। দক্ষিণের বাড়িটা রেজিস্ট্রারের। সামনে পেছনে প্রকাণ্ড বাগান। খেলাধুলো করবার জন্যে যেতাম গট গট করে সদরের গেট দিয়ে। কিন্তু নারকোলেকুল আর কাঁঠালচাঁপা পাড়তে হলে যেতাম ঝাঁ-ঝাঁ রোদে ঠিক-দুপুরে, পেছনের তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে।

পুবের লালরঙা দোতলা বাড়ির খিড়কিতে ছিল প্রকাণ্ড পুকুর। সেখানে মাঝে-মধ্যে শৌখিন শিকারীরা ছিপ নিয়ে বসত। কে নাকি সেখানে আধমনি, কে তিরিশ-সেরি মাছ তুলেছে—এই নিয়ে কী বারফাট্টাই।

আমরা যখন যাই, তখন ওই তিনটে বাড়ির দক্ষিণেরটাতে থাকতেন কবির সাহেবরা, পুবেরটাতে একজন আবগারি সুপারিনটেনডেনট আর উত্তরেরটাতে থাকত ছোটো আলমগীররা।

ছেলেবেলার কোন্ কথা কেন মনে থেকে যায়, হয়তো তা মনস্তত্ত্ববিদেরা বলতে পারেন। কিন্তু জেনে কী লাভ হবে?

এই যেমন, ছোট আলমগীরদের বাড়িতে প্রথম দেখে-ছিলাম দোতলার স্নানের ঘরে চেয়ার-কমোড। সাহেবরা নাকি উবু হয়ে বসতে পারে না। এসব বাড়ি তো তখন সাহেবদের কথা ভেবেই তৈরি হত। চেয়ারের মাঝখানের ফুটোটুকুই আমি দেখেছিলাম। শুনেছিলাম তাতে দরকারের সময় অ্যালুমিনিয়ামের একটা বাটি লাগিয়ে নেওয়া হয়।

কিংবা পুবের বাড়িটার উঠোনে দাঁড়িয়ে দোতলার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখেছিলাম একটা বড়ো গড়গড়ার নল মুখে লাগিয়ে এক গিন্নিবান্নি মানুষকে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে।

মেসবাড়িতে যেই যখন আসুক, ছোটোদের সঙ্গে তাদের ভাব না হয়েই পারে না।

আজ এ-দপ্তর, কাল সে-দপ্তর। এইভাবে সরকারি বাবুরা প্রায়ই আসতেন প্রদর্শনী নিয়ে। কখনও বন, কখনও কৃষি। কখনও চামড়া, কখনও তাঁত।

কোয়ার্টারে যাঁরা সপরিবারে থাকতেন, দুদিনের জন্যে আসা অতিথিদের নিয়ে তাঁরা খুব একটা মাথা

ঘামাতেন না। কে কেমন লোক কে জানে। বিবাহিত না অবিবাহিত, কার কী জাত জানা নেই। উটকো লোক বাড়িতে এলে পাড়ায় তা নিয়ে কথা হতে পারে। বেশির ভাগেরই তো ছোকরা বয়েস। কেউ-কেউ আবার স্নো-পাউডারও মাখে। ডাইনে-বাঁয়ে সীঁথি কাটে।

ওদেরও বয়ে গেছে বড়োদের সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব করতে। বারান্দার বাইরে যে ছেলেরা দুমদাম বল পেটাচ্ছে আর ঘরে বল চলে গেলে একদৌড়ে কুড়িয়ে আনছে, একটা বিসকুট দিয়ে আর গোপালভাঁড়ের দুটো গল্প বলে তাদের অনায়াসে হাত করা যায়। ওরাই তো পাড়ার গেজেট। সকলেরই হাঁড়ির খবর রাখে। তা ছাড়া যখন তখন ফাইফরমাসও খাটিয়ে নেওয়া যায়।

আমাকে তো একজন হাত করেছিল স্রেফ একটা কাঁচের টেবিলচাপা দিয়ে। আমার কাছে সে এক আশ্চর্য ম্যাজিক। চারদিক বন্ধ একটা নিরেট কাঁচের মধ্যে আস্ত একটা সবুজ গাছ। ভাবতে পার?

ঢোলগোবিন্দ গুম হয়ে বসে থাকে।

তার মনে পড়ে যায়, সাপের চামড়ার প্রদর্শনী নিয়ে আসা এক ভদ্রলোকের কথা। তাঁর টেবিলে ছিল চার-কোনা রটিং কাগজের একটা প্যাড। অসাবধানে তার হাত লেগে দোয়াতের খানিকটা কালি তার ওপর চলকে পড়তেই সে দেখল এক অবাক কাণ্ড। টলটলে কালিটুকে রটিংপেপার যেই না শুষে নিল, অমনি তা দেখতে হল সান্তাহার স্টেশনে অবিকল রাত পুইয়ে সকাল হওয়ার মতন।

ঢোলগোবিন্দর জীবনে এ জিনিস আরেকবারও ঘটেছিল।

ও তখন দমদম জেলে। রেল-ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার পর গোটা জেলখানায় তখন বন্দীর ভিড়ে পা ফেলার জায়গা নেই। এক সপ্তাহে ওর ওপর পড়ল চার শো লোকের চা তৈরির ভার। বিরাট-বিরাট হাঁড়ি আর ডেকচি। টিন-টিন দুধ। একেবারে যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপার।

গুঁড়ো চায়ের পুঁটুলি ডুবিয়ে লিকারের রঙ হয়েছে কষকষে। যেই না তাতে দুধ পড়া, অমনি অবিকল সেই সান্তাহারে সকাল হওয়া।

পৃথিবীতে সবার মন একরকমের নয়। পঞ্চেন্দ্রিয় কুড়িয়ে-বাড়িয়ে পাঁচ আঙুলের যে ছাপ তুলে রাখে, সেসব ছাপ যার-যার তার-তার। ঢোলগোবিন্দরটা ঢোলগোবিন্দর।

দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মা-র মধ্যে একটা ঝাড়াহাতপা হওয়ার ভাব।

মেজোকাকিমা যে মা-র অতটা ন্যাওটা হয়ে যাবে, এটা বোধহয় কাকাদের ঠিক হিসেবে ছিল না। মেজো ছেলের জন্যে ফরসা মেয়ে এনে ঠাকুরদাও বোধহয় মনে-মনে এই ভেবে খুশিই হয়েছিলেন যে, বড়ো বউমার ওপর একহাত নেওয়া গেছে। তার মানে, রঙের তুরুপ।

কাকিমা এসে মা-র সংসারের বোঝা একটু হালকা হওয়ায় মা-র মধ্যে আস্তে-আস্তে একটা চনমনে ভাব ফুটে উঠছিল। একটু ফাঁক পেলেই পাড়ায় এবাড়ি ওবাড়ি যাওয়া, যে শোক পেয়েছে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া, যে ভয় পাচ্ছে তাকে ভরসা। এবাড়িতে হাম, ওবাড়িতে বণ্টিতে হাত কাটা। একটা না একটা লেগেই থাকে। মা সবকিছুরই টোটকা জানেন।

বাবা যে এত এখানে ওখানে যান, বাবার কাছে প্রায়ই যে কাজেকর্মে এত লোক আসে, বাইরের ঘরে এত যে লম্বাই-চওড়া কথা হয়—তবু আমাদের জগৎটা সেই সরকারি কোয়ার্টারের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। সেই থোড়বড়িখাড়া আর খাড়াবড়িথোড়।

একবার সমবায় নিয়ে সারা-বাঙলা কী একটা সম্মেলন হয়েছিল। শামিয়ানা টাঙানো হয়েছিল ফুটবল খেলার মাঠে। চারপাশ ঘিরে পড়েছিল সার-সার তাঁবু। আমার ছিল সেটা চোখে-না-দেখা, শুধু দাদার কাছে শোনা কথা। কেননা তখনও আমি অত দূরে যাওয়ার মতন বড়ো হই নি।

আমার জিভে লেগে আছে শুধু তার স্মৃতি।

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিঙ থেকে এসেছিলেন একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক। সমবায়ের কোনো কেষ্ট-বিষ্টু। ছেলেটির কী যেন নাম। বোধহয় বীর বাহাদুর। তার সঙ্গে আমার দাদার হয়ে গিয়েছিল হলায়-গলায় ভাব। ফিরে গিয়ে দাদাকে ইংরিজিতে চিঠিও দিয়েছিল। দাদার আর দেব-দেব করে উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠে নি। আসলে তা নয়। দাদা বোধহয় বুঝেছিল, নওগাঁয় ক্লাস টু-থ্রীতে পড়া ছেলের পেটে এমন বিদ্যে গজায় না যাতে সে ইংরিজিতে চিঠির উত্তর দিতে পারে।

কিন্তু সেটা কথা নয়। বীরবাহাদুর চলে যাবার আগে সম্মেলনে বেঁচে-যাওয়া চানাচুরের বড়ো একটা টিন দাদাকে দিয়ে গিয়েছিল। জীবনে সেই প্রথম আমার চানাচুর খাওয়া। তার স্বাদ আজও আমার মুখে লেগে আছে।

আর মজা হত শীতের খেলা হলে। উত্তর বাঙলার নামি-নামি সব ক্লাবের প্লেয়াররা এসে উঠত মেসবাড়িতে।

আমাদের তখন পায় কে?

রেলের লোকোটিম আর জেলাশহরের টাউন ক্লাব-গুলো শীতে খেলতে আসত। আমাদের কাজ ছিল মেসবাড়িতে গিয়ে প্লেয়ারদের যাবতীয় ফাইফরমাস খাটা আর ভক্তিভরে তাদের পা টিপে দেওয়া। উত্তর বাঙলায় কাঁসর প্লেয়ার ছিল তখন। শরৎ সিং, তরু সেনগুপ্ত। ছোটোদের সব হীরো। একেকটা যেন হীরের টুকরো।

জলপাইগুড়ি থেকে এল একবার এক জাঁদরেল টিম। সে টিমের যিনি ম্যানেজার, হঠাৎ তিনি সটান আমাদের বাসায় এসে হাজির। স্বয়ং টিমের ম্যানেজার। ভাবা যায়?

কী ব্যাপার? না, কাকিমা বললেন ওঁর দিদির ভাশুর হন যে। তার মানে, আমাদের মহামায়ামাসীর ভাশুর। তবে তো খুবই আপন। আমাদের বাড়িতে না থাকুন, একদিন তো ওঁকে খেতে বলাই উচিত।

কাকিমাই তো নিজে থেকে আগ বেড়ে বলা উচিত ছিল। তা নয়। আমাকে আর দাদাকেই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হল। বড়োদের নিয়ে এই হল মুশকিল।

কাকিমার কথা শোনো। বলেন কি, 'আত্মীয় আবার কিসের? কুটুম তো।' তা ছাড়া ওই পরিবারের নাকি বড়ো বেশি টাকার গুমর। চা-বাগানের শেয়ার আর জমিদারির আয়ে পায়ে পা দিয়ে বসে খায়। কাণ্ডটা বলতে যা বোঝায়? ভদ্রলোক হলেন তাই। শিকার আর ফুটবল—এই নিয়েই দিব্যি আছেন।

আঃ, কী দেবদূতের মতো চেহারা। মাজা রঙ, প্রশস্ত কপাল। ব্যাকব্রাশ-করা চুল। সোনার চশমা। ঢুলু-ঢুলু চোখ। গালদুটো একটু ভাঙা। গরদের পানজাবি। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন আসর জাঁকিয়ে।

ভদ্রলোককে চোখ কুঁচকোতে দেখে দাদা পিছিয়ে আসছিল। পেছন থেকে ঢোলগোবিন্দ হাত দিয়ে আটকাল। কে যোগমায়া? কে মহামায়া? যাই হোক, আবগারি কথাটায় শেষ পর্যন্ত কাজ হল।

আমাদের উদ্ধার করতে বাড়িতে উনি এলেন। বাইরে কচি-কাঁচাদের ভিড় জমে গেল। ছোটো ভাইয়ের শালীর সঙ্গে নিজের শালীর মতোই ব্যবহার করলেন। অত বড়ো একজন লোক। কিন্তু কী আত্মীয়স্য! দুপুরে চর্ব্যচোষ্য খেয়ে বিছানায় লম্বা হলেন। আমরা পা টিপে দিলাম। উনি ঘুমোলেন।

পরে কী হল, বলব?

অবশ্য না বলারই বা কী আছে। ঢোলগোবিন্দ বোঝে জীবনে এইরকমই হয়।

জলপাইগুড়ি উঠল ফাইনালে। উঠবে না? উঠবেই তো। কার টিম? সেটা তো দেখতে হবে।

মাঠে সেদিন সারা শহর ভেঙে পড়েছে। ধুন্ধুড়ির সঙ্গে ফাটাফাটি খেলা।

হাফটাইমের আগে একটা গোল খেয়ে জলপাইগুড়ির থোঁতা মুখ ভোঁতা। আমি আর দাদা সমানে এতক্ষণ বাক-আপ বাক-আপ বলে চেঁচিয়েছি। গোল খেয়ে আমাদের তখন কাহিল অবস্থা। আর হবি তো হ, হাফটাইমের পর আবার একটা গোল।

হঠাৎ দেখি, আমাদেরই আত্মীয়—ধুড়ি, কাকিমার কুটুম—সেই ভদ্রলোক মদ খেয়ে বেহেড অবস্থায় মাঠের ভেতরে চলে গিয়ে তান্ডবনৃত্য শুরু করে দিয়েছেন আর দুহাতে কাপড় তুলে যাচ্ছেতাই সব খিস্তি করে চলেছেন। শহরের লোকে থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে যখন তাঁকে চ্যাংদোলা করে মাঠ থেকে বার করে আনছে, তখন আমি আর দাদা আর সেখানে থাকি? ফুটবলের খুরে দন্ডবৎ করে সোজা বাড়ি।

পরের দিন বন্ধুরা কেউ যখন বলেছে, 'হ্যাঁরে, তোদের সেই আত্মীয়—', তখন তার উত্তরে এমন একটা ভাব করে তাকিয়েছি যেন বলতে চেয়েছি, 'আত্মীয় না কচু! বাসায় এসেছিল বটে, তবে ভালো করে তাকে কেউ চেনেই না—উঁহু, আমার কাকিমাও না।'

ছোটোরা কীরকম বিচ্ছু হয়, ঢোলগোবিন্দ নিজেকে দিয়ে তা বিলক্ষণ জানে।

মেসবাড়িতে এসে উঠত বিচিত্র ধরনের মানুষ। মেয়াদ কারো কম, কারো বেশি।

চাটগাঁ থেকে কোনো এক আত্মীয় আবগারি অফিসারের চিঠি নিয়ে মেসবাড়িতে এসে উঠেছিলেন এক ওষুধের ব্যবসায়ী। খাড়া নাক, লম্বা মুখ, খদ্দর পরার দরুন বেশ সাত্ত্বিক চেহারা। তিনি চলে যেতে সারা শহর চালমুগরার সাবানের বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গেল।

যেসব বউরা প্রথম সাক্ষাতেই মা-কে মাসিমা বলতেন, তাঁদের বউদি বলে ডাকার অভ্যাসটা আমাদের সড়গড় হয়ে গিয়েছিল।

এইরকমের এক বউদি একবার ঢোলগোবিন্দর মনে বড়ো দাগা দিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা অবশ্য এমন কিছুই নয়।

'ডেপুটির জীবনচরিত' লিখেছিলেন কে? গিরীশ সেন? না, গিরীশ নাগ? যিনিই লিখে থাকুন, তাঁর ছেলে। আর ছেলের বউ। মানে, আমাদের বউদি।

বউদির ছিল ভারি মিষ্টি চেহারা। নইলে কি আর ঢোলগোবিন্দর সঙ্গে ভাব হয়? দেখতে ভালো হবে, মানুষটা ভালো হবে—তবে ঢোলগোবিন্দ তার কাছে ঘেঁষবে।

দাদাবউদি দুজনেই ছিলেন একটু মুখচোরা চাপা ধরনের মানুষ। ঢোলগোবিন্দ মনে করতে পারে না দাদার চাকরিটা ঠিক কী ছিল।

(হ্যাঁ, ঢোলগোবিন্দর অসাক্ষাতে একটু চিমটি কেটে একটা কথা জনান্তিকে আপনাদের জানিয়ে রাখি। ঢোলগোবিন্দ বেজায় ভুলো লোক। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে ওর জুড়ি নেই। ওকে একটু চেপে ধরুন, দেখবেন একই মুখে দুরকমের কথা বলছে। সেই সঙ্গে বয়সের ব্যাপারটা তো আছেই। একবার মুখ খুললে আর থামে না। একই কথা দশ জায়গায় দশ রকম করে বলবে। মাঝের থেকে চোর দায়ে লোকে আমাকে ধরে। বলে, তুমি লেখ কেন ওসব ছাইপাঁশ?

(আমার কপালটা কী। একবার দেখুনে ধর্মাবতার! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। পেট চালানোর জন্যে আমাকে তো লিখতেই হবে, ধর্মাবতার!

(ঢোলগোবিন্দকে মাঝে-মাঝে আমি জেরা করি না তা নয়। ওর এই দাদাবউদির প্রসঙ্গটাই ধরুন না কেন। ওকে জিগ্যেস করেছিলাম, দাদাটির গোঁফ ছিল? ও বলেছিল, হ্যাঁ—বেশ পুরুষালি গোঁফ। তার ঠিক দু মিনিট পরেই বলে কিনা—না হে না, গোঁফটা কেটে দাও। তাহলেই বুঝুন, ও ব্যাটা আমাকে দিয়ে যেমন লেখকের তেমনি নাপিতের কাজটাও করিয়ে নিচ্ছে।)

সেদিন ছিল সরস্বতীপুজো। সকালে উঠে স্নানটা সেরে নিয়ে সাঁ করে ঢোলগোবিন্দ চলে গিয়েছিল বউদিদের বাড়ি। গিয়ে দেখে দাদার হাতে কী একটা বই।

'কী গো দাদা, আজ না অনধ্যায়? দূর, আজ কেউ বই পড়ে?' বলে ঢোলগোবিন্দ ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নেয়। দাদার ঠোঁটে স্বভাবসুলভ হাসি নেই। চোখটা একটু কুঁচকে আছে। তাও যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন, 'বইটা দাও।'

কোথায় যেন একটা তাল কেটে গেছে। ঠিক এরকম হওয়ার তো কথা ছিল না।

ভেতরে ঢুকে দেখল বউদি চা-টোস্ট খাচ্ছে। ঢোলগোবিন্দ একটু অবাক হয়েই বলল, 'সে কী বউদি, তুমি অঞ্জলি দিতে যাবে না?'

বউদি একটু হেসে চুপ করে থাকলেন। তারপর ঢোলগোবিন্দর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'না রে, গোবিন্দ। আমাদের যেতে নেই।'

ঢোলগোবিন্দ যেন চাবুক খেয়ে চমকে উঠল।

'যেতে নেই? কেন?'

'বা রে, তুই জানিস না! আমরা যে ব্রাহ্ম। হিন্দু নই।'

ঢোলগোবিন্দ ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। চোখে সে কেমন যেন অন্ধকার দেখতে লাগল। বউদিরা হিন্দু নয়? তাহলে ব্রাহ্মরা কী?

সেবার পাড়ায় হৈ-হৈ কাণ্ড রৈ-রৈ ব্যাপার। সত্যিই হৈ-হৈ কাণ্ড রৈ-রৈ ব্যাপার।

বাঘ নয়। সিংহ নয়। সার্কাস নয়। চিড়িয়াখানা নয়।

হাতি। হ্যাঁ মশাই, সত্যিকার হাতি।

ঢোলগোবিন্দরা দেখল কোথাকার কোন্ দুবলহাটি না দিঘাপাতিয়া থেকে উড়ে এসে জমিদারের এক হাতি ওদের খেলার মাঠটা জুড়ে বসেছে। ওর যা শুঁড় দোলানোর কেতা, তাতে কার সাধ্যি তাকে দূর-যা করে তাড়ায়। ওর কুলোর মতো কানদুটো দিয়ে ছোটোদেরই বরং সে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করছে।

শুভালাদের কাছ থেকেই এ ব্যাপারে প্রথম একটা পাকা খবর পাওয়া গেল।

বর্ষায় দেশগ্রামের কী হাল হয়েছে দেখে এসো গা। এখেনে পোস্টাপিসেরই তো হাতায় জল। রাজবাড়ি ডুবুডুবু। তা জমিদারবাবুরাই তো এয়েছেন হাতির পিঠে চেপে। তিন দিন তিন রাত যে জল হল, সে কি সোজা বৃষ্টি। জল না নামা পর্যন্ত ওঁয়ারা এখেনেই থাকবেন। ওই মেসবাড়িতেই।

ঢোলগোবিন্দর প্রথমেই মনে হল, খেলার মাঠটা গেল বেহাত হয়ে। তারের বেড়ার ওপাশটা দিয়ে একবার সে ঘুরে দেখে এসেছে। হাতিটার সমানে মুখ চলছে। কচি-কচি ডালপালা কচরমচর করে খাচ্ছে। কদিন থাকলে ওর নাদাতেই তো মাঠের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিছু বলাও যায় না। বানভাসি হয়ে এসেছে হাজার হোক।

বাপ রে, অত লটবহর আর অত লোকলস্কর! আনল কেমন করে? আবার কত বায়নাক্কা। দরজায় ঝুলিয়েছে বাহারি পরদা। বারান্দায় দুই বরকন্দাজ। বসে-বসে খৈনি ডলে আর থুথু ফেলে। ডে-লাইটে আলো হয়ে থাকে সারা বাড়ি।

বাজার থেকে আসে তাড়া-তাড়া পান। বারান্দার নীচেটা পানের পিকে লাল হয়ে থাকে।

বাবুর্চি আর খানসামা, ঝি-চাকর আর হুঁকোবরদারে সারা বাড়ি গমগম করে।

হাতি দেখতে সারাদিন ভেঙে পড়ে শহরের লোক।

ঢোলগোবিন্দদের গোড়ায় মজা লেগেছিল, কিন্তু ছাঁ-পোষা লোকদের পাড়ায় অত বড়লোকি কদিন সয়?

গায়ে সন্ধের অন্ধকার ঢাকা দিয়ে কারা নাকি সব ওবাড়িতে আসে। হারমোনিয়াম এসরাজ আর তবলার সঙ্গে শোনা যায় ঘুঙুরের বোল। মাঝে-মাঝে নাকি বড়ো-বড়ো কালোয়াত আসে। মহাফল হয়। ঢোলগোবিন্দরা তার কী জানবে? সন্ধে হলেই তো ওদের চোখ ঘুমে ঢুলে আসে। ওরা শুধু শুনতে পায় পাড়ার লোকের গজর-গজর। আর দেখে দূর থেকে তাদের ল্যাজনাড়ানো আর তড়পানো।

বানের জল নেমে গেলেও জমিদারবাবু কিন্তু নড়েন না। একা হাতিটাই যা মাঠ ছেড়ে এদিক ওদিক টহল দিয়ে বেড়ায়।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল বারান্দার নীচে একটা খাট নামিয়ে নারকোলদড়ি দিয়ে লম্বা-লম্বা বাঁশের সঙ্গে বাঁধা হচ্ছে। বারান্দায় রাখা হয়েছে ফুলের কয়েকটা তোড়া। বাড়ির ঝি-রা ঘরের বাইরে এসে চোখে আঁচলের খুঁট চাপা দিচ্ছে।

জমিদারগিন্নিকে ধরাধরি করে যখন খাটে তোলা হল, তখন নাকি তাঁর মুখটা নীল দেখিয়েছিল।

পাড়ায় এতসব কাণ্ড হয়েছে—না ঢোলগোবিন্দ, না তার দাদা বিন্দুবিসর্গও জানতে পারে নি। ওরা দুজনেই তখন ইস্কুলে।

গোটা পাড়ার লোক এই প্রথম অন্তঃপুরবাসিনী জমিদারগৃহিণীকে দেখল। চোখদুটো বেলপাতা দিয়ে ঢেকে দিলেও তাঁর রূপ নাকি তখনও ঠিকরে পড়ছিল। ঝিদেরই কেউ নাকি 'মা, তোমার গৌরবর্ণ নীল হল কিসে' বলে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। 'কিসে' বলেছিল, না 'বিষে' বলেছিল—এ নিয়ে মতান্তর থাকলেও, এটা যে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার ব্যাপার তাতে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না।

এর কদিন পরই জমিদারবাবুরা শহরের পাট উঠিয়ে নিজতালুকে ফিরে গেলেন।

মরুনীদির কথাটা শেষ না করায় আধকপালে হয়ে আছে।

ঘটনাটা ঘটেছিল আমরা নওগাঁ থেকে চলে আসার বছর দশেক পর।

মা একদিন গিয়েছিলেন কালীঘাটে। ফিরে এসে দরজা দিয়ে ঢুকতে-ঢুকতেই মা চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'দেখে যা রে সবাই, সঙ্গে করে কাকে এনেছি।'

নীচে নেমে এসে দেখি, ছেঁড়া ময়লা শাড়ি পরে শুকনো চেহারার এক স্ত্রীলোক। সঙ্গে এণ্ডগণ্ডা। মা বললেন, 'চিনতে পারছিস নে—আমাদের মরুনী রে!'

আমাদের নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। যদি সত্যিই মরুনীদি হয়, তো এ কী চেহারা হয়েছে মরুনীদির।

মা পরে আমাদের বলেছিলেন। কালীঘাটের কাঙালিরা যে দিকটাতে ভিড় করে থাকে, সেখান থেকে হঠাৎ মাকে দেখতে পেয়ে মরুনীদি মার কাছে আসেন।

আমরা নওগাঁ থেকে চলে আসার পরই মরুনীদির স্বামী হঠাৎ একদিন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

অথদো স্বামীর হাতে বোনকে ছেড়ে দিতে ভাইরা একেবারেই রাজি ছিল না। মরুনীদিই নাকি জোর করে চলে আসেন।

তারপর আর কী? দুজনে বস্তিতে এসে ওঠে। স্বামী চেয়েচিন্তে যা পায় নেশা করে ওড়ায়। বছর-বছর ছেলে বিয়োনো আর তাদের অন্নের যোগাড় মরুনীদিকেই করতে হয়। ঘরে বসে সারাদিন ঠোঙা বানায়। এই করেই চলে।

সেই থেকে আমাদের বাড়িতে কাগজ জমিয়ে রাখা হত, মরুনীদি এসে এসে নিয়ে যেতেন। এলে ছেলেপুলে নিয়ে একবেলার খাওয়াটা মা-র কাছেই হত।

এইভাবে যেতে-যেতে এসে গেল পঞ্চাশের মন্বন্তর। বেশ কিছুদিন মরুনীদির খোঁজ নেই। অসুখবিসুখ করল না তো? মা ছুটলেন বস্তিতে খবর নিতে। মরুনীদি যে ঘরে থাকতেন, সেখানে গিয়ে মা দেখেন অন্য ভাড়াটে। ওরা নাকি মাসখানেকের ভাড়া বাকি পড়ার পর একদিন বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে।

মা কালীঘাটের হেন জায়গা নেই যেখানে ওদের খোঁজ করেন নি। এমন কি লজ্জার মাথা খেয়ে নিষিদ্ধ পাড়াতেও যেতে ছাড়েন নি।

মরুনীদিকে কে আবার ফুসলে নিয়ে চলে গেল? মৃত্যু, না জীবন?

সে প্রশ্নের আজও হদিশ পাই নি।

[ক্রমশ

'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য'

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

১

পুরীতে যখন 'বিদগ্ধমাধব' লেখা হচ্ছে তখন রূপ গোস্বামীর হাতে লেখা এই নাটকের একটি পাতা দেখে চৈতন্য 'মনে সুখী' হয়েছিলেন এবং রূপের 'অক্ষরের স্তুতি' করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে এই ঘটনার বিবরণ আছে।[১] ঘটনাটি সত্য বা কাল্পনিক বলা শক্ত। বিজয়দাস আখরিয়া চৈতন্যকে পুঁথি লিখে দিয়ে 'রত্নবাহু' উপাধি পেয়েছিলেন ('চৈতন্যভাগবত' ২.১৬., 'চৈতন্যচরিতামৃত' ১.১০.)। এই উপাধি আখরিয়ার লিপিসৌকুমার্যের পুরস্কার হলে বুঝতে হবে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরের দিকে চৈতন্যের আকর্ষণ ছিল। তাই ঘটনাটি সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। আবার, কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণ দেখে মনে হয় 'বিদগ্ধমাধব'-এর পুঁথিতেই রূপের হস্তাক্ষরের সঙ্গে চৈতন্যের প্রথম পরিচয়। কৃষ্ণদাসের সংবাদ ঠিক হলে বুঝতে হবে রামকেলিতে প্রথম সাক্ষাতের আগে রূপসনাতন চৈতন্যকে যে পত্রগুলি লিখেছিলেন[২] সেগুলি সনাতনের হস্তাক্ষরে লেখা। অন্যথায় ঘটনাটি অবশ্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজের উদ্ভাবন। রূপের হস্তাক্ষরের সঙ্গে কৃষ্ণদাসের পরিচয় ছিল। সম্ভবত তার সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ ছিলেন। তাই প্রসঙ্গ পেয়ে ঘটনাটি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। সত্য হক বা কাল্পনিক হক এই ঘটনাটিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানাতে চান রূপের হাতের লেখাটি ভালো ছিল। তিনি একথাও জানাতে চান চৈতন্য রূপের হস্তাক্ষরের প্রশংসা করেছিলেন।

মহাপ্রভু প্রশংসিত হয়েও রূপের হস্তাক্ষরের নিদর্শন রক্ষা পায় নি। শুধু রূপের কেন, জীবগোস্বামীর স্বহস্তলিখিত 'সঙ্কল্পপত্রী'[৩] এবং ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের পত্র (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চিত্রশালায় সংরক্ষিত) ছাড়া মধ্যযুগের কোনো লেখকের হস্তাক্ষরের নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে শুনি নি। 'ভক্তিরত্নাকর'-এর বিবরণ অনুসারে নীলাচল থেকে মহাপ্রভু রূপসনাতনকে একাধিক পত্রী পাঠিয়েছিলেন। সেগুলিও রক্ষা পায় নি।

সম্প্রতি বৃন্দাবনের রাধাদামোদর মন্দির থেকে কিছু পুঁথি ও দলিলপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলি এখন

বৃন্দাবন শোধসংস্থানের সম্পত্তি। পুঁথির উপর লিখিত নির্দেশ অনুসারে রাধাদামোদর থেকে সংগৃহীত পুঁথির কয়েকখানি রূপ গোস্বামীর স্বহস্তলিখিত। পুঁথির উপর লিখিত নির্দেশের নমুনা : 'শ্রীমদ্রূপ স্বহস্তলিখিতা নৃসিংহপরিচর্যা', আর একখানিতে 'শ্রীমদ্রূপগোস্বামী লিখিত জগন্নাথবল্লভ নাটক' ('বল্লব' অবশ্যই 'বল্লভ'-এর বিকৃতি)। আরও কয়েকখানি পুঁথির উপর একই হস্তাক্ষরে এই রকম নির্দেশ লেখা আছে। নির্দেশগুলি কার এবং কবেকার জানা নেই। যাঁরই লেখা হোক এবং যখনই লেখা হোক পরবর্তী কালের বলে নির্দেশগুলি অগ্রাহ্য করা যায়। কিন্তু যেহেতু পুঁথিগুলি রাধাদামোদরের তাই আশঙ্কা হয় নির্দেশগুলিকে অগ্রাহ্য করলে বুঝি দুর্লভ ঐতিহাসিক তথ্যকে উপেক্ষা করা হয়।

রাধাদামোদর ব্রজে চৈতন্য সম্প্রদায়ের পাঁচটি প্রধান দেবালয়ের একটি। রূপগোস্বামীর শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তিরোধানের আগে রূপ রাধাদামোদরেই থাকতেন। তাঁর ভজনকুটি ও সমাধিও এখানে। সুতরাং রূপের রচিত ও ব্যবহৃত ব্যক্তিগত পুঁথি ও কাগজপত্র রাধাদামোদরে থাকাই স্বাভাবিক। আকবর বাদশাহ্ রূপগোস্বামীর নামে দুশো বিঘে জমি দান করেছিলেন। তার ফরমান রাধাদামোদরের দলিলপত্রের মধ্য থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে।[৪] একাধিক দলিল থেকে জানা গেছে রাধাদামোদরে চৈতন্য সম্প্রদায়ের একটি পুঁথিশালা ('পুস্তক ঠোর') ছিল। এই পুঁথিশালার মূল্যবান পুঁথি ও দলিলপত্রের উল্লেখও কয়েকখানি দলিলে পাওয়া যায়। একখানি দলিলে বলা হয়েছে রূপসনাতন ও রঘুনাথদাস তাঁদের পুঁথি ও দলিলপত্র জীবগোস্বামীকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলি রাধাদামোদর পুঁথিশালার-ই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাধাদামোদর পুঁথিসংগ্রহের একটি তালিকাও করা হয়েছিল। সে তালিকাও রাধাদামোদর মন্দির থেকেই পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং রাধাদামোদর কেবলমাত্র চৈতন্যসম্প্রদায়ের দেবালয়-ই নয়, এটি মধ্যযুগের একটি পুঁথিশালা। এই পুঁথিশালার দুর্লভ পুঁথি সংগ্রহের প্রায় সব-ই লুপ্ত। সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা শোধসংস্থানে নিয়ে এসে রক্ষা করা হয়েছে। এই প্রাচীন পুঁথিশালার কোন্ পুঁথির পুষ্পিকায়, কোন্ চিঠির গায়, কোন্ দলিলের মধ্যে কী ঐতিহাসিক তথ্য লুকানো আছে তা সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধানের যোগ্য। কাগজের টুকরো বলে যা ফেলে দেওয়া হচ্ছিল কুড়িয়ে এনে পরীক্ষা করে দেখা গেল তা জীবগোস্বামীর নিজের হাতে লেখা 'সঙ্কল্পপত্রী'। এই রকম আর এক টুকরো কাগজে পাওয়া গেছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের হস্তাক্ষরে অন্ধ রঘুনাথদাসের অন্তিমকালে লেখা 'পত্র'।[৫] তাই রাধাদামোদরের কোনো পুঁথি মূল্যহীন নয়, কোনো লেখন উপেক্ষণীয় নয়। পুঁথির উপর লেখা নির্দেশগুলিও নয়। নির্দেশগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন, এগুলি প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য। এগুলির গ্রহণ-বর্জনের সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে এই প্রশ্নের উত্তরের উপর।

২

রাধাদামোদর থেকে সংগৃহীত বৃন্দাবন শোধসংস্থানের ৭৬৮৮ সংখ্যক পুঁথিখানির নাম 'বৈশাখমাহাত্ম্য', লিপিকাল ('স্বরশরশক্রে শার্কে'=) ১৪৫৭ শকাব্দ (=১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)। এই পুঁথির পুষ্পিকায়[৬] আছে '...ব্যলেখি রূপেণ'। পুষ্পিকার '...রূপেণ' যদি 'রূপগোস্বামী হন তাহলে 'বৈশাখমাহাত্ম্য'-র পুঁথি-ই রূপগোস্বামীর হস্তাক্ষরের নিদর্শন। 'বৈশাখমাহাত্ম্য'-র হস্তাক্ষরের অনুরূপ হস্তাক্ষরের লেখা আরও কয়েকখানি পুঁথির কয়েকটি পাতা পাওয়া গেছে। পুষ্পিকার অভাবে সব পাতাগুলির বিষয়ের নাম জানা যায় না। 'কর্ণামৃতস্তোত্রম্'[৭] 'ক্রমদীপিকা',[৮] 'মুকুন্দমালা'[৯] প্রভৃতি কয়েকখানির নাম জানা যায়।

রূপগোস্বামী যে লিপিকরও ছিলেন তার ইঙ্গিত পাই তিনটি সূত্র থেকে। প্রথম, পুঁথির উপর লিখিত নির্দেশ ('শ্রীমদ্রূপ স্বহস্তলিখিতা নৃসিংহপরিচর্যা' ইত্যাদি)। দ্বিতীয়, পুঁথির পুষ্পিকা ('বৈশাখমাহাত্ম্য'), তৃতীয়, হস্তাক্ষরের সাদৃশ্য ('কর্ণামৃতস্তোত্র' ইত্যাদি)। এই তিনটির প্রথমটি প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য কিনা তা বিচারসাপেক্ষ। তৃতীয়টি বড়ো প্রমাণ নয়। হস্তাক্ষরের সাদৃশ্যে লিপিকরের অভিজ্ঞতা অনুমান করা সহজ, প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। পুষ্পিকার প্রমাণ-ই একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু এই প্রমাণ সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হওয়া শক্ত। 'বৈশাখমাহাত্ম্য' রূপের রচনা নয়, অথচ পুষ্পিকায় 'ব্যলেখি রূপেণ' ব্যাপারটা সন্দেহজনক। যাঁর স্বরচিত সব রচনায় রচয়িতার নাম, রচনাকাল পাওয়া যায় না, তিনি অপরের রচনা নকল করে বহু আড়ম্বরে লিপিকাল ও লিপিকরের নাম ঘোষণা করেছেন একথা অভ্রান্ত প্রমাণাভাবে বিশ্বাস করা শক্ত। (রূপকবিরাজ নামে পরবর্তী কালে একজন বৃন্দাবনে প্রভাবশালী হয়ে ছিলেন সেকথা স্মরণীয়।) স্বতন্ত্রভাবে সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত এই তিনটি সূত্রের কোনোটিই নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়। এগুলির নির্ভরযোগ্যতা বিচার এই প্রবন্ধের বিষয়ও নয়। চতুর্থ আর একটি সূত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেই সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বিচার-ই এই প্রবন্ধের বিষয়।

৩

রাধাদামোদর থেকে বৃন্দাবন শোধসংস্থানের জন্য আর একখানি পুঁথি সংগ্রহ করা হয়েছিল। পুঁথিখানি কবিকর্ণপুরে বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' (সংক্ষেপে 'মহাকাব্য')। শোধসংস্থানে পুঁথিখানির ক্রমিক সংখ্যা ৭৬৮৬। 'মহাকাব্য'-র এই পুঁথিখানি এই প্রবন্ধে বৃন্দাবনের পুঁথি বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলা অক্ষরে লেখা এই পুঁথিখানির পত্রসংখ্যা ৪৫ (১৫ ও ২৬ সংখ্যক পত্রদুটি লুপ্ত)। পুঁথির সূচনায় 'শ্রীলচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ'। সমাপ্তিতে শ্লোকে[১০] এবং সংখ্যায় কালনির্দেশ। শ্লোকে ১৪৬৪ শকাব্দ, সংখ্যায় ১৪৬৭ শকাব্দ। যদি মনে করি প্রথমটি রচনাকাল আর দ্বিতীয়টি লিপিকাল তাহলে লিপিকাল আর রচনাকালের মধ্যে পার্থক্য মাত্র তিন বছরের। কালনির্দেশ ঠিক হলে বৃন্দাবনের এই পুঁথি সম্ভবত 'মহাকাব্য'-র প্রাচীনতম পুঁথি। প্রাচীনত্ব ছাড়াও আর একটি কারণে পুঁথিখানি অননুসাধারণ।

এই পুঁথিতে লিপিকরের নাম নেই। তবে পুঁথির প্রথম পাতায় নাগরী ও বাংলা অক্ষরে দুটি ছত্র লেখা আছে। নাগরীতে লেখা 'চৈতন্যাম্ত' এবং তার তলায় সংখ্যায় ২। বাংলায় লেখা 'শ্রীমদ্রূপগোস্বামী হস্তলিখিতং শ্রীচৈতন্যামৃতকাব্যং'। প্রথম পাতা সাদা হলেও সেটি পুঁথির অন্যান্য পাতা থেকে পৃথক নয়। তাতে বৃদ্ধি পাতাটি পুঁথির সমসাময়িক, পরবর্তী কালের যোজনা নয়।

নাগরী এবং বাংলা লেখা দুটি এক হাতের বা এক সময়ের নয়। পুঁথির পাতায় লেখাদুটির অবস্থান এবং কালির উজ্জ্বলতা-অনুজ্জ্বলতা দেখে মনে হয় নাগরী ছত্রটি বাংলার আগে লেখা। নাগরী লেখাটি পাতার ঠিক মাঝখানে। বাংলা লেখাটি খানিকটা জায়গা ছেড়ে নাগরীর উপরে। নাগরীতে আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল বলে বাংলা ছত্রটি লেখার সময় জায়গা ছাড়ার প্রয়োজন হয়েছিল। নাগরী লেখাটির কালি ঘনায় ঘনায় উঠে গিয়েছে। বাংলা লেখাটিতে কালির উজ্জ্বলতা অটুট আছে। একই সময় লেখা হলে দুটি কালির উজ্জ্বলতায় ইতরবিশেষ হত না।

নাগরী লেখাটি দেখে অনুমান করতে পারি পুঁথিখানি রাধাদামোদর পুঁথিশালার চৈতন্যচরিত পুঁথির একখানি। এই পুঁথির ক্রমিক সংখ্যা ২। তাতে বুঝি পুঁথিশালায় চৈতন্যচরিতের আরও পুঁথি ছিল এবং সেগুলিতে ক্রমিক সংখ্যা ছিল (যদিও ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত চৈতন্যচরিতের আর কোনো পুঁথি পাওয়া যায় নি)। রাধাদামোদর পুঁথিশালার তালিকা হয়েছিল ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। নাগরী লেখাটি তালিকার সমসাময়িক হতে বাধা নেই। তালিকার নাগরী হস্তাক্ষরের সঙ্গে পুঁথির উপর লিখিত নাগরী লেখাটির মিল এত স্পষ্ট যে দুটি লেখা একহাতের হওয়া অসম্ভব নয়।

বাংলা লেখাটির সময় অনুমান করা শক্ত। তবে নাগরীর পরে লেখা বলে এটি ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী। সম্ভদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এই লেখাটিতে অজ্ঞতনামা এক ব্যক্তি জানাচ্ছেন যে, বৃন্দাবনের এই পুঁথিখানি রূপগোস্বামীর নিজের হাতে লেখা। রূপগোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী এবং ভৃত্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোধানের পর রূপের হস্তাক্ষর শনাক্ত করার অধিকার কার ছিল জানি না। সংবাদদাতা সংবাদের উৎস জানান নি। তাই তাঁর সংবাদের সত্যাসত্য বিচারের পথ বন্ধ। তবে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এই সংবাদের সমর্থনে একজন সাক্ষী পাওয়া গেছে। সাক্ষী একজন লিপিকর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য'র একখানি পুঁথি আছে।[১১] সেই পুঁথির পুষ্পিকায় একটি

সংস্কৃত শ্লোকে সাক্ষী জানিয়েছেন যে, ১৪৬৭ শকাব্দে রূপগোস্বামী নিজের হাতে কবিকর্ণপূরের 'মহাকাব্য' লিখেছিলেন ('লিখিতং') অর্থাৎ নকল করেছিলেন। বৃন্দাবনের পুথিতে সংখ্যায় ১৪৬৭ শকাব্দ তারিখটি আছে। এই পুথির উপরই লেখা আছে 'শ্রীমদ্রূপগোস্বামী হস্তলিখিতং শ্রীচৈতন্যামৃতকাব্য'। সুতরাং বৃন্দাবনের এই পুথিই সাক্ষীর লক্ষ্য আর সাক্ষীর শ্লোকে অজ্ঞাত-নামা সংবাদদাতর সংবাদের সমর্থন। একের সংবাদ অন্যের সংবাদে সমর্থিত হলে সংবাদের সত্যতায় নিঃসংশয় হওয়া যায়। তাই পুথির উপর লিখিত নির্দেশ এবং নিরপেক্ষ সাক্ষ্যের সমর্থনে বৃন্দাবনের ৭৬৮৬ সংখ্যক 'মহাকাব্য'-র পুথির লিপিকর রূপগোস্বামী। কিন্তু পুথিতে লিপি-করের নাম নেই। তাই নিঃসংশয় হওয়ার আগে দুটি প্রশ্নের উত্তর জানা চাই। প্রথম, রূপগোস্বামী কবিকর্ণ-পূরের 'মহাকাব্য' নিজের হাতে নকল করেছিলেন কেন। যদি করেও থাকেন তাহলে ঢাকার পুথির পুষ্পিকার শ্লোকে সে সংবাদটি বহু আড়ম্বরে ঘোষণা করা হয়েছে কেন। এই দুটি প্রশ্নের উত্তর না পেলে সাক্ষী যত জোরালো আর নিরপেক্ষ হক ব্যাপারটা সন্দেহজনক থেকে যাবে।

৪

'বৈশাখমাহাত্ম্য', 'কর্ণামৃতস্তোত্র', 'মুকুন্দমালা' প্রভৃতির অংশবিশেষ রূপগোস্বামীর কোনো কোনো রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। যদি প্রমাণ হয় এগুলি রূপের স্বহস্তলিখিত তাহলে মনে করা যেতে পারে নিজের রচনায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রচনাগুলি নিজের হাতে নকল করার প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থকারই জানেন কোন্ রচনার কোন্ অংশ তাঁর প্রয়োজনীয়। তাই হয়ত নকলের কাজে অন্যের সাহায্য নেওয়া হয় নি। এই একই কারণে 'মহাকাব্য' নকলের ব্যাপারে অন্যের সাহায্য নেওয়ার অসুবিধে ছিল বলা যায় না। বরঞ্চ অন্যকে দিয়ে নকল করিয়ে নেওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

'মহাকাব্য'-র রচনাকাল এবং বৃন্দাবনের পুথির লিপিকালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুবই কম, এত কম যে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। রচনা গৌড়ে, লিপি বৃন্দাবনে। যদি মূলের নকল গৌড় থেকে বৃন্দাবনে পাঠানো হয়ে থাকে তাহলে রচনাকাল ও লিপিকালের মধ্যে অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছিল। গৌড়ের এক লিপিকর মূল 'মহাকাব্য'-র পুথি থেকে একটি নকল তৈরী করে-ছিলেন। নকল সমাপ্ত করতে তাঁর কীরকম তাড়া ছিল, আদৌ তাড়া ছিল কিনা জানি না। সেই নকল গৌড় থেকে বৃন্দাবন পৌঁছলে (পৌঁছতে কত সময় লেগেছিল জানি না) রূপগোস্বামী তার আর একটি নকল করেছিলেন। বিংশ সর্গের 'মহাকাব্য' নকল করতে রূপের কত সময় লেগেছিল জানি না। এই সব ব্যাপার তিন বছরের মধ্যে ঘটা অসম্ভব না হলেও ঘটনাগুলির পারম্পর্য অস্বাভাবিক দ্রুত। মনে হয়, গৌড়ে 'মহাকাব্য' লেখা হচ্ছে জেনে রূপ যেন তার নকলের জন্য বৃন্দাবনে অপেক্ষা করছিলেন। আর নকল পেয়ে হাতের সব কাজ ফেলে অস্বাভাবিক দ্রুততায় আর একটি নকল তৈরী করে ফেললেন। এই অস্বাভাবিক দ্রুততার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। চৈতন্যের জীবনীতে রূপগোস্বামীর কৌতূহল অবশ্যই ছিল। কিন্তু 'মহাকাব্য'-র যে নকল গৌড় থেকে বৃন্দাবনে এসেছিল সেটাই কি তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট ছিল না? যদি মনে করি 'মহাকাব্য'-র মূল পুথি বৃন্দাবনে পাঠানো হয়েছিল তাহলেও অন্যকে দিয়ে মূলের নকল করিয়ে নেওয়া-ই কি স্বাভাবিক ছিল না?

অনুমান করি ১৫৪১ থেকে ১৫৪৯ পর্যন্ত রূপ-গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি'-র রচনাকাল জানা যায় না। 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'-র রচনাকাল ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দ। এই দুখানি গ্রন্থ পরস্পরের পরিপূরক। তাই স্বভাবতই তাদের রচনাকালের ব্যবধান অল্প। অন্তত ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 'উৎকলিকাবল্লী'-র রচনা সমাপ্ত হওয়ার আগেই 'উজ্জ্বলনীলমণি'-র রচনা সমাপ্ত হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। সুতরাং 'মহাকাব্য'-র রচনাকাল (১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং বৃন্দাবনের পুথির লিপিকাল (১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) 'উজ্জ্বলনীলমণি'-র সমসাময়িক। সমগ্র ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম পুরাণের আধারে এক অভিনব রসশাস্ত্র সৃষ্টিতে যখন তিনি নিমগ্ন তখন রূপ-গোস্বামী 'মহাকাব্য'-র একটি নকল থেকে আর একটি নকল করছেন। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। রাধাকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের আত্মহত্যা করার মত বিস্ময়কর। অজ্ঞাতনামা এক সংবাদাতা এই বিস্ময়কর ব্যাপার আমা-দের বিশ্বাস করতে বলছেন। আর তাঁর সাক্ষী একজন লিপিকর তাঁর কথার সমর্থন করছেন। নিরপেক্ষ সাক্ষীর সমর্থন না থাকলে পুথির উপর লিখিত অজ্ঞাতনামা সংবাদদাতার বিস্ময়কর নির্দেশ অসম্ভব বলে অগ্রাহ্য করা যেত। সাক্ষীর জন্য তা করা যাচ্ছে না। সুতরাং নির্দেশের বিশ্বাসযোগ্যতার একমাত্র প্রমাণ সাক্ষীর নিরপেক্ষতা ও সাধুতা। তাই সাক্ষীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে তাঁর নিরপেক্ষতার ও সাধুতার বিচার হওয়া দরকার।

সাক্ষী বেশ জোরালো। এত জোরালো যে সাজানো বলে সন্দেহ হয়। সাজানো বা বানানো সাক্ষী দুর্লভ নয়; এখনও নয়, আগেও ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর লিপিকালযুক্ত পুথি কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্বহস্তলিখিত বলে দাবী করতে দেখা গেছে। তার উপর সিকিটা আধুলিটাও পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এই সাক্ষীর দাবীও সেরকম কিনা না জেনে 'মহাকাব্যে'-র পুথির উপর ফুল চন্দন দিতে পারি না।

যে শ্লোকটিতে সাক্ষী তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন সেটি তিনখানি পুথিতে পাওয়া গেছে। একখানি বৃন্দাবন শোধসংস্থানের অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুথি (ক্রমিক সংখ্যা ১১৪৭)। এই পুথিতে লিপিকাল বা লিপিকরের নাম নেই। দ্বিতীয়খানি মথুরার শোধ-পীঠ পুস্তকালয়ের[১১] পুথি (ক্রমিক সংখ্যা ৩৫৮০১০)। এই পুথির লিপিকরের নাম বলদেব। তিনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে (সম্বত ১৮৭৫) বাবাজী মহারাজের জন্য নাগরী অক্ষরে পুথিখানি লিখেছিলেন। তৃতীয় পুথি-খানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক্রমিক সংখ্যা ২৩৮৯)। এটি কার লেখা কবে লেখা জানা যায় না। এই পুথির বৈশিষ্ট্য এতে সংস্কৃত শ্লোকটির পরে গদ্যে শ্লোকের মর্মার্থ লেখা হয়েছে। গদ্য বাক্যটি অপর দুখানি পুথিতে পাওয়া যায় নি। আমার অনুসন্ধানে তিনখানি পুথিতে শ্লোকটি পাওয়া গিয়েছে, খোঁজ করলে অন্য পুথিতেও পাওয়া যেতে পারে। ঢাকার পুথি থেকে (অন্য পুথির সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে) শ্লোক ও গদ্যবাক্যটি উদ্ধৃত করছি। শ্লোকে অনেকগুলি ব্যাসকূট আছে। তিনখানি পুথির সাহায্য নিয়ে 'ব্যাসকূট'-র জট ছাড়ানো যায় নি। তাতে এ আলোচনার কোনো ক্ষতি হয় নি।

'চৈতন্যচন্দ্রো জগদুদ্দিধীর্ষুঃ
স্বপ্রেমরত্নং ব্রজসাগরোত্থং।
দীনায় দাতুম্ নিজরূপতো'সৌ
ঘূর্ণন ঘৃণী প্রাদুরভূৎ স্ববৃন্দৈঃ ॥ ১ ॥
অর্বাগজীবে প্রচুরকরুণৈঃ শ্রীলরূপাগ্রজাদ্যৈঃ
সংমোদান্ মৎ পরমগুরুভিঃ শ্রীলকাশীশ্বরাখ্যৈঃ।
মৎ পরমগুরুভিঃ শ্রীলকাশীশ্বরাখ্যৈঃ।
ভট্টাচার্যৈরপি চ পরমানন্দসংজ্ঞৈর্ব্রজেস্মিন্
শ্রুত্বা শ্রুত্বা মুদিতহৃদয়ৈঃ শশ্বদাস্বাদিতং যৎ ॥ ২ ॥
চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমদ্ভুতাভৈ ষ্ব্যষ্টাব্দিকৈ
র্বিরচিতং কবিকর্ণপূরৈঃ।
রূপাখ্যমৎপ্রভুবরৈঃ স্বকরাম্বুজেন শাকে
হয়র্তু ভুবনে লিখিতম্ পুরা যৎ ॥ ৩ ॥
আলোক্য সাম্প্রতমনেন কুমেধসাপি স্বপ্নে' পি
তদরতিম ঋতে মৃতকপ্রভেণ।
কেনাপি লুব্ধমনসা বত বিষ্ণুদাসনাম্না
স্বজীবনমহৌষধম্ আচিতম্ তৎ ॥ ৪ ॥
সংদানতকম্ ॥

ইদং কাব্যং শ্রীরূপগোস্বামিনা চতুর্দশশতপূর্বসপ্তষষ্ঠি-তমশকবর্ষে লিখিতং তদনন্তরং শ্রীবিষ্ণুদাসগোস্বামিনা।'

প্রথম শ্লোকে চৈতন্যের প্রশস্তি। অন্য শ্লোক-গুলি-ই এই আলোচনায় মূল্যবান। আক্ষরিক অনুবাদ না করে প্রয়োজনীয় কথাগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হচ্ছে। 'সনাতন, কাশীশ্বর, পরমানন্দ ভট্টাচার্য প্রমুখ আমার পরম গুরুবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে যা নিত্য শুনতেন; যে 'চৈতন্যচরিতামৃত' অসাধারণ প্রতিভাবান কবিকর্ণপূরের যোলো বছর বয়সের রচনা; যা আমার প্রভুবর রূপ ১৪৬৭ শকাব্দে নিজের পদ্মহস্তে লিখেছিলেন; বিষ্ণু-দাস নামে লোভী নির্বোধ একজন—তাতে স্বপ্নেও শ্রদ্ধা হারালে যে মৃতকল্প—সম্প্রতি দেখতে পেয়ে নিজের বাঁচবার মহৌষধরূপে তা সংগ্রহ করল।

এই কাব্য ১৪৬৭ শকাব্দে রূপগোস্বামী লিখেছিলেন তারপরে বিষ্ণুদাসগোস্বামী।'

৫

সাক্ষীকে জেরা করার আগে জানা চাই শ্লোক আর গদ্যের লেখক এক বা একাধিক। একাধিক হলে সাক্ষী

একজন নয়, দুজন। একই হক বা একাধিক-ই হক, সাক্ষীকে শনাক্ত করা প্রয়োজন।

শ্লোকটি বিষ্ণুদাসের রচনা। তার প্রমাণ শ্লোকে 'মৎ পরম গুরুভিঃ', 'মৎ প্রভুবরৈঃ' প্রভৃতি উত্তম পুরুষের সর্বনামের ব্যবহার আর নিজের সম্বন্ধে লেখকের প্রভূত বিনয় ও দৈন্য। তাছাড়া বিষ্ণুদাস নামটি বৈষ্ণব সমাজে এমন সম্মানিত বা প্রসিদ্ধ নয়[১০] যে, সেই নামের আড়ালে আত্মগোপন করে অজ্ঞাতনামা কোনো ব্যক্তি শ্লোকটি লিখবেন। সুতরাং বিষ্ণুদাসই শ্লোকটির লেখক এবং তিনিই অজ্ঞাতনামা নির্দেশদাতার সাক্ষী। সাক্ষীর নাম-ধাম পরিচয় জানলে সাক্ষ্যের গুরুত্ব বুঝি। শ্লোকে বিষ্ণুদাস যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না। সনাতন, কাশীশ্বর,[১১] পরমানন্দ ভট্টাচার্য[১২] প্রমুখ প্রাচীন বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুদাসের 'পরমগুরু' অর্থাৎ গুরুর গুরু। তিনজনের নাম একসঙ্গে উল্লেখ করায় বুঝতে পারি এঁদের কোনো একজন বিষ্ণুদাসের পরম গুরু নন, সমষ্টিগতভাবে এঁরা সকলেই পরম গুরুস্থানীয়। 'প্রভুবর' শব্দের সূত্রে কাউকে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। তবে বিষ্ণুদাসের কথা সত্য হলে তিনি অবশ্যই ব্রজবাসী এবং রূপগোস্বামীর ভৃত্য। রূপ-গোস্বামীর একজন ভৃত্যকে চিনি। তাঁর নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ। 'শ্রীরূপসেবাফলে...' তাঁর 'গোবিন্দলীলামৃত' লেখা হয়েছিল। রূপ তাঁর গুরু নন, গুরুস্থানীয়। সনাতন প্রমুখেরা পরম গুরুস্থানীয়। বিষ্ণুদাসের আত্ম-পরিচয় কৃষ্ণদাসের পক্ষে মেলানান নয়। বিষ্ণু-(কৃষ্ণ-) দাসের মিল শুধু নামে আর আত্মপরিচয়ে নয়। মিল আরও আছে, পরে তা দেখা যাবে।

শ্লোকটি বিষ্ণুদাসের হলেও গদ্য বাকাটি -তাঁর রচনা নয়। তার একাধিক প্রমাণ আছে। প্রথম, গদ্যবাকাটি শ্লোকের টীকা। টীকায় নোতুন সংবাদ নেই, আছে শ্লোকের সংবাদের পুনরুক্তি। একই ব্যক্তির লেখা হলে একই ভাষায় শ্লোকের সংবাদ গদ্যে পুনরুক্ত হত না। দ্বিতীয়, একই ব্যক্তি একই লিপিকাল গদ্যে একভাবে ('...চতুর্দশশত-পূর্বসংস্তম্বিষ্ঠতম শকবর্ষে...') শ্লোকে আর একভাবে ('...শাকে হয়র্তুভূবনে...') লিখতেন না। তৃতীয়, শ্লোকের লোভী, নির্বোধ বিষ্ণুদাস গদ্যে বিষ্ণুদাস-গোস্বামী। কোনো গোস্বামী (তখনকার কালে) নিজের রচনায় নিজের নামের পরে 'গোস্বামী' যুক্ত করতে পারতেন বলে বিশ্বাস হয় না। বিষ্ণুদাসের 'প্রভুবর' নিজের নামের আগে দৈন্যসূচক 'ক্ষুদ্র' শব্দটি ব্যবহার করতেন। জীবগোস্বামী নামের আগে 'লঘু' শব্দে দৈন্য প্রকাশ করতেন। চতুর্থ, যে তিনখানি পুথিতে বিষ্ণু-দাসের শ্লোকটি পাওয়া গেছে তার দুখানিতে (বৃন্দাবন শোধসংস্থান ও মথুরা শোধপীঠের পুথি) গদ্যবাকাটি নেই। তা থেকে একটি অনুমানই সম্ভব। যে পুথি থেকে এই তিনখানি পুথির উৎপত্তি সেই আদর্শ পুথিতে গদ্য বাকাটি ছিল না; থাকলে সেটি অন্য পুথি দুখানিতেও পাওয়া যেত। এই যুক্তিতে গদ্য বাকাটি ঢাকার পুথির লিপিকরের, বিষ্ণুদাসের নয়।

সাক্ষী তাহলে একজন নয়, দুজন। প্রথম সাক্ষী বিষ্ণুদাস। সত্যি হক মিথ্যে হক তাঁর কিছু পরিচয় জানি। দ্বিতীয় সাক্ষী পরিচয়হীন অজ্ঞাতনামা এক লিপিকর। তিনি সম্ভবত প্রথম সাক্ষীর শিষ্য। তাই গদ্যে গুরুর নামের পরে শ্রদ্ধাভরে 'গোস্বামী' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। শিষ্যের কাছে গুরুর কথা আপ্ত বাক্য। তাই গদ্যে শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি।

দ্বিতীয় সাক্ষীর বক্তব্যে নোতুন সংবাদ নেই। শ্লোকে বক্তব্য স্পষ্ট হয় নি আশঙ্কা করে শ্লোকের টীকা হিসেবে গদ্য বাকাটি হয়ত লেখার প্রয়োজন হয়েছিল। শ্লোকে স্পষ্ট বলা হয় নি বিষ্ণুদাসও মহাকাব্য নকল করে-ছিলেন। 'আচিতং' শব্দের অর্থ 'সংগ্রহ করা হয়েছে'। তা থেকে ধারণা হতে পারে 'মহাকাব্য'-র পুথিখানি হারিয়ে গিয়েছিল। বিষ্ণুদাস সেটি দেখতে পেয়ে ('আলোক্য') সংগ্রহ করেছিলেন। এই ধারণা দূর করতে দ্বিতীয় সাক্ষী গদ্য টীকায় বলেছেন, 'আচিতং' অর্থে 'লিখিতং' বুঝতে হবে। আদর্শ পুথিতে শ্লোকটি পেয়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল এটি আদর্শ পুথির লিপিকরের মন্তব্য। তাঁর ধারণা ঠিক। তার প্রমাণ আরও দুখানি পুথিতে শ্লোকটি পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং বিষ্ণুদাসের পুথি (অথবা তার কোনো নকল) বৃন্দাবন, মথুরা এবং ঢাকার পুথির আদর্শ। বিষ্ণুদাসের পুথি নিখোঁজ। সে পুথি কবে এবং কোথায় লেখা জানার উপায় নেই। অধস্তন তিনখানি পুথিতে উদ্ধৃত হয়ে বিষ্ণুদাসের শ্লোকটি রক্ষা পেয়েছে। ঢাকার পুথিতে শ্লোকের সঙ্গে

আবার গদ্যটীকাও পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধান করলে আরও কোনো কোনো পুথিতেও শ্লোকটি পাওয়া যেতে পারে। অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়াও অসম্ভব নয়। আপাতত প্রথম ও দ্বিতীয় সাক্ষীর পদ্য ও গদ্য ছাড়া বৃন্দাবনের পুথির উপর লিখিত নির্দেশের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের আর কোনো উপাদান হস্তগত হয় নি।

৬

গুরু-শিষ্যের পদ্য-গদ্য সাক্ষ্য তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। বিষ্ণুদাসের শ্লোকে অনেক সংবাদ পাই, অনেক সংবাদ পাই না। যে সংবাদ পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু পাই নি তা থেকে বিষ্ণুদাসের অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত পাই। দ্বিতীয় সাক্ষীর গদ্য টীকাটি সাধারণভাবে দেখলে মূল্যহীন, তাতে শুধু শ্লোকের সংবাদের পুনরুক্তি। অন্য দিক থেকে গদ্য টীকাটি মূল্যবান। তাতে শ্লোকের সব সংবাদ পুনরুক্ত হয় নি। কিছু পুনরুক্ত হয়েছে কিছু বর্জন করা হয়েছে। সংবাদের এই গ্রহণ-বর্জনের পদ্ধতি থেকে দ্বিতীয় সাক্ষীর অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত পাই। দুজন সাক্ষীর অভিপ্রায় এক। সেই অভিপ্রায়টি জানলে অনেক কিছু জানতে পারি।

বিষ্ণুদাস নামক লোকটির পেশা বা পরিচয় জানি না। শুধু জানি তিনি সংস্কৃতজ্ঞ। সংস্কৃতে তিনি কবিতা লিখতে পারেন। এমন কি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত পারি-ভাষিক শব্দ 'সংদানতকম্' তাঁর অপরিচিত নয়। অন্তত একখানি সংস্কৃত পুথি তিনি নকল করেছিলেন। বিষ্ণু-দাস পুথিতে লিপিকালের সন্ধান করেন এবং লিপি-কালের গুরুত্ব বোঝেন। যে যুগে পুথির লিপিকাল দূরে থাক রচনাকালও গুরুত্বহীন ছিল সে যুগের পক্ষে পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে এরকম আগ্রহ কিছুটা অস্বাভাবিক। রূপগোস্বামীর পুথির লিপিকালে বিষ্ণু-দাসের আগ্রহ সন্দেহজনক। সন্দেহ প্রবলতর হয় যখন দেখি 'মহাকাব্য'-র লিপিকাল নিয়ে যাঁর এত মাথাব্যথা তিনি 'মহাকাব্য'-র রচনাকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। সাধারণ বুদ্ধিতে জানি লিপিকালের চেয়ে রচনাকাল মূল্যবান। রচনাকাল একটি, লিপিকাল একাধিক। বিষ্ণুদাস সেই একক এবং অনন্য রচনাকালকে অগ্রাহ্য করে লিপিকাল নিয়ে অস্থির হয়ে উঠেছেন। এই অস্থিরতাও আবার সব পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে নয়।

'মহাকাব্য'-র যে পুথিখানি রূপগোস্বামীর নকল করা বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার লিপিকাল (১৪৬৭ শকাব্দ=১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) বৃন্দাবনের পুথিতে আছে, বিষ্ণুদাসের শ্লোকে আছে, দ্বিতীয় সাক্ষীর গদ্য টীকাতেও আছে। কিন্তু বিষ্ণুদাস 'মহাকাব্য'-র যে পুথি নকল করেছিলেন তার তারিখ শ্লোকেও নেই, গদ্যেও নেই। বিষ্ণুদাসের পুথিতেও অবশ্যই ছিল না, থাকলে 'তদনন্তরং' বলে এড়িয়ে না গিয়ে দ্বিতীয় সাক্ষী গদ্যে সেটি উদ্ধৃত করতেন। রূপের পুথির লিপিকাল (কত-দিন পর্যন্ত জানি না) যিনি মনে রেখেছেন তিনি নিজের পুথির লিপিকাল 'সাম্প্রতম্' শব্দের সাহায্যে গোজামিল দিয়েছেন। তা থেকে বুঝি বিষ্ণুদাসের কাছে হস্তাক্ষরের মাহাত্ম্যে রূপের হাতে লেখা পুথির লিপিকাল মূল্যবান। পুথির লিপিকালের গুরুত্ব সম্পর্কে এরকম লঘু-গুরু ভেদ সন্দেহজনক। বিশেষ করে রূপের পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে বিষ্ণুদাসের সতর্কতা অতি সতর্কতায় পৌঁছে গেছে। বিষ্ণুদাস যদি বলতেন, 'আমার প্রভুবর রূপ নিজের পদ্মহস্তে পুথিখানি লিখেছিলেন' তাহলে তাঁর কথার বিশ্বাসযোগ্যতা কমত না। সন্দিগ্ধরা বড়ো জোর জিজ্ঞাসা করত, লোকটি কে এবং খবরটি তিনি কোথা থেকে পেলেন। সন্দিগ্ধদের মুখ বন্ধ করে নিজের কথার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে গিয়ে ১৪৬৭ শকাব্দ তারিখটি বিষ্ণুদাস তাঁর শ্লোকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাতে সন্দিগ্ধদের সন্দেহ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্টমন্ত্র নয়, গুরুর নাম নয়, পুথির তারিখ—সে পুথিও আর একজনের লেখা—বিষ্ণুদাস মনে রেখেছেন এ বড়ো বিস্ময়ের কথা। তাতেই বিষ্ণুদাসের কথার সত্যতায় সংশয় হয়।

রূপ যাঁর 'প্রভুবর', রূপের পুথির লিপিকাল যিনি জানেন তিনি অবশ্যই ব্রজবাসী। ব্রজবাসী হয়েও তিনি খবর রাখেন এবং বিশ্বাস করেন 'মহাকাব্য' কবিকর্ণপুরের ষোলো বছর বয়সের রচনা।[১৩] কবিকর্ণপুরের জীবনের অধিকাংশ ঘটনা কিম্বদন্তীমূলক। তাঁর জন্ম, নাম, কবি-প্রতিভা সব নিয়েই কিম্বদন্তী। কিন্তু 'মহাকাব্য' যে কর্ণপুরের ষোলো বছর বয়সের রচনা সে কথা কিম্বদন্তীতেও নেই। ব্রজবাসী বিষ্ণুদাস কোন্ সূত্র থেকে এই সংবাদ পেয়েছেন জানি না। রূপ গোস্বামীর

আর কর্ণপুরের একান্ত সচিব না হলে বিষ্ণুদাসের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে, 'মহাকাব্য'-র রূপগোস্বামী-কৃত নকলের তারিখ ১৯৬৭ শকাব্দ এবং 'মহাকাব্য' রচনাকালে কবিকর্ণপুরের বয়স ছিল ষোলো। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার, কর্ণপুর ও তাঁর বয়স সংক্রান্ত বিষ্ণুদাসের যাবতীয় সংবাদ দ্বিতীয় সাক্ষী অগ্রাহ্য করেছেন। এমনকি কর্ণপুরের নামটাও তিনি বর্জন করেছেন। পুনরুক্তি এড়াবার জন্যই যদি বর্জন করা হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় সাক্ষী এমন একজন ব্যক্তি যাঁর কাছে গ্রন্থকারের চেয়ে লিপিকরের গুরুত্ব বেশি। তিনি পুনরুক্তি এড়াতে গ্রন্থকারের নাম বর্জন করেন কিন্তু লিপিকরের নামের ও লিপিকালের পুনরুক্তি করতে কুণ্ঠিত হন না।

কবিকর্ণপুরের বয়স ও গ্রন্থকর্তৃত্বে বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে গুরু-শিষ্যে বা প্রথম-দ্বিতীয় সাক্ষীতে প্রচণ্ড বিরোধ। এই বিরোধ সত্ত্বেও শ্লোক ও গদ্য-লেখকের মূল বক্তব্য এক। সে বক্তব্য হল ১৪৬৭ শকাব্দ লিপিকালযুক্ত 'মহাকাব্য'-র পুথিখানি রূপগোস্বামীর স্বহস্তলিখিত। এই একটি কথা বলার জন্য একটি 'সংদানতকম্', একটি গদ্যবাক্য, বহু অবান্তর প্রসঙ্গ। কিন্তু যে কথাটি বলার জন্য এত আড়ম্বর তা কি এমনই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা? পুথি নকল করা এমন কিছু কীর্তি নয় যা কাব্যের ভাষায় বর্ণনার যোগ্য। কাজটিকে কীর্তি বলে যাঁরা ঘোষণা করছেন সেই বিষ্ণুদাস এবং গদ্য-লেখকও সেই কাজটি করেছেন, আরও অনেকেও করে-ছেন। সেই একই কাজ যদি রূপগোস্বামীও করে থাকেন তাহলে তা নিয়ে এমন আহা মরি করার কারণ কী? কারণ অতিশয় স্পষ্ট।

৭

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র জন্য ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে রূপগোস্বামীর হস্তাক্ষর শ্রদ্ধার বস্তু। কারণ মহাপ্রভু স্বয়ং রূপের হস্তাক্ষরের প্রশংসা করে-ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের আগে রূপ বা অন্য কোনো গোস্বামীর হস্তাক্ষরের দিকে কেউ কখনও লক্ষ্য করেছেন বলে শুনিনি। তাঁরা কোন্ অক্ষরে লিখতেন—নাগরী বা বাংলা বা দুইই—কেউ জানে না, জানার প্রয়োজনও কেউ বোধ করে নি। শাস্ত্র ছেড়ে শাস্ত্রকারের হস্তাক্ষরের দিকে আকর্ষণ পরবর্তী কালের ব্যাপার। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ তার প্রথম সূচনা বটে; কিন্তু কৃষ্ণদাস প্রসঙ্গক্রমে ব্যাপারটা উল্লেখ করেছিলেন। রূপের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে তিনি যা জেনেছেন সেটাই কৃষ্ণদাস অন্যকে জানিয়েছেন। রূপের হস্তাক্ষরকে কাল্‌ট-এ পরিণত করা এবং তাকে অবলম্বন করে কোনো চক্রান্ত পাকিয়ে তোলা কৃষ্ণদাস কবিরাজের উদ্দেশ্য ছিল না।

বিষ্ণুদাসের শ্লোকেও রূপের হস্তাক্ষরের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। হস্তাক্ষরের মাহাত্ম্যেই রূপের স্বহস্তলিখিত পুথির লিপিকাল বিষ্ণুদাসের কাছে মূল্যবান। কিন্তু হস্তাক্ষরের মাহাত্ম্য ঘোষণাই বিষ্ণু-দাসের আসল উদ্দেশ্য নয়। হস্তাক্ষরের মাহাত্ম্যকে অবলম্বন করে বিষ্ণুদাস আর একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান এবং সেটাই আসল উদ্দেশ্য। এবিষয়ে কিছু-মাত্র সন্দেহ নেই যে, বিষ্ণুদাসের উদ্দেশ্য কবিকর্ণ-পুরের 'মহাকাব্য'-র অকৃত্রিমতা প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় রূপের হস্তাক্ষরের মাহাত্ম্যের সঙ্গে কবি-কর্ণপুরের 'মহাকাব্য'-র সংযোগ স্থাপন। যাঁর হস্তাক্ষরের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত তার হস্তাক্ষরে লেখা হলে 'মহাকাব্য'-র গৌরব বাড়ে, অকৃত্রিমতা সন্দেহাতীত হয়। এই অভিপ্রায়ে বিষ্ণুদাস ঘোষণা করেছেন রূপ-গোস্বামীর পবিত্র হস্তাক্ষরে 'মহাকাব্য' লেখা হয়েছিল। এই কারণে তাঁর কাছে 'মহাকাব্য'-র রচনাকাল অবান্তর, অন্য পুথির লিপিকালও অবান্তর। একমাত্র মূল্যবান রূপের স্বহস্তলিখিত পুথির লিপিকাল।

'মহাকাব্য'-র অকৃত্রিমতা (বা গৌরব বা দুই-ই) প্রমাণের জন্য বিষ্ণুদাস আরও একটি উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। এটির ইঙ্গিতও তিনি পেয়েছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে। বিষ্ণুদাস বলেছেন, তাঁর পরম-গুরুরা অর্থাৎ রূপসনাতন, কাশীশ্বর, পরমানন্দ প্রমুখ বৃন্দাবনের প্রাচীন বৈষ্ণবেরা কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য' মুখস্থ হয়ে শুনতেন। তা থেকে বুঝি 'মহাকাব্য' বৃন্দাবনে নিত্য পাঠ্য ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই রকম কথা বলেছেন। পার্থক্য শুধু গ্রন্থের আর শ্রোতার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' গোবিন্দ মন্দিরে নিত্য পড়া হত।[১৭] শ্রোতা ছিলেন গোবিন্দ মন্দিরের অধিকারী হরিদাস প্রমুখ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈষ্ণবেরা। বিষ্ণুদাস সময়ের ভুল করেছেন। তাই কৃষ্ণ-

দাসের বিবরণ অনুসরণ করলেও তাঁর বিবরণ বিশ্বাস-যোগ্য হয় নি। কৃষ্ণদাস যে যুগের কথা বলেছেন সে যুগ চৈতন্যের প্রত্যক্ষদর্শীর যুগ নয়। সে যুগের কোনো বৈষ্ণব চৈতন্যকে চোখে দেখেন নি। তাই চরিতগ্রন্থ থেকে চৈতন্যকে তাঁরা জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করতেন। বিষ্ণু-দাস বলছেন চৈতন্যের প্রত্যক্ষদর্শীর যুগের কথা, রূপ-সনাতনের যুগের কথা। সেযুগের প্রত্যেকেই চৈতন্যের প্রত্যক্ষদর্শী এবং অন্তরঙ্গ। সে যুগে বৃন্দাবনে সভা করে চৈতন্যচরিত পড়া হত না। পড়া হত ভাগবত, পড়তেন রঘুনাথভট্ট। এই রঘুনাথভট্ট সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস বলেছেন :

রূপগোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন॥
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ স্বরে বাষ্প না পারে পড়িতে॥
পিক স্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিনচারি রাগ॥

কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য' প্রাচীনতম চৈতন্যচরিত নয়, ষোলো আনা মৌলিকও নয়। চৈতন্যের সহপাঠী বন্ধু মুরারী গুপ্ত কড়চায় চৈতন্যচরিত লিখেছিলেন। কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য' তার অনুসরণে লেখা।[১৮] চৈতন্যের নীলাচল লীলার প্রত্যক্ষদর্শী স্বরূপদামোদর কড়চায় চৈতন্যের ভাবোন্মাদ অবস্থার কথা লিখেছিলেন। নীলাচল লীলার আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী রঘুনাথ গোস্বামী বৃন্দাবনের অনতিদূরে রাধাকুণ্ডে ছিলেন। এই সব প্রত্যক্ষদর্শী অন্তরঙ্গ অনুচরদের এবং তাঁদের রচনাকে উপেক্ষা করে বৃন্দাবনের প্রাচীন বৈষ্ণবেরা—যাঁরা কবিকর্ণপুরের চেয়ে চৈতন্যের বেশি অন্তরঙ্গ—'মহাকাব্য' নিয়ে মাতামাতি করতেন একথা অবিশ্বাস্য। 'মহাকাব্য'-র প্রাচীনত্ব ও অকৃত্রিমত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে বিষ্ণুদাস এই রকম কাল্পনিক কাহিনী সৃষ্টি করেছেন।

বিষ্ণুদাসের শ্লোক পড়ে শ্লোক রচনার উদ্দেশ্য জানি। আর জানি শ্লোকের বিষয়বস্তুর জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছে বিষ্ণুদাস ঋণী। 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে বিষ্ণুদাস জেনেছেন কৃষ্ণদাসের ব্যক্তিগত পরিচয়, রূপের হস্তাক্ষরের মাহাত্ম্য এবং বৃন্দাবনে 'চৈতন্যমঙ্গল' পাঠের সংবাদ। এই প্রসঙ্গগুলির কাল আর পাত্র পরি-বর্তন করে লেখা হয়েছে বিষ্ণুদাসের শ্লোকটি।

শ্লোকটি দেখে বিস্মিত হই। কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য' বিষয়গৌরবে অবশ্যই মাহাত্ম্যপূর্ণ, তার অকৃত্রিমতাও সংশয়াতীত। বিষ্ণুদাসের কাছে সেসব গৌণ। তিনি অন্য উপায়ে 'মহাকাব্য'-র অকৃত্রিমতা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী। তিনি বলতে চান, রূপ-সনাতন-কাশীশ্বর-পরমানন্দ প্রমুখেরা শুনতেন বলে কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য' অকৃত্রিম। তিনি দাবী করছেন, রূপগোস্বামী নিজের হাতে নকল করেছিলেন বলে 'মহাকাব্য' অকৃত্রিম। অন্যতম প্রাচীন চৈতন্যচরিত বলে যা জানি তার অকৃত্রিমতা বিষ্ণুদাস প্রমাণ করতে চান বৈষ্ণব সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের সুপারিশে। বিষ্ণু-দাসের শ্লোকটি এই সুপারিশের বিজ্ঞাপন। যদি জানি রূপসনাতন প্রমুখেরা এই চৈতন্যচরিতের নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন এবং রূপগোস্বামী নিজের হাতে এই গ্রন্থ নকল করেছিলেন তাহলে জানি এই গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি চরিত্র রূপসনাতনের অনু-মোদিত।[১৯] তাহলে জানি এই গ্রন্থে এমন কিছু নেই যা চৈতন্য সম্প্রদায়ের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের অননুমোদিত। সব বিজ্ঞাপনই উদ্দেশ্যমূলক। বিষ্ণুদাসের বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য 'মহাকাব্য'-র অকৃত্রিমতা প্রতিষ্ঠা।

বিষ্ণুদাসের শ্লোকের উদ্দেশ্য আর বৃন্দাবনের পুথির উপর লিখিত নির্দেশের উদ্দেশ্য অভিন্ন। উদ্দেশ্য অভিন্ন বলে শ্লোকের আর নির্দেশের লেখকও অভিন্ন বলে মনে করি। সেই যুক্তিতে বৃন্দাবনের পুথির নির্দেশদাতাও বিষ্ণুদাস। তিনি সাক্ষী নন, সাক্ষী বলে কেউ নেই। বিষ্ণুদাস-ই স্বনামে লিখেছেন শ্লোক আর নাম গোপন করে লিখেছেন নির্দেশ। কোনটি আগে কোনটি পরে বলা শক্ত। অনুমান করি প্রথমে লেখা হয়ে-ছিল নির্দেশ। পরে নির্দেশের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে লেখা হয়েছিল শ্লোক। শ্লোকটি রচনাকালে বৃন্দাবনের পুথি বিষ্ণুদাসের চোখের সামনে ছিল। তাই এই পুথির লিপিকাল তাঁর শ্লোকে যথাযথ উদ্ধৃত হয়েছে। বিষ্ণুদাস জানতেন তাঁর যাবতীয় কথা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে কিন্তু বৃন্দাবনের পুথির উপর লিখিত ১৪৬৭ শকাব্দ তারিখটি মিথ্যে নয়। তারিখটিকে তাই সযত্নে তিনি আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। সন্দিগ্ধদের

মুখ বন্ধ করতে এই তারিখটিই ছিল বিষ্ণুদাসের একমাত্র অবলম্বন।

৮

বৃন্দাবনের পুঁথি এবং এই পুঁথির ১৪৬৭ তারিখটিকে কেন্দ্র করে বিষ্ণুদাস যে একটি মিথ্যে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ষড়যন্ত্রকারী একাধিক ব্যক্তি। তবে বিষ্ণুদাস ছাড়া তাদের আর কাউকে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। এই ষড়যন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য (যদি ভুল না বুঝে থাকি) কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য'-র অকৃত্রিমতা প্রতিপাদন। যে গ্রন্থের রচনাকাল ষোড়শ শতকের চতুর্থ দশক (১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ) তার অকৃত্রিমতা প্রমাণের জন্য সপ্তদশ শতকের ষষ্ঠ দশকে অথবা আরও পরে বিষ্ণুদাসের এমন মাথাব্যথা কেন। যে রচনার অকৃত্রিমতা সন্দেহাতীত বিজ্ঞাপনের জোরে তার অকৃত্রিমতা প্রমাণের এমন আপ্রাণ চেষ্টা-ই বা কেন। বিষ্ণুদাসের ওকালতিতে 'মহাকাব্য'-র অকৃত্রিমতায় সংশয় জাগে। এবং এই কথাটা-ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে রচনার অকৃত্রিমতা এযুগে স্বতঃসিদ্ধ তা সপ্তদশ শতকে স্বতঃসিদ্ধ ছিল না।

'মহাকাব্য'-র কৃত্রিমতা-অকৃত্রিমতার কথায় অনেক কথা ওঠে। সেগুলি তলিয়ে দেখা দরকার। বৃন্দাবনে 'মহাকাব্য'-র পাঁচ-ছখানি পুঁথি আছে (সবগুলি অবশ্য পরীক্ষার সুযোগ হয় নি)। কলকাতায়, বরাহনগর পাঠবাড়িতে এবং অন্যত্র পুঁথি আছে। সুতরাং মুরারির 'মহাকাব্য'-র অবলম্বন যেমন দুখানি আধুনিক (এবং দুর্লক্ষ্য) পুঁথি কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য' তেমন নয়। কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য'-র অনেক পুঁথি। তবে কোনোটি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়, অধিকাংশগুলিই ঊনবিংশ শতাব্দীর। বিষ্ণুদাস বলছেন প্রাচীন পুঁথিও আছে। সে পুঁথির লিপিকাল ১৪৬৭ শকাব্দ (এবং তার লিপিকর রূপগোস্বামী)। বৃন্দাবনের পুঁথি সেই প্রাচীন পুঁথি। তার প্রমাণ পুঁথির উপর লিখিত নির্দেশ এবং পুষ্পিকার ১৪৬৭ শকাব্দ তারিখটি। সুতরাং বৃন্দাবনের এই পুঁথি-ই 'মহাকাব্য'-র প্রাচীনতা ও অকৃত্রিমতা প্রমাণের একমাত্র দলিল। এই দলিল কি সত্যি-ই প্রাচীন এবং অকৃত্রিম? পুঁথির পুষ্পিকায় দুটি তারিখ আছে। তারিখ দুটি পরীক্ষা করি।

বৃন্দাবনের পুঁথির পুষ্পিকা

১. শ্লোকে কালনির্দেশ : 'বেদা রসাশ্রুতয়ঃ...'
২. সর্গসমাপ্তি : 'ইতি...বিংশতিসর্গ সমাপ্তঃ[২০]
৩. গ্রন্থসমাপ্তি : 'সমাপ্তমিদং...কাব্যমিতি'[২১]
৪. সংখ্যায় কালনির্দেশ : 'শকাব্দাঃ ১৪৬৭ আষাঢ় কৃষ্ণ প্রতিপৎ'

ঢাকার পুঁথির পুষ্পিকা

১. 'বেদা রসাশ্রুতয়ঃ...'
২. 'ইতি...সমাপ্তঃ[২০]
৩. 'সমাপ্তমিদং...কাব্যমিতি'[২১]
৪. 'শকাব্দা ১৪৬৪ ॥ আষাঢ় কৃষ্ণ দ্বিতীয়া সোমবারে ॥'

বৃন্দাবনের আর ঢাকার পুঁথির পুষ্পিকায় বিষয় বিন্যাসের ক্রম এক। পার্থক্যের মধ্যে ঢাকার পুঁথিতে শ্লোকে আর সংখ্যায় একই শকাব্দ তাই দুটিই রচনাকাল। বৃন্দাবনের পুঁথিতে শ্লোকের আর সংখ্যার শকাব্দে মিল নেই তাই প্রথমটি রচনাকাল, দ্বিতীয়টি লিপিকাল। দুটি একই তারিখ হলে দুটিই রচনাকাল হত, যেমন হয়েছে ঢাকার পুঁথিতে। তবে শকাব্দের অমিল ছাড়া বৃন্দাবনের পুঁথির শ্লোকে আর সংখ্যায় যে মিল তা সন্দেহজনক। শ্লোকে আষাঢ়, সংখ্যায় আষাঢ় ; শ্লোকে কৃষ্ণপক্ষ, সংখ্যায় কৃষ্ণপক্ষ ; শ্লোকে দ্বিতীয়া, সংখ্যায় প্রতিপদ। সংখ্যায় বারের উল্লেখ নেই। তার কারণও দুর্লক্ষ্য নয়। 'প্রতিপৎ' লেখার পর পুঁথিতে ছত্র শেষ হয়েছে, বারের নাম লেখার জায়গা ছিল না। জায়গা থাকলে সম্ভবত সোমবার বাদ পড়ত না। দুটি তারিখে এত মিল, অথচ শকাব্দে অমিল। এই অমিলের কারণ জ্যোতিষী জানতে পারেন। আমি জ্যোতিষ জানি না। তথাপি বিশ্বাস করতে পারি না যে, ১৪৬৪ শকাব্দের আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার (মতান্তরে প্রতিপদের) সোমবার কালের পরিক্রমণের পথে ১৪৬৭ শকাব্দে আবার ফিরে এসেছিল। জ্যোতিষ ছেড়ে ঢাকার পুঁথির পুষ্পিকাকে আদর্শ ধরলে বলতে হয় বৃন্দাবনের পুঁথিতেও শ্লোকে ও সংখ্যায় রচনাকালের তারিখ-ই দেওয়া হয়েছে। তবে লিপিকরের গণনার ভুলে বা অসতর্কতায় ১৪৬৪ শকাব্দের পরিবর্তে সংখ্যায় ১৪৬৭ লেখা হয়েছে।[২২] এই অনুমান ঠিক হলে বৃন্দাবনের

পুঁথির দুটি তারিখ-ই রচনাকাল, এই পুঁথিতে লিপিকাল নেই (যেমন নেই ঢাকার পুঁথিতে)। বৃন্দাবনের পুঁথির লিপিকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হতে কোনো বাধা নেই। আমার অনুমানে সেটাই পুঁথির লিপিকাল। কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য'-র তাহলে কোনো প্রাচীন পুঁথি নেই। তাতেও সন্দেহ করার কিছু নেই। অনেক প্রাচীন রচনা আধুনিক পুঁথিতেই পাওয়া গেছে। তবে অর্বাচীনকে প্রাচীন বলে চালাবার চেষ্টাই সন্দেহজনক। বিষ্ণুদাস এই রকম সন্দেহজনক কাজ করেছেন। সন্দেহের আরও কারণ আছে। প্রাচীন পুঁথির অভাব তার একটি কারণ। অন্য কারণ হল অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোনো রচনায় 'মহাকাব্য'-র উল্লেখ নেই। সবচেয়ে বড়ো কারণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র কোনো কোনো অংশ 'মহাকাব্য'-র আক্ষরিক অনুবাদ (অথবা 'মহাকাব্য'-র কোনো কোনো অংশ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র অনুবাদ) অথচ কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'মহাকাব্য'-র উল্লেখ করেন নি। 'মহাকাব্য'-র কৃত্রিমতার পক্ষে এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর নেই, বিশেষ করে শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্রকে (যাঁকে 'মহাকাব্য'-র গ্রন্থকার বলে দাবী করা হয়েছে) যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজই সর্বপ্রথম কবিকর্ণপুর বলে শনাক্ত করেন।[১৯]

৯

বিমানবিহারী মজুমদারের ধারণা, সাম্প্রদায়িক স্বার্থে কবিকর্ণপুরের গ্রন্থাবলী চাপা দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বলতে বিমানবাবু কী বুঝেছিলেন জানি না। সম্প্রদায়ের কে বা কারা কী উপায়ে কবিকর্ণপুরের গ্রন্থগুলি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বিমানবাবু তা খুলে বলেন নি। কবিকর্ণপুরে সংক্রান্ত গল্পগুলির সংখ্যা ও জনপ্রিয়তার কথা বিবেচনা করলে বিমানবাবুর কথার বিপরীতটাই সত্য মনে হয়। রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'-তে কবিতা সংকলিত হওয়া কবিকর্ণপুরের কবিপ্রতিভার চূড়ান্ত স্বীকৃতি। স্বয়ং মহাপ্রভু যাঁকে 'কবিকর্ণপুর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন তাঁর গ্রন্থাবলীর অমর্যাদা করার শক্তি কার ছিল জানতে কৌতূহল হয়।

বিমানবাবুর যুক্তি দেখি। তাঁর একটি অভিযোগ কবিকর্ণপুর ষড়গোস্বামীর মধ্যে গণ্য হন নি। বিমানবাবু অবশ্যই জানেন ষড়গোস্বামী কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম নয়, চৈতন্য সম্প্রদায়ের 'ক্যাবিনেট'ও নয়। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে বা শাস্ত্রগ্রন্থ লিখে ষড়গোস্বামী পদে 'প্রমোশন' পাওয়া যায় না। বিমানবাবু একথাও অবশ্যই জানেন, ষড়গোস্বামী প্রয়োগটা আধুনিক। তার পারিভাষিক প্রয়োগ আরও আধুনিক। সুতরাং সাম্প্রদায়িক চক্রান্তে কবিকর্ণপুর ষড়গোস্বামীর মধ্যে গণ্য হন নি এটা ছেলেমানুষী অভিযোগ।

বিমানবাবুর দ্বিতীয় অভিযোগ গুরুতর। তাঁর বক্তব্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র অংশবিশেষ কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য'-র আক্ষরিক অনুবাদ। বিমানবাবু বলতে চান ঋণ স্বীকার না করে কৃষ্ণদাস এত বিষয় 'মহাকাব্য' থেকে নিয়েছেন যে, সেযুগে 'কপিরাইট' আইন থাকলে কৃষ্ণদাসের শাস্তি হত। বিমানবাবুর অভিযোগ সত্য হলে বৃদ্ধ জরাতুর, সত্যনিষ্ঠ, ভক্তিপরায়ণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন হন। প্রমাণ হয়, কৃষ্ণদাস অন্যের জিনিষ নিজের নামে চালিয়েছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিরুদ্ধে বিমানবাবুর অভিযোগে দীর্ঘকাল ধরে অশ্রদ্ধা বোধ করছি। কৃষ্ণদাস এযুগের অনেক গবেষকের চেয়ে সাধু এবং সতর্ক। তাঁর গ্রন্থে পাদটীকা নেই বটে তবে যেখান থেকে যে তথ্য তিনি পেয়েছেন অবিলম্বে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করে। ঋণ স্বীকৃতিতে যাঁর এমন সতর্কতা বিমানবাবুর কাছে অসাধুতার অপরাধে তিনি অভিযুক্ত।

ইতিহাসে অনুসন্ধিৎসু হয়েও অনেক কিছু বিমানবাবুর কাছে স্বতঃসিদ্ধ। কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য'-র অকৃত্রিমতা তাঁর কাছে এই রকম একটি স্বতঃসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধের নিকষে যাচাই করে বিমানবাবু জানিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য' থেকে বস্তু আহরণ করেছেন ঋণ স্বীকার না করে। যার নাম চুরি। বিমানবাবু জানতেন না এযুগে যেটিকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ মনে করেছিলেন সপ্তদশ শতকেও সেটি স্বতঃসিদ্ধ ছিল না। তিনি জানতেন না তাঁর স্বতঃসিদ্ধ অসিদ্ধ, নিকষ মেকি। কোন্ যুক্তিতে বলি কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিকর্ণপুরের 'মহাকাব্য'-র কাছে ঋণী? কৃষ্ণদাস কবিকর্ণপুরের

নামধাম পরিচয় সবই জানতেন। কবিকর্ণপূরের খাঁটি পরিচয় যেটুকু তা কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছ থেকেই পেয়েছি। অন্যের কাছ থেকে পেয়েছি কিম্বদন্তী। কৃষ্ণদাস জানতেন কবিকর্ণপূর 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামে একখানি নাটক লিখেছিলেন। কৃষ্ণদাস সে নাটকের নামোল্লেখও করেছেন তা থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। অথচ কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র আসল বা প্রক্ষিপ্ত পাঠের কোনো একটি জায়গায়ও 'মহাকাব্য'-র নাম নেই। যিনি দুখানি চৈতন্যচরিত লিখেছিলেন—একখানি মহাকাব্যে আর একখানি নাটকে—তাঁর একখানির উল্লেখ কৃষ্ণদাস কবিরাজ একাধিকবার করেছেন, আর একখানি সম্পর্কে তিনি নীরব। এই নীরবতার কারণ কী। বিমানবাবু তা জানেন না বা জানতে চান না। জানতে গেলে তাঁর স্বতঃসিদ্ধে সংশয় দেখা দেয়। এই স্বতঃসিদ্ধ তাঁর কাছে 'স্যাক্রোস্যাঙ্কট'। কৃষ্ণদাসকে অভিযুক্ত না করে অনুসন্ধান করলে বিমানবাবু জানতে পারতেন অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে কবিকর্ণপূরের 'মহাকাব্য'-র অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল।[20] কেবলমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছে নয়, সকলের কাছেই। অষ্টাদশ শতকে যে রচনার অস্তিত্ব প্রথম জানা গেল কী উপায়ে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই রচনা থেকে বস্তু আহরণ করে গ্রন্থকারের কাছে ঋণ স্বীকার করেন! ইতিহাস যদি মানি তাহলে মানতে হয় কৃষ্ণদাস 'মহাকাব্য'-র কাছে ঋণী নন। 'মহাকাব্য' কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র কাছে ঋণী। এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাশেষি মুরারী গুপ্ত আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতের আধারে বিষ্ণুদাস গোস্বামী প্রমুখেরা কবিকর্ণপূরের নামের আড়ালে আত্মগোপন করে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' নামক গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। রচয়িতা (বা রচয়িতারা) কবি শশাঙ্কের 'ফরমুলা'য় ফেলে 'মহাকাব্য'-কে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বলে চালিয়েছিলেন। তার ফলে কেউ বলেন 'মহাকাব্য' কবিকর্ণপূরের ষোলো বছর বয়সের রচনা। কেউ বলেন,

সপ্ত বৎসরের যবে কাব্য বলিলেন তবে
তার নাম চৈতন্যচরিত।

আসলে 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য' কবিকর্ণপূরের রচনা নয়। এর রচনাকালও ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ নয়। 'মহাকাব্য'-র রচয়িতা অজ্ঞাত, রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর সপ্তম বা অষ্টম দশক। অনুমান করি 'মহাকাব্য'-র রচয়িতা তাঁরা-ই যাঁরা লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর আধারে মুরারী গুপ্তের 'কড়চা'-কে মহাকাব্যের ফ্রেমে বাঁধিয়েছিলেন।[24]

পাদটীকা

১ 'একদিন রূপ করেন নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন॥
কাঁহা পুথি লিখ বলি এক পত্র নিল।
অক্ষর দেখিঞা প্রভু মনে সুখী হৈল॥
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীতি হৈঞা প্রভু করে অক্ষরের স্তুতি॥'
'চৈতন্যচরিতামৃত',

২ 'শুনি মহাপ্রভু কহে শুন রূপ দবীরখাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বারবার।
'চৈতন্যচরিতামৃত',

৩ দ্র. *An early testamentary document in Sanskrit*, Vrindaban, 1979.

৪ এই ফরমান এবং আরও অনেক দলিলপত্র বৃন্দাবন শোধসংস্থানে সংরক্ষিত আছে। এই সব দলিলপত্রের সাধারণ পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য 'Manuscripts and documents in the Gaudiya temples of Vrindaban and Rajasthan', *Bulletin of the International Association of Vrindaban Research Institute*, Vol. VIII, 9-17, 1980.

৫ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৮৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩২-৩৪।

৬ পুষ্পিকাটি এই : 'ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদঃ : পঞ্চনবতিতমোধ্যায়ঃ : ॥ [১২] ॥ সমাপ্তমিদং বৈশাখমাহাত্ম্যং॥ শ্রীমধুসূদনায় নমঃ ॥ স্বরশরশক্রে শাকে মাসি তপস্যে তথাঙ্গি তপনস্য। মাধবমাহাত্ম্যমিদং সুন্দররূপং ব্যালেখিরূপেণ ॥ শ্রীগোবর্ধনধরায় নমঃ ॥ শ্রীগোপালচরণায় নমঃ ॥ শ্রীহরায় নমঃ ॥' এই পুথিতে আছে 'পদ্মপুরাণ'-এর পাতালখণ্ডের ৮৪-৯৫ অধ্যায়। প্রতি অধ্যায়ের শেষে ক্রমিক সংখ্যা ১, ২, ৩ ইত্যাদি দিয়ে অধ্যায় সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে।

৭ শ্লোকসংখ্যা ১১২। পুথির আরম্ভে 'নমঃ কৃষ্ণায়', শেষে 'ইতি শ্রীলীলাশুকবিল্বমঙ্গলবিরচিতং কর্ণামৃতস্তোত্রং সমাপ্তং'।

৮ শ্লোকসংখ্যা ৩৬। আরম্ভে 'নমঃ কৃষ্ণায়', শেষে 'ইতি ক্রমদীপিকোক্তং শ্রীগোপালধ্যানং'।

৯ শেষ এগারটি শ্লোক পাওয়া গেছে। পুষ্পিকা : ইতি মহারাজ শ্রীকুলশেখরকৃতামুকুন্দমালাসমাপ্তা'। পরে এই পাতাতেই 'নমঃ কৃষ্ণায়'-র পর যে রচনাটি আরম্ভ হয়েছিল তার পুষ্পিকাহীন ৩৮টি শ্লোক রক্ষা পেয়েছে।

১০ শ্লোকটি এই : বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি বারে সুধাকিরণ নাম্ন্যাসিতদ্বিতীয়াতিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য ॥

১১ এই পুথির সংবাদ প্রথম জানি সুশীলকুমার দে-র *Early History of the Vaisnava faith and movement in Bengal*, Calcutta, 1961, 163, নামক বই থেকে। পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান গোটা পুথিখানির ছবি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। সেজন্য আনিসুজ্জামানের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ঢাকার পুথিখানি হাতের কাছে না পেলে এই প্রবন্ধটি লেখা হতে পারত না।

১২ শ্রীযুক্ত শ্রীবৎস গোস্বামীর সহযোগিতায় এই পুথিখানি পরীক্ষা করে নোট নিতে পেরেছিলাম।

১৩ হরিদাস দাস চৈতন্য সম্প্রদায়ের নয়জন বিষ্ণুদাসকে শনাক্ত করেছেন। দ্র. 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন', ৪৬৫ গৌরাব্দ, ১৩৫। শ্লোক লেখক বিষ্ণুদাস এই নয়জনের একজন অথবা অতিরিক্ত আর একজন সে সম্বন্ধে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

১৪ সনাতনের 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী'-র বন্দনা শ্লোকে কাশীশ্বরকে 'বৃন্দাবনপ্রিয়' এবং 'গোবিন্দপদাশ্রিত' বলে বিশেষিত করা হয়েছে ('বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্ শ্রীমৎকাশীশ্বরং')।

১৫ পরমানন্দ ভট্টাচার্যকে সনাতন 'রসোজ্জ্বল' বলেছেন ('বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্যং রসোজ্জ্বলং')।

১৬ কবিকর্ণপূরের বয়সের এই ইঙ্গিতও 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে পাওয়া। কবিকর্ণপূরের জন্মকাল অজ্ঞাত। তবে তাঁর জন্ম সম্পর্কে একাধিক গল্প প্রচলিত আছে। সেগুলির মূলে আছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রদত্ত বিবরণ। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'-র ভূমিকায় মৃণালকান্তি ঘোষ জানিয়েছেন, 'পরমানন্দের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন রথযাত্রা উপলক্ষে' শিবানন্দ সপরিবারে গৌড়ের ভক্তদের নিয়ে নীলাচলে গিয়েছিলেন। এ সংবাদ সত্য হলেও এর সঙ্গে একথাও বলা দরকার যে সাত বছর বয়সের আগেও শিবানন্দের কনিষ্ট পুত্র পরমানন্দ নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুকে দর্শন করেছিলেন। গৌড়ের ভক্তদের নিয়ে প্রতি বছরই শিবানন্দ নীলাচলে যেতেন। (দ্র. 'বিদায় সময় প্রভু কহিলা সভারে। প্রত্যাব্দ আসিবে সভে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥ প্রভু আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যাব্দ আসিঞা। গোসাঞে মিলিঞা যান গুণ্ডিচা দেখিঞা ॥' চৈ. চ. ২/১ ; 'গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যাব্দ আসিঞা। পুন গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিঞা॥' চৈ. চ. ৩/২।) কৃষ্ণদাস কবিরাজ কয়েকবারের বিবরণ দিয়েছেন। এর মধ্যে দুবার শিবানন্দ তাঁর ছেলেদের পুরীতে এনেছিলেন। একবার তিন ছেলেকে এনেছিলেন। সেবার মহাপ্রভু শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম জানতে চেয়েছিলেন। (কারণ, 'পূর্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা। তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিল ॥ এবার তোমার যেই হইবে কুমার। পুরীদাস বলি নাম ধরিও তাহার ॥') দ্বিতীয়বার শিবানন্দের সঙ্গে 'পুরীদাস' যখন নীলাচলে এলেন তখন তাঁর বয়স সাত বছর। কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিয়েছেন 'সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন' তথাপি চৈতন্যের কৃপায় সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি (বা রচনা) করে তিনি সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর 'ভাবোন্মাদ-প্রলাপ', 'সমুদ্রপতন', 'বিরহপ্রলাপ' বর্ণনার পর 'চৈতন্যচরিতামৃত' সমাপ্ত। তাই অনুমান হয় চৈতন্যের জীবিতকালে শেষবার গৌড়ের ভক্তেরা যখন নীলাচলে এসেছিলেন তখন 'পুরীদাস'ও এসেছিলেন। রথযাত্রার পর গৌড়ের ভক্তরা বিদায় নিলে মহাপ্রভুর দেহাবসান হয়। সুতরাং মহাপ্রভুর অন্তর্ধানকালে অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপূরের বয়স সাত। (এই হিসেবে তাঁর জন্ম ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে)। এবং ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স ১৬। 'কবিকর্ণপূর' উপাধি যে চৈতন্যের দেওয়া সেকথা জানিয়েছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'-র টীকায় : 'ততঃ সন্তুষ্টেন ভগবতা কবিকর্ণপূর ইতি নাম তদ্দিনমারভ্য কৃতবতা।'

১৭ 'নিরন্তর তিহোঁ [হরিদাস] শুনেন চৈতন্যমঙ্গল। তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল ॥' চৈতন্যচরিতামৃত, ১।৮

১৮ 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য'

১৯ 'মহাকাব্য'-র সপ্তদশ সর্গের ১২ শ্লোকটি রূপসনাতন বা অন্য কেউ অনুমোদন করতেন কিনা সন্দেহ। 'অয়মেষ নীলগিরি মৌলিচন্দ্রমাঃ পুরতঃ সমেত্য কুরুত স্তবং ন কিম।' শ্লোকটি আবার চৈতন্যের উক্তি। তাতে আরও সন্দেহ হয়। প্রায় এই রকম কথা বলার জন্য কোনো এক বঙ্গদেশীয় বিপ্রের চৈতন্যনাটক স্বরূপগোস্বামী অনুমোদন করেন নি। তাছাড়া 'মহাকাব্য'-র সপ্তদশ সর্গে রূপসনাতন সম্পর্কে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণদাস প্রদত্ত সংবাদের সঙ্গে তার মিল নেই। 'মহাকাব্য' অনুসারে রূপসনাতন এবং অনুপম তিন ভাই একসঙ্গে নীলাচলে চৈতন্য দর্শনে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাসের বিবরণ অন্য রকম। কৃষ্ণদাস জানিয়েছেন প্রয়াগ থেকে ফিরে অনুপম মারা যান, তাতে নীলাচলে পৌঁছতে রূপের কিছু বিলম্ব হয়। সনাতন নীলাচলে পৌঁছন সব শেষে। তাঁকে চৈতন্যই অনুপমের সংবাদ দেন। যদি বিশ্বাস করি রূপ 'মহাকাব্য'-র পুথি নকল করেছিলেন তাহলে বিশ্বাস করতে হয় রূপ এই বেঠিক সংবাদ অনুমোদন করেছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রশংসা শুনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। আবার, যদি মনে করি 'মহাকাব্য' অকৃত্রিম এবং কৃষ্ণদাসের পূর্ববর্তী তাহলে স্বীকার করতে হয় চৈতন্যের স্নেহধন্য এবং কৃষ্ণদাসের পূর্ববর্তী চরিতকারের সংবাদ তিনি অগ্রাহ্য করেছেন।

২০ 'ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে বিংশতিসর্গ সমাপ্তঃ'।

২১ 'সমাপ্তমিদং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতকাব্যমিতি'। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মুরারী গুপ্তের 'মহাকাব্য'-র নামও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য'। কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যচরিতামৃত', কখনও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য...' নয়।

২২ মথুরা শোধপীঠের এবং বৃন্দাবন শোধসংস্থানের ২৯১০ সংখ্যক পুথির পুষ্পিকা উদ্ধৃত করি

মথুরা শোধপীঠের পুথি।

'শকাব্দাঃ ১৪৬৭ ॥ মাঘ কৃষ্ণ প্রতিপদি ॥ লিখিতং বলদেবেন পুস্তকং শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজকী ॥ ইতি সংবত ১৮৭৫ ॥ কার্তিক শুক্লা ২ সমাপ্তম্ ॥

বৃন্দাবনের ২৯১০ সংখক পুথি।

'শকাব্দা : ১৪৬৭ মাঘ কৃষ্ণ প্রতিপদ আদর্শস্য অস্য সন ১২৫৮ সন ১২ কার্তিক ॥ সাং শ্রীধাম বৃন্দাবন ॥

১৮১৮ এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে নকল করা এই পুথি দুখানির একখানি আর একখানির নকল। সুতরাং বৃন্দাবন (২৯১০) পুথির ১৪৬৭ শকাব্দ, মাঘ কৃষ্ণ প্রতিপদি মথুরার পুথি থেকে নকল করা। কিন্তু মথুরার পুথিতে এই তারিখটি এল কোথা থেকে? এই পুথিতে বিষ্ণুদাসের শ্লোকটি আছে। সুতরাং মনে করা যায় ১৪৬৭ লিপিকার বিষ্ণুদাসের শ্লোক থেকে পেয়েছেন, মাস পক্ষ তাঁর নিজস্ব সংযোজন। তাহলেও প্রশ্ন, শ্লোক থেকে লব্ধ ১৪৬৪ শকাব্দটি এই লিপিকর অগ্রাহ্য করেছেন কেন? তার উত্তর আমি জানি না।

২৩ লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের কথা কেউ কেউ তুলতে পারেন। পুথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনি তবে লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের মুদ্রিত সংস্করণে 'মহাকাব্য'-র একটি উদ্ধৃতি আছে। লোচনের এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যচরিত যে সংস্কৃত উদ্ধৃতি এবং পুষ্পিকা সহযোগে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর আদর্শে পাঠ্য কাব্যে রূপান্তরিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। লোচনের চৈতন্যচরিতের পুথিতে যদি 'মহাকাব্য'-র উদ্ধৃতি থাকে তাহলে তা পরবর্তীকালের যোজনা মনে করতে হবে।

২৪ বিংশ সর্গের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে 'মহাকাব্য' শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্রের রচনা। রচয়িতা হিসেবে 'মহাকাব্য'-এ কবিকর্ণপুরের নাম নেই। 'আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু'-তে পিতার নাম নেই উল্লেখ আছে আর আছে গুরুর নাম এবং কবির উপাধি।

'চৈতন্যকৃষ্ণকরুণোদিতবাগ্বিভূতিস্তন্নামতজ্জীবনধনস্য জনস্য পুত্রঃ।
শ্রীনাথপাদকমলস্মৃতিশুদ্ধবুদ্ধিশ্চমিমাং রচিতবান্ কবিকর্ণপুরঃ ॥

এখানে কবি বলেন নি তিনি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। আত্মপরিচয়ে পিতার নামই যথেষ্ট, 'কনিষ্ঠ' বা 'জ্যেষ্ঠ' শব্দগুলি বাহুল্য। 'মহাকাব্য'-র কবির পরিচয়ে 'কনিষ্ঠ' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। এই নবলব্ধ সংবাদ সম্ভবত 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকেই শ্লোক লেখক সংগ্রহ করেছিলেন।

কবিকর্ণপুরের জীবন ও রচনা নিয়ে বহু সমস্যা আছে। সেগুলির সমাধানের উপায় কবিকর্ণপুরের রচনা পুথিগুলির পুনঃপরীক্ষা। গল্পের উপর নির্ভর না করে পুথি থেকে লব্ধ সংবাদের উপর নির্ভর করলে সমাধান সহজ হয়। 'মহাকাব্য'-র পুথি থেকে লব্ধ নূতন বা অজ্ঞাত সংবাদ জানবার জন্য কৌতূহলী আছি।

"হিন্দুসংগীত কোনো একটিমাত্র জাতির দান নহে"

বেদোত্তর সংগীত—ক্ষিতিমোহন সেন। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। ১৯৮৪। পঁচিশ টাকা।

ভূমিকা, বেদোত্তর সংগীত, মার্গ ও দেশী, মুসলমান সংগীতাচার্য, য়ুরোপীয়দের আগমন, রূপান্তরিত বাংলা গান—এই ছটি অধ্যায়ে ১৮৯ পৃষ্ঠায় রচিত গ্রন্থটির শেষে তানসেন-পুত্রধারা এবং তানসেন-কন্যাধারা নামে দুটি বংশলতিকা এবং উৎপত্তি-বিবরণী নামে একটি বিশদ বিষয়সূচী পত্রাঙ্কসমেত সংযোজিত হয়েছে।

ভারতীয় সংগীতের ধারা তথা বিবর্তন নিয়ে দেশী বিদেশী বহু গ্রন্থকারের অনেক রচনা আছে—ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরেজিতে। সেদিক থেকে বইটির পথিকৃতের মর্যাদা নেই, এমন অন্য কিছুই নেই যাতে সম্পূর্ণ নতুন কোনো তথ্য বা তত্ত্ব পাওয়া যায়। এ বইটির বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তায়।

গ্রন্থটি ক্ষিতিমোহন সেনের রচনা, তাই বেশ কিছু ছাপার ভুল দেখে অসহিষ্ণু লাগে। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় অধ্যায়গুলির কয়েকটি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রিকায়, প্রকাশকের নিবেদনে একথা জানতে পারি। কিন্তু প্রবন্ধসংকলনে যদিও গ্রন্থ রচিত হতে পারে তবু গ্রন্থের নিজস্ব কিছু দায়িত্ব থাকে যা এক্ষেত্রে গ্রন্থকার সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। প্রকাশকের এ দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল। সূচীপত্রটি অসম্পূর্ণ, অনেক গ্রন্থকারের নাম নেই। পরিভাষাগুলির অর্থনির্দেশের প্রয়োজন ছিল, তা নেই; উদ্ধৃতিগুলির উৎসনির্দেশ নেই। গউড়া-গবুড়া মালশী-মালসী—এগুলি যে একই বস্তু নির্দেশ করে, পাদটীকায় তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল। গুঞ্জরী একই তালিকায় (পৃ ১৫০) দুবার আছে। ১৭৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা "সামবেদ এবং সামগান ঋগ্বেদের অপেক্ষা নূতন"—এ কথা ঠিক নয়। ঋগ্বেদের কথাই সামগানের আশ্রয়। "সামগানকে ঋগ্বেদীয়গণ কখনও বলিতেন তাহা শুনিতে কান্নার মত, কখনও বলিতেন পেচক-শৃগাল-সারমেয়-গর্দভ চিৎকারের মত।" তথ্যটি ভ্রান্ত : আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে ওইসব আওয়াজ, কান্না আর সামগান শুনলে ঋক্-আবৃত্তি বন্ধ করার নির্দেশ আছে।

গ্রন্থসমালোচনা

ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় প্রচুর পড়াশোনা করে, আকরগ্রন্থ দেখে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি রচনা করেন। তা ছাড়া দীর্ঘকাল সংগীতানুরাগীর ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে তিনি বিভিন্ন প্রস্থানের সংগীতের মর্মবস্তু সন্ধান করে ফিরেছেন সারা ভারতবর্ষে, এবং কখনও কখনও তার বাইরেও। সর্বোপরি, সংগীতসুধাকর কবির দীর্ঘ সান্নিধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন এক স্বচ্ছতা আর মর্মগ্রাহিতা এসেছিল যা বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে দুর্লভ। মার্গ আর দেশী শব্দ দুটি আপেক্ষিক (পৃ ৪৩)—এ কথা সহজে উচ্চারণ করেছেন লেখক, কিন্তু এর মৌলিকতা বিস্ময়কর, বিশেষত যখন অধিকাংশ শাস্ত্রকারই এ দুটিকে সম্পূর্ণ পৃথক কোটির সংগীত বলে জ্ঞান করেন। অথচ 'সংগীতরত্নাকরে'ই দেখা যায়, মার্গসংগীতের স্থানে দেশীয় সংগীতের সমাদর বাড়ছে (পৃ ৬৪)। বাঙলা কীর্তনে দক্ষিণ-ভারতীয় তাল (পৃ ৪৮) এবং বাঙলা সংগীতে দ্রাবিড় প্রভাব (পৃ ৮৩)—এই অংশগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

যেসব গ্রন্থে অবৈজ্ঞানিক বিষয়বিন্যাস এবং পুনরুক্তি, অর্থাৎ একই রাগ প্রায় একই নামে, একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে—সে গ্রন্থ 'সংগীতরত্নাকর'-এর মতো প্রামাণ্য হলেও—তার ত্রুটির উল্লেখ করা হয়েছে। 'সংগীতরত্নাকর'-এ তুরুষ্ক শব্দটি একাধিক রাগের নামে আছে, অথচ আমীর খুসরু (১২৯৫-১৩১৬)-র আগে মুসলমান রাগরাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায় না; কিন্তু দেখা যায়, সংগীতজগতে ভারত-তুরস্কের যোগ আরও আগে থেকেই রয়েছে। সংগীতের এবং বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাসে মধ্যপ্রাচ্যের, পারস্য-আরব-মিশর দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের গভীর যোগাযোগ ছিল, এবং এই দেশগুলির প্রভাব ভারতীয় রাগরাগিণী আর বাদ্যযন্ত্রে প্রভূত পরিমাণে আছে। আবার "হিন্দুসংগীত কোনো একটিমাত্র এথনিক জাতি বা গোষ্ঠীর দান নহে। ইহার মধ্যে ভারতীয় আর্য, আর্যপূর্ব, আর্যেতর নানা দলের দান একত্র একটি মিলিত রূপ ধারণ করিয়া আছে। এখন সবগুলি ধারা এমন গঙ্গাযমুনার মত মিলিয়া গিয়াছে যে কোনটা কোন ধারা তাহা আর নির্ণয় করা সম্ভব নহে।... নূতন নূতন ধারা একত্র হইবার সময় কিছুকাল হয়ত পদ্মা-মেঘনার মোহনায় কালো-ধলো খানিক দূর পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়, তাহার পর এক।" এই দৃষ্টিই গ্রন্থটির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

তথ্যের ঐশ্বর্য এ গ্রন্থে প্রচুর। মুসলমান সংগীতকারদের দান অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃতি আর অভিনন্দন পেয়েছে। আমীর খুসরুর কৃতিত্ব,

তাঁর ভারতপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত রচনা, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মনোভাব এবং তারই সঙ্গে তুরকি কৃতিত্ব সম্বন্ধেও তাঁর গর্ব উল্লেখ করা হয়েছে। নিজেকে তিনি ভারতের কবি বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি যে শুধু আর্য সংস্কৃতি নয়, এর মধ্যে বহু বিভিন্ন ধারা এসে মিশে একে সমৃদ্ধ করেছে—আজ সম্প্রদায়বিদ্বেষের যুগে এ বোধ বিশেষভাবে স্মরণীয়।

নানা ঘরানার উৎপত্তি তথা বিকাশের ইতিহাসকে লেখক আঞ্চলিক অর্থাৎ ভৌগোলিক পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন বলে সেগুলি বুঝতে সুবিধা হয়। তানসেন-সদারঙ্গ ঘরানার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনাটি (পৃ ১১৭) বহু তথ্যে সমৃদ্ধ। পারসিক সংগীতসাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের জ্ঞান নিতান্তই কম ; সেই সাহিত্যের মূল গ্রন্থগুলির সঙ্গে স্থান পেয়েছে বহু অখ্যাত আর অবজ্ঞাত পুঁথি—সেগুলির মূল্য সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহন অবহিত। তেমনই ধ্রুপদ, বিলাবল, টপ্পা, খেয়াল, তোড়ী, তিলককামোদ, তেলেনা, গজল ইত্যাদি রাগের সূচনা আর বিকাশ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য লেখক সন্নিবেশ করেছেন। ধ্রুপদ যে এক সময়ে দেশী বলে অবজ্ঞাত ছিল, সেটি সাধারণ পাঠকের জানা নেই।

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস উদ্ঘাটনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পরিশ্রম তথা কৃতিত্বেরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ গ্রন্থে আছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত ধরনের সংগীত শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা প্রচুর পরিশ্রমে সে সম্বন্ধে তত্ত্ব সংগ্রহ করে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, এ কৃতিত্ব বড়ো সামান্য নয়।

গ্রন্থের শেষ অংশে ভক্তদের সংগীত, ভারতীয় সুফী ভক্তের গান, কীর্তন বাউল থেকে শুরু করে যদুভট্ট এবং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্ন ধারাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা, এবং একেবারে শেষে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে প্রসিদ্ধ মার্গসংগীতকে রূপান্তরিত করে বাঙলা গানে পরিণত করেছেন, তার বহু উদাহরণ দেওয়া আছে। ব্যক্তিগত উপলব্ধি আর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই অংশটি।

এত সংক্ষিপ্ত কলেবরের মধ্যে এত তথ্য ভরে দিতে গেলে যা হয় তাই হয়েছে—সুখপাঠ্যতা ব্যাহত হয়েছে, এবং কোথাও কোথাও পুনরুক্তি থেকে গেছে। এ বই একটানা পড়া যায় না—এত তথ্য, এত তালিকা, এত নাম যে ক্লান্তিকর লাগে মধ্যে-মধ্যে। কিন্তু শুরু করলে শেষ না করেও থাকা যায় না। কারণ, গভীর পাণ্ডিত্য, সংগীতে প্রগাঢ় অনুরাগ আর অনুসন্ধিৎসা, সংগীত ও আনুষঙ্গিক কলা, ভারতীয় জীবনে ধর্মের বিবর্তনের সঙ্গে সংগীতের বিবর্তন কিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সে সম্বন্ধে দৃঢ় জ্ঞান—এসব এই গ্রন্থটির ক্ষুদ্র কলেবরের মধ্যে প্রচুর আকর্ষণের সঞ্চার করেছে। গ্রন্থকারের জ্ঞান, নিষ্ঠা, মনন আর উদার মানসিকতা, সবকিছুকে ইতিহাস আর ভূগোলের পরিপ্রেক্ষিতে দেখার ক্ষমতা গ্রন্থটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। মধ্যে-মধ্যে ছোটো-ছোটো মনোজ্ঞ কাহিনীতে সংগীতজগতের বহু ইতিহাসখণ্ড প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তুলনামূলক আলোচনা এবং নানা ছক আর তালিকাতে বক্তব্য স্পষ্টতর হয়েছে।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

উপন্যাস-বিচারের নানা পদ্ধতি

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস প্রথম খণ্ড—ক্ষেত্র গুপ্ত। গ্রন্থনিলয়, কলকাতা-৯। পঁয়ত্রিশ টাকা।

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মাঘ ১৩৪৫, জানুআরি ১৯৩৯-এ। আজ পর্যন্ত তার পাঁচ-ছটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। স্বীকার্য, তা আজো অপরিহার্য হয়ে আছে। পরে-পরে পাঁচ-সাতটি বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাস লেখা হলেও সেগুলি ওই গ্রন্থকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি।

সম্প্রতি ক্ষেত্র গুপ্ত এক উচ্চাশী পরিকল্পনা নিয়ে আসরে নেমেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথম পাদ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দের চতুর্থ পাদ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়সীমায় পরিব্যাপ্ত বাঙলা উপন্যাসের সূচনা, অঙ্কুর, বিকাশ এবং সমৃদ্ধির বিস্তারিত ইতিহাস তিনি লিখতে চেয়েছেন। তার প্রথম খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে বঙ্কিম-পূর্ব যুগে (১৮২৩-১৮৬৫ খৃী) বাঙলা উপন্যাসরচনায় প্রাথমিক প্রয়াসের বিস্তৃত বিবরণ তথা মূল্যায়নের পর বঙ্কিম-উপন্যাসের (১৮৬৫-১৮৯৩ খৃী) পুনর্বিচার করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের ব্লারব-এ (প্রকাশক-ঘোষিত গ্রন্থ-বিবরণীতে) লিখিত আছে : "বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস প্রথম খণ্ড কালানুক্রমিক তথ্যস্তূপ নয়। যথার্থ ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যালোচন। মুখ্য লেখকদের বিস্তৃত মূল্যায়ন। শিল্পরীতির ভিত্তিতে বস্তুনিষ্ঠ বিচার। একটি নব্য আলোচনা-পদ্ধতি (মেথডলজি) উদ্ভাবনপ্রতিষ্ঠার দিকে পদক্ষেপ।"

গোড়াতেই জানাতে হয়, প্রস্তাবিত সাত খণ্ডের এটি প্রথম খণ্ড। তাই এখনি কোনো চূড়ান্ত অভিমত দেওয়া সম্ভব নয়। তবে উচ্চাশী পরিকল্পনার কিছু-কিছু পরিচয় এই খণ্ডে লভ্য। এর থেকেই অনুধাবন করা যায়, লেখক আটঘাট বেঁধে নেমেছেন। বইয়ের মুখপাতে লেখকের ছোট্ট ভূমিকায় স্বীকৃতি আছে—" 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'-র গ্রন্থকার ড শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমার গুরু-ঋণ, যদিও ওই পুস্তক থেকে এই লেখা একেবারেই আলাদা।"

প্রকাশকের এবং লেখকের এই দুই দাবি আলোচ্যমান খণ্ডে কতদূর টেকসই তা দেখা যেতে পারে।

প্রথমেই চোখে পড়ে—লেখক খোলা মনে বিচার করতে চেয়েছেন। উপন্যাস-বিচারের এবং উপন্যাসের ইতিহাস-রচনার নানা পদ্ধতি আছে, লেখক তা স্বীকার করেছেন। একটি পদ্ধতি উত্তম, আর-সব পদ্ধতি সর্বথা পরিত্যাজ্য, এমন কথা বলেন নি। দ্বিতীয়ত চোখে পড়ে, লেখকের প্রবল কাণ্ডজ্ঞান, যার অভাবে অনেক উচ্চমানের বিচারকর্ম পণ্ড হয়ে যায়।

এই খণ্ডের প্রথম পর্বে বিচারিত বিষয়গুলির শিরোনাম এইরকম—সংজ্ঞার বিতর্ক, শ্রেণীপরিচয়, পদ্ধতির বিচার। এখানে যেসব তথ্য আর সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তা গোড়াকার কথা। হয়তো না লিখলেও চলত, তবে আমাদের অশিক্ষিতপটুত্বের দেশে তা লিখে দেওয়াই ভালো। উপন্যাস-সম্পর্কিত প্রাথমিক মোটা কথাগুলি পরিবেশনে লেখকের অনায়াসনৈপুণ্য স্বীকার্য। এবং তা পড়তে কোথাও আটকায় না ; দুঃসাধ্য পাণ্ডিত্যের দুরূহ সব চড়াই পেরিয়ে যেতে হয় না। উপন্যাসের জাতিপরিচয় এবং শ্রেণীপরিচয় দিতে গিয়ে লেখকের নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে কেবল স্বাদু উপস্থাপনায় নয়, সেইসঙ্গে প্রদত্ত নানা ছকের মাধ্যমে। গুরু বিষয়ের আলোচনায় এগুলি পাঠকের কৌতূহলকে জাগ্রত রাখে। এখানে পাই উপন্যাসের হরেক পরিচয়,—কাব্যধর্মী, নাট্যধর্মী, মহাকাব্যিক, আত্মজীবনীমূলক, ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস। লেখক বাঙলা উপন্যাস থেকে উদাহরণ তুলে বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। মাঝে-মাঝে দু-একটি মন্তব্য আমাদের ভাবায়—যেমন, "বাংলা ভাষায় যত উপন্যাস লেখা হয়েছে তার বেশির ভাগই প্রেম নিয়ে। রাজনীতি-ধর্মনীতিমূলক উপন্যাসেও প্রেম ছাড়া চলে না। প্রেম একদম বাদ এরকমের উপন্যাস খুঁজে পেতে হবে।' (পৃ ৩০)

সাতটি ছকে সাঁয়ত্রিশটি শাখা-উপশাখায় উপন্যাসের রূপবৈচিত্র্য লেখক দেখতে চেয়েছেন। আবার, একটা উপন্যাস অন্তত চারটি ছকের কোনো ভাগকে স্পর্শ করে। "তা হলে হিসেবে ৬৬০৪৫ রকমের উপন্যাস হতে পারে। একাধিক শাখার মিশ্ররূপ ধরলে সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে যায়। এ অবস্থায় শ্রেণীবিভাগ প্রায় নিরর্থক মনে হতে পারে। তবু আমরা শ্রেণীপরিচয়কে দামি মনে করছি। কারণ অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে বিহ্বল হয়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে কিছু স্থূল শ্রেণীর ধারণা সামনে থাকলে কাজের সুবিধা হয়। তবে এর সীমাবদ্ধতা ভুললে সাহিত্যপাঠক হিসেবে পতিত হবার ভয়।" (পৃ ৩৪)

লেখকের এই বক্তব্যের সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না।

এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—পদ্ধতির বিচার। তথ্যমূলক কালানুক্রমিক পদ্ধতি আর মার্কসীয় পদ্ধতি—এ দুটির উল্লেখ করে লেখক দুয়েরই গুণ আর সীমাবদ্ধতা দেখিয়েছেন। লেখকের কাণ্ডজ্ঞান এই অংশে প্রকাশিত। যেমন, "কোনো উপন্যাসের শিল্পগুণ নির্ণয়ের দরজা পর্যন্ত মার্কসবাদ পৌঁছে দেয়। তার ভিতরে ঢুকতে হবে শৈল্পিক বিচারপদ্ধতি নিয়েই।" এবং "মার্কসীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী সমাজবিবর্তনে উপন্যাসাদি সাহিত্য গুরুতর কাজ করতে পারে। তার সেই ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সামাজিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু তার সঙ্গে শিল্পমূল্যের কোনো সম্বন্ধ নেই। একটি মূল্যে সমৃদ্ধ হয়েও কোনো রচনা অপরটিতে দীন হতে পারে। ঔপন্যাসিকের কাছে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দাবি এবং শিল্পের দাবি এক ধরনের না হতেই পারে।" (পৃ ৩৬)

লেখক বাঙলা উপন্যাসের পাঁচটি স্তর নির্দেশ করেছেন : প্রথম স্তর : ১৮২৩-১৮৬৫ : বঙ্কিম-পূর্ব যুগ। দ্বিতীয় স্তর : ১৮৬৫-১৯০০ : বঙ্কিম-যুগ। তৃতীয় স্তর : ১৯০০-১৯৩৫ : রবীন্দ্র থেকে শরৎ। চতুর্থ স্তর : ১৯৩৫-১৯৬০ : স্বাধীনতা-প্রাপ্তির কাল। পঞ্চম স্তর : ১৯৬০ থেকে : মূল্যবোধ ভাঙার দিনগুলি।

এই স্তরবিভাগ অনেকেরই মনঃপূত হবে না। লেখক তা জানেন। স্তর-বিভাজনের পক্ষে তাঁর যুক্তিগুলি তিনি পেশ করেছেন (পৃ ৪০-৪৬)। কাজ চালানোর জন্যে একটা পরিকাঠামো দরকার, একথা যদি মানি তবে লেখকের এই স্তরবিভাজন সম্পর্কে আপত্তি আপাতত তুলে রাখতে পারি।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে—'উপন্যাসের খোঁজে'—লেখক বাঙলা উপন্যাসের প্রাথমিক প্রয়াসের বিশদ পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্লেষণ করেছেন।

অধুনা কেউ-কেউ বাঙলা উপন্যাসের উৎসসন্ধানে বেরিয়ে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য আর লোকসাহিত্যে উপনীত হয়েছেন। উপন্যাস বিশেষভাবে আধুনিক কালের শিল্প, শিল্পবিপ্লবোত্তর নগরাশ্রিত সমাজেই তার উদ্ভব—এই ইতিহাস-সত্যকে ক্ষেত্র গুপ্ত বিস্মৃত হন নি। এখানে তাঁর প্রবল কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাই। স্পষ্ট ভাষায় তিনি লিখেছেন—"বাংলা উপন্যাস আধুনিক বাঙালির মতোই ঊনবিংশ শতাব্দীর জলে-হাওয়ায় মানুষ। লেখকেরা যেমন শিক্ষিত, পাঠকেরাও তেমনি। দীর্ঘকাল ধরে তাদের জীবন, জীবনাদর্শ, কল্পনার জগৎই ছিল এর বিষয়বস্তু। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য বা মৌখিক গল্পসাহিত্যের ঐতিহ্যে উপন্যাস লালিত হয় নি।" (পৃ ৫৭)

ভবানীচরণ-প্যারীচাঁদের কাহিনীতে সমাজবাস্তবতা ছিল। কিন্তু গত শতকের মধ্যভাগে একদিকে গদ্য-নকশা, অন্যদিকে প্রহসনের প্রাচুর্য তাঁদের ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা আত্মসাৎ করে নিল। ইতিহাস-কল্পনায় মিশিয়ে যে গল্প ভূদেব-কৃষ্ণকমল লিখেছিলেন বিদ্যাসাগরের কাহিনীগুলির সঙ্গে তার

একদিকে অল্প মিল ছিল। অনির্দেশ্য পৌরাণিক কাল থেকে নির্দিষ্ট ইতিহাসের অতীতে গল্পকে তাঁরা নামিয়ে আনলেন। কল্পনা তাতে অবাধ রইল, কিন্তু বিশ্বাস্য হল। এর পরই এলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

নকশা-প্রহসন-ব্যঙ্গাত্মক কাহিনীর ধারাকে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রাহ্য করলেন। বরং ভূদেব-কৃষ্ণকমলের ধারায় তাঁর সায় ছিল। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলা-মৃণালিনীর মধ্য দিয়ে বাঙলা ভাষায় উপন্যাস নিজের পায়ে দাঁড়াল—কোথাও দ্বিধা রইল না। শিল্পগুণে চরমোৎকর্ষ এল মুঠোয়। এখানেই বাঙলা উপন্যাসের মুক্তি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগটা পুরোই এই লেখক আর এই শ্রেণীর নভেল বাঙলা সাহিত্যে একচ্ছত্র রাজত্ব করেছে। এমনকি যে-কয়খানা সামাজিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন তার ধরনধারনও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান (লালবিহারী দে-রচিত। ১৮৫৭ সালে লেখকের নাম ছাড়াই লালবিহারী-সম্পাদিত 'সম্বাদ অরুণোদয়' পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত। ড দেবীপদ ভট্টাচার্য-কর্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত যে লালবিহারী-ই এর লেখক। দ্রষ্টব্য : তৎ-সম্পাদিত 'রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান', ১৯৬৮) থেকে নেওয়া নয় ; আলালের মতো নয় ; বরং আত্মীয়তা ওই ইতিহাসাশ্রয়ী রোমানসের সঙ্গে। এই প্রস্থানভূমি থেকে লেখক বঙ্কিম-উপন্যাসের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

গ্রন্থের তৃতীয় পর্ব—বঙ্কিমচন্দ্র। সাড়ে তিন শ পৃষ্ঠায় ছড়ানো এই বিচার। সংহত, নিপুণ, আপন লক্ষ্যে স্থির-দৃষ্টিনিবদ্ধ। এই পর্বের পনেরোটি অধ্যায়ে লেখক তিরিশ বছর (১৮৬৪-১৮৯৩) ধরে লেখা উপন্যাসগুলির বিচার করেছেন। বঙ্কিমের ইংরেজিতে লেখা 'রাজমোহনস ওয়াইফ' (১৮৬৪) উপন্যাসের আলোচনায় তাঁর যাত্রা শুরু। বঙ্কিমকে বোঝার জন্য এবং বাঙলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠাকালীন সমস্যাটি বোঝার জন্য লেখক এর আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসের রূপ আর আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা আর পথসন্ধানের সংবাদ পাওয়া যায় 'রাজমোহনস ওয়াইফ'এর বিশ্লেষণে। এই ইংরেজি বই থেকেই ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের মনোভাব এবং রচনারীতির বিশিষ্ট কতকগুলি ঝোঁক চোখে পড়ে বলে লেখক মনে করেন। যেমন, এক. মানুষের সমাজ-অস্বীকৃত প্রেমকে বিশেষ গুরুত্বদান—রচনার কেন্দ্রীয় আসনে তাকে স্থাপন। দুই. প্রেম মানুষের স্বভাবে যে বিচিত্র জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে তার প্রতি বঙ্কিমের আগ্রহের সূচনা। তিন. নাটকের আদর্শে তৈরি এই উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যসম্ভাবনা তথা নাট্যরীতির প্রথম ইঙ্গিতবহ। এই বিচার লেখকের পর্যবেক্ষণ-সামর্থ্যের পরিচায়ক, তা অনস্বীকার্য।

লেখক বঙ্কিম-উপন্যাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্ব : ১৮৬৫-৬৯—দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী। দ্বিতীয় পর্ব : ১৮৭০-৮০—বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর রজনী কৃষ্ণকান্তের উইল মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। তৃতীয় পর্ব : ১৮৮২-৮৭—আনন্দমঠ দেবীচৌধুরানী সীতারাম। চতুর্থ পর্ব : ১৮৯৩—ইন্দিরা রাজসিংহ।

লেখক বর্জন করেছেন যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারানী। এই গ্রহণবর্জনের কারণও তিনি দেখিয়েছেন (পৃ ১৬৩-৬৪)। এর মধ্যে লেখকের মানসিকতা আর দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা যায়। তিনি এখানেই থামেন নি। বঙ্কিম-উপন্যাসগুলিকে বিভিন্ন বর্গে ভাগ করে-করে দেখিয়েছেন। কত বিচিত্র ভাবে আর দৃষ্টিভঙ্গিতে উপন্যাসকে দেখা যায় তার প্রমাণ এখানে পাই। বিচিত্র ছক আর ত্রিভুজের মাধ্যমে তিনি বঙ্কিম-উপন্যাসের বিষয়-ও রূপ-ভেদে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। মনে হয় যেন লেখক প্রিজম-কে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নানা রঙ আর রশ্মি দেখাচ্ছেন।

লেখকের উপন্যাসের বিচারের নিজস্বতা দেখা গিয়েছে বঙ্কিম-উপন্যাসের গঠনশিল্পের বিচারে। এখানেই তাঁর নিজস্ব বিচারদৃষ্টি প্রকাশিত। যেমন, বিষবৃক্ষ উপন্যাসের দুটি ত্রিভুজ তিনি উপস্থিত করেছেন। একটি, স্ট্রাকচারাল পিরামিড (শিল্পরূপের বিচার), অপরটি প্রণয়-ত্রিভুজ (বিষয়-বোধের বিচার)। এটিই তাঁর প্রধান বক্তব্য। বঙ্কিম-উপন্যাসে কাহিনী-বিন্যাসের নানা লক্ষণও তিনি নির্দেশ করেছেন।

১৮৬৫ থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আটাশ বছর ধরে বঙ্কিম উপন্যাস লিখেছেন, ২৭ বছর বয়সে তাঁর উপন্যাস রচনা শুরু, শেষ ৫৫ বছর বয়সে। চারটি পর্বে দ্বিমুখী পালাবদল হয়েছে বলে লেখক মনে করেন। তারও একটি ছক তিনি দিয়েছেন (পৃ ১৮৩)।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিম সম্পর্কে চারটি অভিযোগ গত একশ বছরে উঠেছে—হিন্দু সাম্প্রদায়িক, ইংরেজ-সমর্থক, জমিদারশ্রেণীর মুখপাত্র, নীতিবাগীশ। লেখক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, এর একটিও তাঁর সম্পর্কে খাটে না (পৃ ১৮৫-১৮৯)।

এইভাবে দেখি, লেখক বঙ্কিমের উপন্যাসকে নানাভাবে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখেছেন। তারপর বঙ্কিমের তেরোটি রচনার (বারোটি উপন্যাস আর 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', তাঁর মতে 'উপন্যাসের খসড়া') বিস্তারিত আলোচনা করেছেন স্বতন্ত্র অধ্যায়গুলিতে। লেখকের বিশ্লেষণ আঙ্গিকবিচার-নির্ভর, তারই মধ্য থেকে তিনি উপন্যাসের থীম, চরিত্র, কাহিনী, সমাজ-বিন্যাস খুঁজে নেন এবং নানা ছকের আর সূত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শিল্পরূপকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সংলাপের বিশিষ্টতা, নাটকীয় মুহূর্ত রচনার কৌশল, প্লটের অগ্রগতিসাধনের বিশেষ নিপুণতার ছক তিনি তৈরি করেছেন। আর সবকিছুর মধ্য দিয়ে উপন্যাসের অখণ্ড শিল্পরূপকে ধরতে চেয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি বরাত দিয়েছেন তাঁর লেখা 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি' গ্রন্থের উপর। কিন্তু এখানে তার পরিচয় পাই না, ইশারাটুকু পাই। তার ফলে আমাদের জিজ্ঞাসা অন্তত এই বইয়ের ক্ষেত্রে অতৃপ্ত থেকে যায়। সুখের বিষয়, নানা ছক আর সূত্রের ভিড়ে মূল ব্যাপারটা হারিয়ে যায় না, বঙ্কিম-উপন্যাসের শিল্পরূপের অখণ্ডতা সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়ে ওঠে। আর কিছু-কিছু ক্ষেত্রে যেসব সংশয় আর আপত্তি মনে জাগে তা প্রমাণ করে সমালোচনার সার্থকতা। সে সার্থকতা প্রশ্নের সমাধানে নয়, উত্থাপনে ; সংশয়ের নির্বাসনে নয়, সতেজ বিচারে।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সমরেশের 'কাজকর্ম'

সমরেশ মজুমদারের ত্রয়ী : **উত্তরাধিকার**—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৬, চল্লিশ টাকা। **কালবেলা**—আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯০, চল্লিশ টাকা। **কালপুরুষ**—আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯১, পঞ্চাশ টাকা।

'কালবেলা' উপন্যাসের মুখবন্ধে সমরেশ মজুমদার জানিয়েছেন তিনি সময়টাকে ধরতে চেয়েছেন। যে কোনো ঔপন্যাসিকই সময়কে ধরতে চান, সে কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবুও সমরেশ যখন এটা বিশেষ করেই বলেছেন, তখন লক্ষ করা উচিত কোন্ সময়টা তিনি ধরতে চেয়েছেন।

'উত্তরাধিকার', 'কালবেলা', 'কালপুরুষ'—এই তিন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনিমেষ। ১৯৪৭-এর ১৫ অগসট দিয়ে উপন্যাসের শুরু। অনিমেষের বয়স তখন, স্পষ্ট করে বলা নেই, মনে হয় পাঁচ-ছয়। ১৯৪২-এ তার জন্ম ধরা গেল। এই হিসাবটি মাথায় রেখে সময়টাকে লক্ষ করতে হবে। জলপাইগুড়ি জেলার স্বর্গছেঁড়া চা-বাগান থেকে সে ১৯৪৭ সালে জলপাইগুড়ি শহরে চলে আসে পড়াশুনা করতে।

অনিমেষের দাদু সরিৎশেখর বাষট্টি বছর বয়সে চা-বাগান থেকে রিটায়ার করছেন ১৯৪৭ সালে। অতএব, তাঁর জন্মের বছর ১৮৮৫।

অনিমেষ যখন স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলকাতায় আসে তখন সরিৎশেখরের বয়স বাহাত্তর, অর্থাৎ বছরটা হল ১৯৫৭। উত্তরাধিকার উপন্যাসের সময়সীমা তা হলে দাঁড়াল ১৯৪৭-১৯৫৭।

কালবেলার সময় শুরু যখন অনিমেষ ফিফথ ইয়ারের ছাত্র। কলকাতায় প্রথম আসার দিন পুলিসের গুলি খেয়ে তার এক বছর নষ্ট হয়েছে। সে যখন ফিফথ ইয়ারে পড়ে তখন বছরটা নিশ্চয় ১৯৬২। পরীক্ষার বছর পরীক্ষা না দিয়ে সে রাজনীতি করতে চলে যায়, অর্থাৎ বছর ১৯৬৩।

কিন্তু বেলাটা কালবেলা, সুতরাং সময়ের হিসেব অতটা স্পষ্ট করে বলা যায় না। অনিমেষের বয়স বাড়ে এক হিসেবে, রাজনীতির সময় এগোয় অন্য হিসেবে। যেহেতু উপন্যাসটি সময় ধরার, আবার রাজনীতিরও, আমাদের এবার লক্ষ করতে হবে—এই দুয়ের হিসেবের গরমিলের উদ্দেশ্য কী।

অনিমেষ যখন ফিফথ ইয়ারের ছাত্র তখনকার অর্থাৎ ১৯৬২-এর কথা। সুবাস, যে অনিমেষকে বাঁচিয়েছিল কলকাতায় এসে অনিমেষ পুলিসের গুলি খেলে, এখন বীরভূমে চলে গেছে কাজকর্ম করতে। ছাত্র ফেডারেশন এখনই ডান-বাম হয়ে গেছে। "সেই চীন-ভারত যুদ্ধের সময় থেকেই এইসব ব্যাপার চলছে।" "বিদেশী একটা রাষ্ট্রের আক্রমণের ফসল হিসেবে এদেশের একটা বড় পার্টি ভাগ হয়ে গেল।"

ইউনিভারসিটি ক্যানটিনে কথা বলতে-বলতেই দেখা যাচ্ছে, চীন-ভারত যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টি ভাগাভাগি সব ঘটে যাচ্ছে। ১৯৬২-৬৪র ঘটনা যদি এক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় তাহলে সমরেশের সময়কে ধরার কৌশলটার ব্যঞ্জনা আমাদেরও ধরতে হবে। কিন্তু এই একবার লক্ষ করলেই আমরা সফল না হতে পারি। আরো দেখা যাক।

অনিমেষ এখনও ফিফথ ইয়ারের ছাত্র, ১৯৬২ সাল। সুবাসের সঙ্গে দেখা হাতিবাগানের মোড়ে। সিপিআই-সিপিএম তো হয়েই গেছে, সুবাসের কথায় জানা গেল তাকে সিপিএম থেকেও বার করে দেওয়া হয়েছে, নেতৃত্বের ভুল দেখিয়ে দেওয়ার অপরাধে। সিপিএম নেতৃত্ব তখন নির্বাচনের মাধ্যমে মন্ত্রিত্ব পাওয়ার আশায় মশগুল। ব্যাপারটা তাহলে ১৯৬৬-৬৭ সালে এসে গেছে প্রায়। অনিমেষের জীবনের এক বছর আর রাজনীতির হিসাবে পাঁচ বছর।

১৯৬২-র সময়ই চলছে। ইউনিভারসিটি লনে ছাত্রসভা। ভিয়েতনামে আমেরিকার বিষাক্ত বোমাবর্ষণের প্রতিবাদে। বিষাক্ত বোমা আমেরিকা ছাড়ে ভিয়েতনামে ১৯৬৬ সালে জনসনের আমলে। আবার দেখা যাচ্ছে, অনিমেষের জীবনের এক বছর ইতিহাসের চার বছরের সমান।

বিধান রায়ের পর থেকে কংগ্রেসি নেতৃত্ব অনুধাবন করছে অনিমেষ, এবং সিপিএম-এরও। দুটি চরিত্রে খুব পার্থক্য দেখতে পাচ্ছে না। এখনও কিন্তু অনিমেষ সিকসথ ইয়ারের ছাত্র।

সে উত্তর বঙ্গে উপনির্বাচনে কাজ করতে এসেছে সিপিএমের হয়ে। উপনির্বাচন হয়ে যাবার পর অনিমেষ কলকাতায় ফিরেছে। ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের যুদ্ধ লেগে গেছে ১৯৬৫

সালে। অনিমেষ কিন্তু এখনও সিকসথ ইয়ারের ছাত্র, অর্থাৎ ১৯৬৩-তে থেকে গেছে। সুবাসের পাশে অনিমেষ শুয়ে আছে ঘরে, আর কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর অকালমৃত্যু হচ্ছে, নেহরু পরিবারকে আবার আঁকড়ে ধরা হচ্ছে, দেশের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন একজন মহিলা, মেদিনীপুরের কংগ্রেস নেতা বাংলা কংগ্রেস করছেন। আমরা মোটামুটি ১৯৬৬-র শেষে চলে এসেছি, যদিও ঘুম থেকে উঠে অনিমেষ সুবাসদাকে বলছে, ভেবেছিলাম এখন পড়াশুনা করব। এরই কয়েকদিন পর সিঁথির এক বাড়িতে সাতজনের এক গোপন বৈঠকে অনিমেষ শুনল অল ইনডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব কমিউনিস্ট রেভলিউশনারিজ গঠিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা এখন ১৯৬৭ সালের ১৩ নভেম্বর ছাড়িয়ে এসেছি। অনিমেষ যদিও এখনও সিকসথ ইয়ারেই, ১৯৬৩ সালেই আছে।

এটা হল সমরেশের উপন্যাসের এক দিক, তাঁর সময়কে ধরার চেষ্টা। উপন্যাসের আর-এক দিক তার রাজনীতি। মুখ্য চরিত্রটি রাজনৈতিক চরিত্র, সুতরাং তার রাজনীতির ধরনটা দেখা যাক।

১৯৪৭ সালে জাতীয় পতাকা তুলে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শুনে অনিমেষ হাত পাকিয়েছে। জলপাইগুড়ি শহরে সে কংগ্রেস করে। উত্তরাধিকার উপন্যাসটি তার কংগ্রেসি করার গল্প। কংগ্রেসি করা অর্থ, প্রজাতন্ত্র দিবসে স্কুলে জড়ো হওয়া এবং ইনকিলাব জিন্দাবাদ শুনে আশ্চর্য হওয়া, কাকার মুখে শালা কংগ্রেসি শোনা, কমিউনিস্ট কাকার বড়োলোক হয়ে যাওয়া দেখা, খাঁটি কমিউনিস্ট সুনীলদার পার্টির কাজে খুন হতে দেখা, কংগ্রেসিদের ক্ষমতার অপব্যবহার লক্ষ করা, তিস্তার বন্যায় আর্তসেবা করতে গিয়ে কংগ্রেসিদের স্বার্থপরতা অনুভব করা—ইত্যাদি নিয়ে উত্তরাধিকার। বালকের চোখে রাজনীতি লক্ষ করা হিসাবে এই উপন্যাসে তেমন কোনো উদ্ভট, অবাস্তব বা গোঁজামিল তেমন নেই, যদিও দাদু-পিসিমাকাকা-জড়িত যে কোনো উপন্যাসের টানা গল্পের সঙ্গে এর কোনো পার্থক্যও নেই। গণ্ডগোলটা পাকায় কালবেলায় এসে।

জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় আসার দিন আচমকা পুলিশের গুলি লাগে অনিমেষের পায়ে। সেই ক্ষত আবিষ্কার করে তার সতীর্থদের ধারণা হয়, সে কমিউনিসট পার্টি করে, পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে। তার এই কমিউনিসট খ্যাতি বৃদ্ধি পায় যখন সে হোসটেলে সুপারের ঘরে মেয়ে-আনার প্রতিবাদে অগ্রণী হয়। এই কমিউনিসট বীরের জন্য লাল শালু পেতে দেওয়া হয় সিপিএম-এর ছাত্রফ্রনটে। কিন্তু বীরের মনে নানা প্রশ্ন। তুচ্ছ অরাজনৈতিক ইস্যুকে সিপিএম-এর রাজনৈতিক চরিত্র দেওয়ার চেষ্টা, দেশকে ফেলে ভিয়েতনাম নিয়ে হৈচৈ করা, এবং সর্বোপরি অকৃত্রিম কমিউনিসট সুবাসদার প্রতি পার্টির ব্যবহার—এইসব তাকে ঠেলে দিল নকশালদের দিকে। এই পর্যন্ত তবু বিশ্বাসযোগ্য ছিল, কিন্তু সমরেশের রাজনীতিবোধের তো এইখানেই পরীক্ষা হবে। নকশাল রাজনীতি যে ভুল রাজনীতি কিন্তু সে বিষয়ে তাঁর সহানুভূতি আছে, এটাই তিনি দাবি করেছেন। অতএব নকশাল রাজনীতিটি কী সেটা ইশতাহারের মাধ্যমে না এনে জীবনের মাধ্যমে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আনবেন—এটাই পাঠকের আশা। কালবেলা উপন্যাসে এই রাজনীতির চেহারাটি কী?

সিপিএম-এর নির্বাচনমুখী রাজনীতি পরিহার করে অনিমেষ এখন নকশাল রাজনীতি করে। গ্রামকে দিয়ে শহর ঘিরে ফেলতে হবে, গণফৌজ করতে হবে, বন্দুকের নলই ক্ষমতার একমাত্র উৎস, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র করতে হবে। উত্তেজিত, উদ্বুদ্ধ অনিমেষ কাজে নেমে পড়ল। কাজটি কী? দমদম স্টেশন থেকে চিড়িয়ার মোড় পর্যন্ত সাত দিনে কভার করা, স্লোগান লিখে। স্লোগান লেখা ছাড়া আর কি? "খুব দ্রুত কাজ শুরু হয়ে গেল", "নকশালবাড়ি ফাঁসিদেওয়া খড়িবাড়ি অঞ্চলে কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল", "একদিকে দমদম সিঁথি বরাহনগর বেলঘরিয়ায়। অন্যদিকে বেলেঘাটা যাদবপুর টালিগঞ্জ এলাকায় কাজকর্ম জোরদার হতে লাগল"—কিন্তু কাজকর্মটি কী? এই কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান সমরেশের খবরের-কাগজ-পড়া জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নেই, তাই বাগ্‌বিস্তার না করে, 'কাজকর্ম' বলেই ক্ষান্তি দিয়েছেন। ইশতাহারে সমরেশ একটা শব্দ বার-বার পেয়েছেন, সংগঠন। উপন্যাসেও তাই অনিমেষ শোনে, সংগঠন করতে হবে, সংগঠন হয়ে গেছে, ইত্যাদি। এই সংগঠনটি কী? নকশালদের নিয়ে উপন্যাসে পাঠকের প্রথম দাবি—এই কাজকর্ম এবং সংগঠনের স্পষ্ট চিত্র। যে কাজকর্ম এবং সংগঠন দিয়ে নকশাল উপন্যাসের শুরু হওয়ার কথা, সেই কাজকর্ম এবং সংগঠন সম্পর্কে পাঠকের কোনো ধারণাই জন্মাল না। যে বিষয়ে কোনো জ্ঞানের দরকার হয় না, সে বিষয়ে কোনো ঘাটতি নেই অবশ্য। গোপন গ্রুপ মিটিঙ, অ্যাকশন, পুলিশি বর্বরতা, নৈশ অভিসার ইত্যাদির জন্য অভিজ্ঞতার দরকার নেই, খবরের কাগজ, গালগল্প যথেষ্ট, আর দরকার টানা গল্প লেখার ধৈর্য।

কালবেলা ছাড়িয়ে কালপুরুষে এসে সমরেশ আবার ধাতস্থ হয়েছেন। এখন অনিমেষ পঙ্গু, বেলগাছিয়ায় বস্তিতে থাকে, স্ত্রীর উপার্জনে খায়, ছেলেকে বখে যেতে দেখে। স্বর্গছেঁড়ার চা-বাগান, জলপাইগুড়ির স্কুল এবং পাড়া, কলকাতার হোসটেলজীবনের মতো এই বস্তিও সমরেশের মোটামুটি চেনা এবং আর দশটি বাঙলা উপন্যাসের মতো তিনিও গল্প টেনে যেতে পারেন। ভাষার পরিমিতিবোধ, তীক্ষ্ণ চরিত্রচিত্রণ, স্পষ্ট আবহসৃষ্টি, অভিজ্ঞতার একটি স্তরে নানা স্তরের বিন্যাস—এসব তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়। রাজনীতি তো তাঁর আওতার বাইরে।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

মুঘল রাজদরবারের চিত্র

শাহানশাহ—বারীন্দ্রনাথ দাশ। প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলিকাতা-৭। ষাট টাকা।

'শাহানশাহ' গবেষণাপুষ্ট ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। যতদূর মনে পড়ে, এই উপন্যাসের রচয়িতা বারীন্দ্রনাথ দাশের প্রথম লেখা 'কর্ণফুলি' প্রকাশিত হয়েছিল অধুনালুপ্ত 'অচলপত্র' মাসিক পত্রিকায়। 'কর্ণফুলি' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বাঙলা সাহিত্যে একজন সম্ভাবনাপূর্ণ লেখকের আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল। গ্রন্থকার 'শাহানশাহ'-তে নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় নিয়ে ইতিহাসের প্রামাণ্য তথ্য আর সুপ্রচলিত কাহিনীর অনুসরণে বহু-আয়াসসাধ্য কাজ সম্পন্ন করেছেন। মোগল রাজদরবার তথা অন্দরমহলের ঔদ্ধত্য, অধঃপতন আর নানা বিকৃতির চিত্রাবলী একের পর এক যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করে মুনসিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এর জন্য লেখক অতিরঞ্জনকে প্রশ্রয় দেন নি, পক্ষান্তরে, 'মাসির-এ-আলমগীরী', 'মাসির-উল্-উমরা'র মতো প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করে এই ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনা করেছেন।

'শাহানশাহ' চারটি পর্বে সম্পূর্ণ,—প্রথম পর্বের নাম 'শাহজাদা', দ্বিতীয় 'এক বেগম এক সুলতান', তৃতীয় 'যমুনার তীরে' এবং চতুর্থ পর্বের নাম 'দিল্লী'। মোট ৮২৬ পৃষ্ঠার এই স্ফীতকায় গ্রন্থে ১৬৫২ থেকে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ—এই কয় বছর কাহিনীর ব্যাপ্তিকাল। বিশাল মোঘল সাম্রাজ্যের বহিরঙ্গ বৈভবের আড়ালে যে সদা-শঙ্কিত-সন্ত্রস্ত জগতে সুষমার সঙ্গে ভয়ংকরের আলিঙ্গন ঘটনার পর ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি করে চলেছিল গ্রন্থকার সে বিষয়ে সজাগ-সতর্ক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। গবেষকের নিষ্ঠা আছে বলেই লেখক কল্পনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সংযত করে রাখতে পেরেছেন; ইতিহাসের তথ্যভারে কাহিনীকে অযথা জর্জরিত না করে যথাসম্ভব রসগ্রাহী করে তুলেছেন।

বহু বিচিত্র অসাধারণ আর অতি-সাধারণ চরিত্রের সুনিপুণ বিন্যাসে আর সংলাপে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে যে-আওরঙ্গজেবের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার সঙ্গে বারীন্দ্রবাবুর এই উপন্যাসের আওরঙ্গজেবের তেমন কিছু পার্থক্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের আওরঙ্গজেব ক্রোধী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ক্রুর, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন, এমন-কি পরস্ত্রী নির্মলকুমারীকে প্রেমনিবেদনেও এই তথাকথিত ধার্মিক মানুষটির একটুও সংকোচ নেই। বারীন্দ্রনাথ দাশের আওরঙ্গজেবও তাই; পার্থক্য শুধু বয়সে।

রাশিয়ার জরজিয়া অঞ্চলের রূপসী 'উদিপুরী' সম্পর্কে বারীন্দ্রবাবুর বক্তব্য, "অনেকে আবার একথাও বলতো যে, সে কাশ্মীরী হিন্দু।" উদয়পুর থেকে এই ক্রীতদাসীটিকে আনা হয়েছিল বলে এর নামকরণ হয়েছিল 'উদয়পুরী বাঈ', 'বাঈ' সম্বোধন ছিল হিন্দুনারীদের জন্য, "তাই নাকি অনেকের ধারণা উদয়পুরী আসলে হিন্দু।" এ-জাতীয় মন্তব্য গবেষকের কাছে আশা করা যায়ই, কিন্তু গবেষক যেখানে শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ সেক্ষেত্রে এসব না বললে কিছু ক্ষতি হয় না। এজাতীয় গবেষণার চমক কাহিনীর রূপসজ্জাকে অকারণে দৃষ্টিকটু করে। উদয়পুরী যে-দেশের বা যে-ধর্মের নারীই হোক না কেন, এই মোহিনীর বিচিত্র জীবন, কর্মকুশলতা, ক্ষুরধার বুদ্ধি শাহজাদা দারার হারেম থেকে আওরঙ্গজেবের সহচরীরূপে, কিংবা কূটকৌশলের মূর্ত প্রতীকরূপে মোগল সাম্রাজ্যের এক জটিল অধ্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সম্রাট শাজাহানের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সন্তানকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল এবং মারাত্মকরূপে মোগল সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তাদের নিয়ন্ত্রিত করেছিল। লেখকের রচনাশৈলী উয়দপুরীকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

শাহজাদা দারা, আওরঙ্গজেব, আফজল খাঁ, আদিল শাহ, ওসমান বেগ, উমাকান্ত, শংকর, শিবাজী, প্রতাপনারায়ণ, সিপিহর শিকো, দিলরসবানু, রহমত-উন-নিসা, জাহান আরা, রোশন আরা, ইন্দুমতী এবং আরও বহু নরনারীর ভিড়ের মধ্যে কাহিনী কখনও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে নি, সমগ্র কাহিনীর প্রবহমানতাও মন্থর হয়ে পড়ে নি। সুরাসক্ত সুন্দরী হীরাবাঈয়ের কাছে আওরঙ্গজেবের মতো দুর্দমনীয় মানুষও সাময়িক পরাজয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। ভারতের ভাবী শাহানশাহের ক্ষুরধার বুদ্ধি, কূটনীতি আর অনমনীয় ব্যক্তিত্ব এই একটি রূপসীর ছলাকলায় পর্যুদস্ত হয়েছে। নিঃসঙ্গ আওরঙ্গজেবের জীবনে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো যে-প্রেমের স্ফুরণ হয়েছিল তা লেখকের সুনিয়ন্ত্রিত লেখনীর স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শিল্পনৈপুণ্যের জোরে অতীতও যে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ মেলে 'শাহানশাহ'তে।

'শাহানশাহ'-এর মতো একখানি সুন্দর উপন্যাসে অজস্র বানান ভুল প্রত্যাশিত নয়। ছাপা এবং বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে এমন অবহেলার দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

জীবনবল্লভ চৌধুরী

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অন্বেষা

M. N. Roy : Philosopher-Revolutionary Ed. by Sibnarayan Roy. Rennaissance Publishers, Calcutta. Rs. 40.

১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে চাঙরিপোতা (বর্তমানে সুভাষগ্রাম) রেলস্টেশনে, যাকে সে যুগে বলত স্বদেশী ডাকাতি, সফলভাবে তা সমাধা করেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ১৯১৫ সালের এপ্রিলে জারমান প্রতিনিধির সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে বাটাভিয়া (এখন জাকারতা) যাত্রা করেন চারলস মার্টিন। এঁরা একই ব্যক্তি। ১৯১৬ সালে সান ফ্রানসিসকোতে এবং নিউ ইয়রকে দেখা যায়, লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে এবং মারকিন বামপন্থী রাজনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। সেই তিনিই।

নামধাম বদলাতে হয় পুলিসের চোখ এড়াবার জন্যে, কিন্তু মানুষ নিজেও বদলে-বদলে যায়—অন্য এক তাগিদে। মোহজাল কাটতে থাকে, নতুন দৃষ্টি খুলে যায়, অন্য দিক থেকে অন্য আলো এসে পড়ে সমাজ-সংসারের উপর। পুরাতন অভ্যস্তের মায়া কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হয় সামনের দিকে। পথের সঞ্চয়/দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়—ব্যারিসটার সাহেবকে হ্যাট-কোট-টাই, ছুরি-কাঁটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হাফ-নেকেড ফকির বনতে হয়।

চাঙরিপোতা ডাকাতির পর তল্লাসি চালিয়ে যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে পুলিশ উদ্ধার করে 'মায়ের আহ্বান' ("এই দেবভূমি, এই আর্যভূমি আজ বিদেশী অধ্যুষিত, হে ভারতবাসী ভাইগণ, আর কত দিন নীরবে এই পৈশাচিক অত্যাচার সহ্য করিবে? গোমাতা, যিনি দেবতাদেরও পূজ্যা, আমাদের মাতৃভূমিতে তাঁহার নিধন চলিতেছে। আর কত কাল নির্বিকার চিত্তে সহ্য করিবে এই নিপীড়ন?"), ১৩ বছর পরে, বারলিন থেকে মসকো যাত্রার পূর্বে, তিনিই এম. এন. রায় নামে লেখেন:

"আজ ভারতীয় আন্দোলনে দুটি প্রবণতা—নীতি এবং লক্ষ্যের দিক সে দুটি পৃথক। জাতীয়তাবাদীরা স্বশাসিত ভারতবর্ষের কথা ঘোষণা করে, এবং অস্পষ্ট গণতান্ত্রিক কর্মসূচির ভিত্তিতে, অথবা কোনো কর্মসূচি ছাড়াই, জনসাধারণকে বিদেশী শোষকদের উৎখাত করার জন্য উত্তেজিত করে। যথার্থ বৈপ্লবিক আন্দোলনের লক্ষ্য শ্রমিকদের অর্থনৈতিক মুক্তি, আর এই আন্দোলন শ্রেণীসচেতন শিল্প-প্রলেতারিয়েত এবং ভূমিহীন কৃষক-সমাজের ক্রমবৃদ্ধিশীল শক্তির উপর নির্ভর করে। এই শেষোক্ত আন্দোলন বুরজোয়া নেতাদের সাধ্যের অতীত; একমাত্র সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই এই আন্দোলন সার্থকতা লাভ করতে পারে। যাঁরা দ্বিতীয় আন্দোলনের কর্মী, এই ইশতাহার তাঁদের জন্য রচিত। আমরা জগৎকে জানাতে চাই যে জাতীয়তাবাদ বুরজোয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু জনসাধারণ সামাজিক বিপ্লবের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন।" —একটি ভারতীয় কমিউনিস্ট ইশতাহার, ১৯২০। (ইংরেজি থেকে অনূদিত)।

১৯০৭ থেকে ১৯২১, তারপরে আবার ১৯২১ থেকে ১৯৪৬। জাতীয়তাবাদ থেকে কমিউনিজম, কমিউনিজম থেকে নবমানবতাবাদ।

১৯৪৬-এর মে মাসে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির স্টাডি ক্যামপে রায় উপস্থাপন করলেন "নতুন দিক-নির্দেশ", এবং যুগপৎ খারিজ হল বুরজোয়া উদারনৈতিকতা এবং মার্কসবাদ। তারপর ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতা অধিবেশনে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিরই অবসান, আবাহন র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিসট মুভমেনটের।

বেড়ে-ওঠার প্রয়োজনেই সাপকে খোলস পালটাতে হয়। একদিন যে খোলসটি তাকে রক্ষা করে, পরের দিন সেটিই হয় তার প্রতিবন্ধক, তাকে বন্দী করে রাখতে চায় বর্তমানের কারাগারে। মানবেন্দ্রনাথ রায় জীবনের পর্বে পর্বে নিজেকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর জীবনের ঘটনাপঞ্জীর দিকে তাকালে বিবর্তনের রূপরেখাটা স্পষ্ট দেখা যায়। আবার, আরেকটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রগতির পথটা গিয়েছে এমন একটা অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে, প্রথম থেকেই যার একটা ধারণা, অস্পষ্ট হলেও, তাঁর মনের মধ্যে গাঁথা ছিল। নিজের কথা বলতে গিয়ে রায় তাঁর সব চাওয়ার ওপরে সেই পরম চাওয়াটির কথা জানিয়ে দিয়েছেন: "চোদ্দ বছর বয়সে ইস্কুলে পড়বার সময়ে আমি যখন আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু করি (তার শেষে হয়তো দেখা যাবে কিছুই হল না) তখন আমি চেয়েছিলাম বন্ধনমোচন।"

চোদ্দ বছরের সেই কিশোরের চোখে বিদেশী শাসনের বন্ধনটাই সবচেয়ে বড়ো ছিল ঠিকই, কিন্তু জীবনযাপনের অসহনীয় অবস্থা থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির সংগ্রামও যে তাঁর চোখে ছোটো ছিল না, সে কথাও তিনি নিজেই বলেছেন: "আমি আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলাম সেই আদর্শ নিয়ে, আর 'ক্যাপিটাল'-এর তিন খণ্ড বা মার্কসের তিন শ খণ্ডের চেয়ে সেই আদর্শ থেকেই এখনও প্রেরণা লাভ করে থাকি।"

রায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী অধ্যাপক জি ডি পারিখ বলেছেন, "যে 'মার্কসবাদ' রায়কে অনুপ্রাণিত করেছিল তার প্রেরণার উৎস ছিল এই বিশ্বাস: সমাজের বন্ধনমোচন হতে পারে তার প্রত্যেকটি ব্যক্তির মুক্তির দ্বারা,

"দ্যাট দ্য সোস্যাল অর্ডার উইল বী দ্য ভল্যানটারি অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্রী মেন, অল কনট্রিবিউটিঙ টু দ্য মিউচুয়্যাল সাবসিসটেনস অ্যানড মিউচুয়্যাল প্রোগ্রেস; দেয়ার উইল বী এ নিউ কালচার, এ নিউ সিভিলাইজেশন। দ্য হিউম্যান রেস উইল ওপন এ নিউ চ্যাপটার ইন ইটস হিসট্রি।"

মানবজাতি তার ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে, বন্ধনমুক্ত স্বাধীন মানুষ বন্ধনমুক্ত স্বাধীন সমাজে নতুন এক সভ্যতার জন্ম দেবে, যার ভিত্তি হবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা, পরস্পরের সংযোগে সামগ্রিক অগ্রগতি—এই এক গভীর বিশ্বাস সারা জীবন মানবেন্দ্রনাথকে পথের অন্বেষণে নিয়োজিত রেখেছে। বাঁধা সড়ক ধরে এগোতে গিয়ে দেখেছেন গন্তব্য থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন, সঙ্গী যাঁদের পেয়েছিলেন তাঁদের চোখ অন্য দিকে ফেরানো। তখন আবার যাত্রা আরম্ভ করতে হয়েছে অন্য পথে ত্যাগ করতে হয়েছে অভ্যস্ত সাহচর্যের আশ্বাস। শেষ পর্যন্ত দলীয় রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে সরে আসতে হয়েছে সমাজ-পুনর্গঠনের এমন একটা আন্দোলনের দিকে যার মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি, চেতনার উন্মেষ, বিচারবুদ্ধির পরিপোষণ ইত্যাদি অরাজনৈতিক লক্ষ্যই প্রাধান্য পেয়েছে।

রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছবার বাঁধা রাস্তা রায় আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপর যখন বুঝলেন সেই লক্ষ্যটাই ভুল, যখন বুঝলেন রাষ্ট্রযন্ত্র হস্তগত করা নয়—তলার দিক থেকে সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলাই তাঁর সত্যিকারের সাধনা, তখন দল রূপান্তরিত হল সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। এই আন্দোলনের পথ সামনে দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত, এর অভীষ্ট লক্ষ্য অনির্দেশ্য ভবিষ্যতে বিলীন। সেই জন্যেই সম্ভবত তিনি বলেছেন, শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়তো হবে না।

বলেছিলেন হয়তো আরও এই কারণে যে, চোখের সামনে তিনি দেখেছেন—সংগঠন গড়ে তোলবার তাগিদে এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদগ্র কামনায় সংগঠনের উদ্দেশ্য কোথায় হারিয়ে যায়, দেখেছেন—প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন প্রতিষ্ঠানটাকেই বড়ো করে দেখতে শুরু করে, যেন নিজস্ব প্রাণধর্মেই গ্রাস করতে চায় সব চিন্তাভাবনা, দ্বিধাসংশয়। তার কলেবর বাড়ে, তার শক্তি বাড়ে। মনে হয়, এই তো সাফল্য, এই তো সার্থকতা। অথচ, আসলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেটা যে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, সে দিকে কারো দৃষ্টি দেবার অবকাশ থাকে না।

রায় দেখেছিলেন, মার্কসবাদের মৌলিক প্রেরণা থেকে সমাজবাদী রাষ্ট্র কত দূরে সরে যাচ্ছে; দেখেছিলেন, সমাজতন্ত্র কেমন ভাবে শাসনযন্ত্র দখল করবার এবং দখলে রাখবার তাগিদে ব্যক্তিকে খাটো করে আনছে। তার আগে তিনি দেখেছিলেন—জাতীয়তাবাদ বাধা সৃষ্টি করছে মানুষের অগ্রগতির পথে, দৃঢ়মূল করছে সামাজিক অন্যায় এবং শোষণ। এসব দেখে যে প্রশ্নটা তাঁর কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল সেটা—যত দূর অনুমান করতে পারি—এইরকম: কোন্ ভিত্তির উপর দাঁড় করালে মানুষের সংগঠিত প্রয়াসকে যথার্থ মানবকল্যাণের অভিমুখে চালনা করা যায়? শেষ পর্যন্ত, এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর অবশিষ্ট থাকল: ব্যক্তির নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর, এবং নৈতিক বোধের ওপর।

বস্তুবাদী দার্শনিক হিসেবেও তিনি মানুষের নৈতিক চেতনার ভিত্তিভূমি খুঁজে পেলেন তার যুক্তিবাদী প্রকৃতির মধ্যেই। যুক্তিবাদী মানুষ নৈতিক-চেতনাসম্পন্ন। নিজের যুক্তিবাদী মন এবং নিজের নৈতিক চেতনা তাকে ক্রমাগত নিজের কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে—যদি তার যুক্তিবোধকে সক্রিয় রাখা যায়, যদি তার নৈতিক চেতনাকে জাগ্রত রাখা যায়। ব্যক্তির মুক্তি ছাড়া সমাজের মুক্তি অলীক কল্পনা, স্ববিরোধী ধারণা। তেমনি আবার, জাগ্রত এবং ক্রিয়াশীল ব্যক্তিগত চেতনা ব্যতিরেকে সমষ্টিগত অগ্রগতি অর্থহীন। এ চিন্তাটা ঠিক রাজনীতিকের চিন্তা নয়। রায় সে অর্থে রাজনীতিক ছিলেন না কোনো দিনই। যখন তিনি মার্কসবাদে মানবমুক্তির সন্ধান করেছিলেন, তখনও নিজের বিচারশীল মনটাকে সাংগঠনিক স্বার্থে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে রাজি ছিলেন না। লেনিনের সঙ্গে তাঁর যে মতবিরোধ হয়েছিল, তার বিষয়বস্তু আজ আমাদের চোখে অতীত ইতিহাসে পরিণত। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকে যে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয়, তার গুরুত্বও এখন আর সাংঘাতিক কিছু মনে হয় না।

আসলে, অস্বীকার করার উপায় নেই, সমাজবাদী শাসনতন্ত্র যেমন সমাজতান্ত্রিক দেশে মার্কসবাদ থেকে অনেকটা সরে এসেছে, রায় নিজেও তেমনি অন্যবিধ কারণে মার্কসবাদ থেকে সরে গিয়েছিলেন অনেক দূর। যে পথে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র, অর্থাৎ সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রতন্ত্র, তার থেকে বহু যোজন দূরে রায়ের পথ। মার্কসবাদীরা বলেন, রায় রোমানটিক

কল্পনাবিলাসী — সমাজকে ছাপিয়ে ব্যক্তিকে বড়ো বেশি উঁচু আসনে বসাতে চেয়েছিলেন। এতে কোনো ভুল নেই—রায় স্বপ্ন দেখেছিলেন। হেনরি ডেভিড থরো বলেছিলেন, আকাশে দুর্গ নির্মাণ করতে চাইলে তাতে দোষের কিছু নেই, আকাশেই তার স্থান। শুধু, তার নীচে ভিত্তিটা স্থাপন করো। রায় তাঁর শেষ জীবন নিয়োজিত করেছিলেন সেই ভিত্তি তৈরির কাজে।

আর, রায় যদি স্বপ্নবিলাসীই হয়ে থাকেন, কঠোর বাস্তববাদীদের স্কন্ধে বাহিত হয়ে মার্কসীয় তত্ত্বই বা আজ কোন্ বাস্তব স্বর্গের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় এই সংকলনটিতে অতি অল্প পরিসরে এমন এক ব্যক্তিত্বকে পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছেন যিনি অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন না—যিনি বড়ো করে ভাবতেন, বড়ো কিছু চাইতেন।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা

শিখ নেতাদের নিয়ে ভাবনা

আজ হোক, কাল হোক, ধর্মীয় সংগঠনের যাঁরা প্রধান একদিন তাঁদের বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতার সঙ্গে আহার-বিহার করতেই হবে। দুনিয়া আমাকে একঘরে করতে পারে বলে আমি যদি মনে করি, আমিও দুনিয়াকে একঘরে করতে পারি, তা হলে সে ভুলের দরুন লোকসানটা শেষ পর্যন্ত আমারই ওপর এসে পড়বে।

শিখদের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতারা, কিংবা বোধহয় বলা উচিত ধর্মীয়-রাজনৈতিক নেতারা, যেসব দাবি নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামের সংকল্প মুহুর্মুহু ঘোষণা করছেন, একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, শিখসমাজের মুখ পিছন দিকে ফিরিয়ে দেওয়াই তার সত্যিকারের উদ্দেশ্য। আসলে, তাঁরা নিজেরাও মনে-মনে জানেন, এ এক অসাধ্যের সাধনা, এ লড়াই যার সঙ্গে তা হল সময়ের স্রোত, কোনো ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ যাকে আটকাতে পারে না।

নিজেরাও জানেন, তাই আধুনিক স্লোগানের ছদ্মবেশ পরিয়ে অতিক্রান্ত কালকে ফিরিয়ে আনতে চান। তাই মুখে বলেন চণ্ডীগড় চাই, নদীর জল চাই, রাজ্যের হাতে ক্ষমতা বেশি চাই ; আর মনে-মনে জানেন, আসলে যা চাই তা হল সপ্তদশ শতাব্দীর পুনরুদ্ধার, ধর্মীয় সংগঠনের হাতে রাজশাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রত্যর্পণ।

আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাবের দুটি দাবি একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে এই উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। (১) খালসার একাধিপত্য (খালসাজি দে বোল বালে), পন্থের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা ; (২) বৈদেশিক সম্পর্ক প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যতীত আর-সব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্ব-শাসিত শিখরাজ্যের প্রতিষ্ঠা, যার অধিকার থাকবে নিজস্ব সংবিধান রচনার।

অথচ, আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাব স্বীকার করে না নিলে সরকারের সঙ্গে কোনো আলোচনাই সম্ভব নয়—একথা যে নেতারা বলছেন, তাঁরাই আবার সর্বত্র বলে বেড়াচ্ছেন—আমরা খালিস্তানের দাবির বিরোধী, আমরা অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ ভারত রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। তার মানে, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে রচিত সংবিধান যার মৌলিক আইন, সেই ভারত-রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের আনুগত্য অটুট থাকবে, আবার আমার আলাদা সংবিধানও থাকবে, যাতে স্বীকৃত হবে আমার ধর্মীয় সংগঠনের একাধিপত্য। এর চেয়ে বরং খালিস্তানের দাবি ছিল ভালো। কী ধরনের রাজত্ব শিখ ধর্মীয় রাজনীতির এই নেতারা চাইছেন, সেটা তা হলে সকলের চোখে স্পষ্ট হত। আধুনিকমনা শিখরাও তা হলে স্পষ্ট দেখতে পেতেন —কোন্ অতীত যুগের দিকে তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন এই নেতারা।

তাঁরা খালিস্তান চাই না যেমন বলছেন, তেমনি আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাবের একটি সম্পূর্ণ এবং অবিসংবাদিত বয়ানও পাঁচ জনের সামনে ধরে দিতে, মনে হয়, সংকোচবোধ করছেন। তা তাঁরা না দিন, তাঁদের কথাবার্তার আড়াল থেকে আনন্দপুর সাহেবের আসল চেহারাটাকে সর্বদাই উঁকি-ঝুঁকি মারতে দেখা যাচ্ছে।

সাপ্তাহিক 'সানডে' পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে সন্ত হরচাঁদ সিং লঙ্গোয়ালকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : মনে করুন, সরকার (নভেম্বর) দাঙ্গা নিয়ে তদন্তের আদেশ দিলেন, জেল থেকে শিখদের ছেড়ে দিলেন, চণ্ডীগড় পনজাবকে দিলেন, এবং অন্য সমস্ত বিষয় বিবেচনা করবার জন্যে কমিশন নিয়োগ করলেন। তা হলে আপনার প্রতিক্রিয়া কী হবে?

সন্ত লঙ্গোয়াল এত সাবধানে পা ফেলে-ফেলে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, যেন পাছে একটা মাঁমাংসার ফাঁদে পড়ে যান, সেই ভয়টাই তাঁর কাছে বেশি ভয়ংকর। তিনি বললেন : তখন আমাদের বিবেচনা করতে হবে, শিখজাতি সন্তুষ্ট হল কিনা।

আবার প্রশ্ন : কিন্তু এইসবই তো আপনাদের দাবি। সরকার যদি শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেন, এসব দাবি মেনে নিলেন, তা হলে আর বাধা কী থাকে?

পাশে বসেছিলেন সরদার সুরজিৎ সিঙ্ বারনালা। তিনি আগ বাড়িয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন : তা যদি হয়, তবে তো ব্যাপারটা মিটেই গেল। আমরা তো আর লড়াই করব বলে লড়াই করছি না।

এইটুকু বলেই কিন্তু তিনি থামলেন না। আরেকটা ছোটো কথা তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন : আনন্দপুর প্রস্তাব সরকার মেনে নিন।

অর্থাৎ, পনজাব রাজ্যের জন্যে যেসব দাবি, অর্থাৎ চণ্ডীগড়, নদীর জলের ভাগ ইত্যাদি, যে দাবি শুধু অকালিরা কেন, শুধু শিখরা কেন, শুধু পনজাবিরা কেন, আরও অনেকেই ন্যায়সংগত বলে মনে করেন, সেগুলো মিটলেই হবে না, অকালি দলের নেতৃত্বাধীন শিখজাতিকে, খালিস্তান নয়, এমন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকার দিতে হবে, যার সঙ্গে খালিস্তানের প্রভেদ চালভাজার সঙ্গে মুড়ির মতো।

দেশে বিদেশে

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পঞ্চমাংশে এসে, ধর্মীয় সংগঠনের ছত্রতলে নিজস্ব ধর্মতান্ত্রিক রাজত্বে বাস করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন ভারতের এক শক্তিশালী, সমৃদ্ধ, অগ্রগামী জনসম্প্রদায়ের পক্ষে? প্রধানত দুটি কারণের কথা শোনা যাচ্ছে : (১) নিরাপত্তাবোধের অভাব, (২) নিজস্ব ধর্মের এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্যের হানির আশঙ্কা।

জাতীয় শিখ ফোরামের আহ্বায়ক সামরিক বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত লেফটেনান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিঙ অরোরা ওই 'সানডে' পত্রিকাতেই প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেছেন : যে প্রশ্ন আজ শিখরা জিজ্ঞাসা করছেন তা হল : নভেম্বরে যা হয়েছিল সেরকম ঘটনা যদি আবার ঘটে, সরকার কি তাঁদের রক্ষা করবেন? কোন্ দিকে ঘটনা মোড় নেবে, কেউ বলতে পারে না।

জেনারেল অরোরা আরও বলেছেন : আমি শুনেছি বহুসংখ্যক যুবক, এবং যাঁরা যুবক নন তাঁরাও অনেকে পাকিস্তানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু কেন? শুধু এই কারণে যে, তাঁদের ধারণা, পুলিস যে-কোনো সময়ে তাঁদের ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তারপর তাঁদের কী হবে—ছেড়ে দেওয়া হবে, না খতম করা হবে—সে বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই। সত্যি কথা বলতে কি, পনজাবের শিখদের মনে নিরাপত্তাবোধ বলতে এখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

ভারতের এক রাজ্যে যদি সত্যি-সত্যিই এই অবস্থা হয়ে থাকে (জেনারেল অরোরা শোনা কথা বলেছেন, নিজে এর সত্যতা যাচাইয়ের কোনো চেষ্টা করেছেন কিনা বলেন নি), তা হলে সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা বিস্ময়কর। অবশ্য পনজাবে তিনটি জেলায় সামরিক বাহিনী এখনও মোতায়েন, এবং বিশেষ আদালত আইন সে রাজ্যে এখনও বলবৎ। এই ব্যবস্থা নিপীড়নের সহায়ক, এবং যথাশীঘ্র সম্ভব এর অবসান দরকার। তবু অস্বাভাবিক অবস্থায় অস্বাভাবিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন যদি মেনেও নিতে হয়, যুবকেরা সরকারি জুলুমের ভয়ে দলে-দলে দেশত্যাগ করছেন, এ খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া উচিত ছিল, এবং এ নিয়ে যথোপযুক্ত শোরগোল ওঠা উচিত ছিল। আর, যদি আমাদের দেশের খবরের কাগজ—(বেতার-দূরদর্শনের কথা বাদ দিতে হয়, কেননা সরকারনিয়ন্ত্রিত সংবাদ-মাধ্যম আসলে প্রচার-মাধ্যম) এ বিষয়ে জেনে-শুনে চোখ বুজে থেকে থাকেন, তা হলে সেও খুব ভাবনার কথা, এবং সে অবস্থায় নিগৃহীত কোনো জনসম্প্রদায় অবশ্যই মনে করতে পারে—দেশে থেকেও তারা পরবাসী। যাই হোক, খবরের কাগজ এ নিয়ে সত্যিকারের খবর সংগ্রহ করবার কাজে নামুক বা না নামুক, দেশে যে সমস্ত ন্যায়বিচারসংক্রান্ত এবং নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের আশু কর্তব্য জেনারেল অরোরার উত্থাপিত অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করা। ধরে নেওয়া উচিত, তাঁর মতো লোক যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞান-সহকারেই অভিযোগটি তুলেছেন।

নিরাপত্তাবোধের অভাবের মস্ত বড়ো একটা কারণ হতে পারে গত নভেম্বরে দিল্লির দাঙ্গাহাঙ্গামা। ইন্দিরা গান্ধীর নিধনের সঙ্গে-সঙ্গে শান্তিরক্ষার জন্যে এবং বিশেষ করে শিখদের নিরাপত্তা-বিধানের জন্যে যে ব্যাপক সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল, তা নিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে সকলেরই ধারণা, এবং তার সঙ্গে আরও অনেক সন্দেহ এবং অভিযোগ লোকের মনে জমে আছে। সদ্যোনিযুক্ত বিচার-বিভাগীয় তদন্ত কমিশন এ বিষয়ে সত্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন, এবং ভবিষ্যতে এই ঘোরতর কলঙ্কজনক ঘটনার মতো কিছু আবার যাতে দেখতে না হয়, তার জন্যে উপযুক্ত সুপারিশ করবেন : আমরা আশা করি। এই তদন্ত কমিশনের নিয়োগ অকালিদের একটি প্রধান দাবি ছিল, এবং অকালিরা নিশ্চয় লক্ষ করে থাকবেন, এ দাবি ছিল দেশে প্রায় সার্বজনীন, জাতি-ধর্ম-দল-সম্প্রদায়নির্বিশেষে। সরকার যদি এ বিষয়ে অযথা দেরি করে থাকেন, সেটা সরকারেরই ত্রুটি, অ-শিখ জনসাধারণের নয়। কাজেই, দিল্লির দাঙ্গার প্রত্যক্ষ ফল যদিও শিখদের মনে নিরাপত্তা-বোধের বিনাশ, তার পরোক্ষ ফল দেখা যাচ্ছে, দেশব্যাপী ঐকতানে ধ্বনিত বিচারের দাবির মধ্যে গভীরতর নিরাপত্তার আশ্বাস। সরকার দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হতে পারেন; প্রতিবেশীরা ক্ষণিকের উন্মত্ততায়, দূরভিসন্ধিপরায়ণের প্ররোচনায় শুভবুদ্ধি হারাতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ যখন সমস্বরে কোনো জনসম্প্রদায়কে হানা আঘাতের প্রতিকার চায়, তখনই বোঝা যায় নাড়ির টান একটা ছিল। তখনই, দুঃস্বপ্নের রাত পোহালে যে আলো ফোটে, সেই আলোতেই স্পষ্ট দেখা যায়, আমরা একা নই, বিচ্ছিন্ন নই, অসহায় নির্বান্ধব নই।

দ্বিতীয় যে কারণে শিখদের নিজস্ব-ধর্মশাসিত নিজস্ব রাজ্যের প্রয়োজন বলে শোনা যাচ্ছে, তা হল : তাঁদের ধর্মকর্ম, তাঁদের নিজস্ব জীবনধারা, এমন-কি জাতিগত পরিচয় বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ধর্মের হানি, বৈশিষ্ট্যের বিলোপের আশঙ্কা।

অনশন-অধ্যুষিত এই বিশাল দেশে শিখধর্ম বিপন্ন, এমন কোনো আশঙ্কা-জনক লক্ষণ যদি আমরা অ-শিখরা দেখতে না পেয়ে থাকি, অকালি নেতারা আমাদের ক্ষমা করবেন। অন্তত, বাইরে থেকে শিখধর্মের ওপর এমন গুরুতর কোনো আক্রমণের কোনো চিহ্নই চোখে পড়ে না, যাতে শিখদের ধর্ম (যার প্রাণপ্রাচুর্য, যার সমৃদ্ধিই বরং আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে) অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে লোপ পেতে পারে।

আর, ভিতর থেকেই যদি তেমন কোনো বিপদের লক্ষণ তাঁদের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতারা দেখে থাকেন, তার প্রতিকার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে করা যাবে কিনা, খুবই সন্দেহ। ধর্মীয়

নেতারা মনে করতে পারেন, এইভাবে ধর্মের শাসন কায়েম হবে, বিজাতীয় প্রভাব নিবারিত হবে, ধর্মীয় অনুশাসনের আওতা থেকে বেরিয়ে আসবার যে প্রবণতা সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই কমবেশি লক্ষ করা যাচ্ছে, তা রোধ করা যাবে। আসলে তা হবার নয়। সমস্যাটা বাস্তব, ভয়ের কারণটা বাস্তব, কিন্তু এর সমাধান, এই বিপদের হাত থেকে নিস্তার ধর্মতান্ত্রিক রাজ্য স্থাপন করে পাওয়া যাবে না।

প্রচারের দ্বারা কতটা সম্ভব, মানুষের ধর্মচেতনা জাগিয়ে তুলবার এবং জাগিয়ে রাখবার নতুন-নতুন কী উপায় উদ্ভাবন করা যায়, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। অসম লড়াই তো বটেই। প্রতিপক্ষ অমিতশক্তিশালী। এযুগের যুবককে এযুগের চিন্তাভাবনা, এযুগের বিজ্ঞান, এযুগের প্রযুক্তিপ্রভাবিত জীবনযাত্রা আকর্ষণ করবেই। তবে সংগঠিত ধর্মের আকর্ষণও নেহাত দুর্বল নয়, বংশানুক্রমে প্রাপ্ত বিশ্বাসের টানও সহজে অগ্রাহ্য করবার নয়। দেখে-শুনে তো মনে হয়, যত দিন চন্দ্রসূর্য থাকবে ততদিন পাঁচজনের সঙ্গে মিলে ধর্মাচরণও থাকবে, পাঠ থাকবে, পুজো থাকবে, প্রার্থনা থাকবে, প্রসাদবিতরণ থাকবে, এবং এ-সমস্ত পরিচালনার জন্যে সংগঠন আর তার প্রধানেরা থাকবেন।

মানুষের জীবনে এসবের প্রভাব কখনো বাড়বে, কখনো কমবে। নানা কারণে এই হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ দেখা যায়, বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা। মনে হয় : শিখদের ধর্মীয়-রাজনৈতিক এই নেতারা এইরকম একটা আশঙ্কা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে চাগিয়ে তুলতে চান। কিংবা, হয়তো চেয়েছিলেন, এখন ধীরে-ধীরে নিজেদের ভুলটা বুঝতে আরম্ভ করেছেন। তাই সন্ত লঙ্গোয়াল বারে-বারে বলছেন আমরা অখণ্ড ভারতই চাই, অখণ্ড ভারতেই থাকতে চাই। আমাদের নিরাপদে সসম্মানে, স্বধর্মে নিষ্ঠা বজায় রেখে থাকতে দেওয়া হোক।

আবার চাপ আসছে উগ্রপন্থীদের দিক থেকে। তখন সুর পালটাতে হচ্ছে, তখন হত্যাকারীকে শহীদ বলে সম্মান জানাতে হচ্ছে। স্বর্ণমন্দিরে মারণাস্ত্র জমায়েত করার সপক্ষে সাফাই গাইতে হচ্ছে। একদিকে আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাব পেছনে টেনে রাখছে, আরেক দিকে সারা দেশের জনমতের দিকে তাকিয়ে সরকারের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়ার কথাও ভাবতে হচ্ছে।

যত শীঘ্র এঁরা উপলব্ধি করেন, ভারতের সংবিধান স্বীকার করে ভারতের মধ্যেই থাকতে হবে, এবং অতীতের দিকে নয়, ভবিষ্যতের দিকেই তাকাতে হবে, ততই মঙ্গল।

জেনেভায় অগ্রগতির বাধা

জেনেভাতে অস্ত্রহ্রাস এবং অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ চুক্তি নিয়ে রুশ-মারকিন আলোচনা চলছে। এ পর্যন্ত তাতে অগ্রগতির কোনো খবর পাওয়া যায় নি। বলতে কি, আলোচনা নিয়ে কোনোরকম আলোচনাই বড়ো একটা শোনা যাচ্ছে না, কারণ খবরাখবরের একান্ত অভাব।

তবে, আলোচনার প্রারম্ভে দু পক্ষের সম্ভাব্য বক্তব্যের যতটা আঁচ পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হয়েছে, চুক্তিসম্পাদন খুব সহজ হবে না।

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে, আলোচনা এই পথে এগোনো উচিত :

উভয় পক্ষের অস্ত্রসম্ভার দস্তুরমত কমিয়ে আনতে হবে, সমান করে আনতে হবে, এবং লক্ষ্য হবে—একেবারে শূন্যতে নামিয়ে আনা।

চুক্তির ফলে যেন দেখা যায়, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সামগ্রিক সামরিক শক্তি একই স্তরে নেমে এসেছে।

এমন চুক্তি প্রয়োজন যার ফলে পরস্পরের শক্তি সঠিকভাবে যাচাই করবার ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের অতীত অভিজ্ঞতা নাকি বলে, যাচাইয়ের প্রশ্নেই চুক্তির আলোচনা আটকে যাচ্ছে। আমেরিকা যাচাইয়ের ব্যবস্থায় রাজি, কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্কেই সন্দেহ।

এদিকে সোভিয়েত মনোভাব, সংক্ষেপে : অস্ত্রহ্রাসের প্রয়োজন তাঁরাও স্বীকার করেন, কিন্তু অন্তরীক্ষে স্থাপিত অস্ত্রের ওপর তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন।

তাঁদের মতে, যেহেতু সামরিক উদ্দেশ্যে অন্তরীক্ষের ব্যবহার আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী নিষিদ্ধ, অতএব এ সংক্রান্ত মারকিন উদ্যোগ বন্ধ হওয়া আগে প্রয়োজন।

এই মারকিন উদ্যোগটির কথা আমরা গত মাসে আলোচনা করেছিলাম। এর দ্বারা সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের চেষ্টা করা হবে। আমেরিকার মতে, এ অস্ত্র হবে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক। এতে রাশিয়ার ভয়ের কিছু নেই।

রাশিয়ার মতে, ভয় এই যে, এর ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার অস্ত্র অকেজো হবে, সোভিয়েত সামরিক ক্ষমতা বরবাদ হবে, অস্ত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। এ বরদাস্ত করা যায় না, এর ব্যবস্থা আগে করতে হবে।

আমেরিকা বলছে, কোথায় আমাদের মহাকাশস্থাপিত রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী অস্ত্র তার ঠিক নেই, সেসব তো এখন ভবিষ্যতের গর্ভে, তার কথা ছেড়ে দিয়ে যেসব অস্ত্র এখনই ভূপৃষ্ঠে বর্তমান, তাই কমাবার কথাবার্তা আরম্ভ করা যাক।

সোভিয়েত রাশিয়া ভবিষ্যতের দিকে পেছন ফিরতে নারাজ।

অতএব অস্ত্র-আলোচনার অগ্রগতি কোন্ পথে হবে, আমরা বাইরের লোক তার কোনো হদিশ পাচ্ছি না।

২৯.৪.১৯৮৫

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সংগীত

আবার এসো শুভলক্ষ্মী!

শুভলক্ষ্মীকে আমি প্রথম যখন দেখি তখন আমার বয়স এতই কম যে কেউ যদি বলত তিনি স্বয়ং লক্ষ্মী, তাহলেও আমি খুব অবাক হতাম না। প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা বলছি। ভবানীপুর অঞ্চলের কোনো সিনেমা-হলে 'মীরা' ফিলমটি এসেছে। বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে আমিও দেখতে গেছি। সেই ফিলমের গান শুনে আমার মনে হয়েছিল—এ নিশ্চয়ই স্বর্গের কোনো পরী গাইছে। অবশ্য, সে বয়সে দেবী আর পরীর পার্থক্য কজনই বা বোঝে। 'মীরা' ছবিতে গাওয়া গানগুলি এখনও মনের মণিকোঠায় রয়ে গেছে ; চলতে-ফিরতে এখনও গুনগুন করে উঠি—'মুঝে চাকর রাখো জী', 'মেরে গিরিধারী গোপাল' বা 'কুঞ্জনবন ছাড়ি মাধব'। এই চল্লিশ বছর ধরে তাঁর প্রতি অনুরাগ গাঢ়তর হয়েছে।

অবশ্য এই চল্লিশ বছরে শুভলক্ষ্মীর-ও বিবর্তন হয়েছে আরো পরিণত। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর রেকর্ডও বেরিয়েছে। কয়েকটি আমার বাড়িতেও এসেছে। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ শহরে কিছুকাল থাকার দরুন শুনেছি সেবানগুডি শ্রীনিবাস আইয়ারের গান—যাঁর কাছে শুভলক্ষ্মী কিছুদিন নাড়া বেঁধেছিলেন। আইয়ারের গান প্রথমবার শুনে এক অদ্ভুত বোধ হয়েছিল—মনে হয়েছিল যেন অমাবস্যার রাতে এক প্রাচীন মন্দিরের চাতালে একলা বসে আছি। এই আদিমতা আর একাকিত্ববোধের সমন্বয় খেয়াল বা ঠুংরিতে কখনো পাই নি। অবশ্য সাংগীতিক 'জ'র' হিসাবে ভজন বা কর্নাটকী পুরাতনী থেকে পৃথক। কিন্তু তবু শুভলক্ষ্মীর ভজনে কর্নাটকী ধ্রুপদী সংগীতের রেশ রয়ে যায়, এবং তার সঙ্গে সমন্বয় ঘটে ভজনের সমর্পণের আর্তির।

পাশ্চাত্ত্য সংগীতের একটি উদাহরণ দিই। কর্নাটকী সংগীত আমায় বাখের অরগ্যান ফিউগ বা প্রিলিউডের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। যে অরগ্যানের আওয়াজের মধ্যেই একটি শাশ্বত, ধর্মীয় ভাব আছে, এটা কোনো নতুন কথা নয়। এমন-কি জীবনে প্রথম পাশ্চাত্ত্য ধ্রুপদী সংগীত শুনতে এসেছে, এরকম লোককেও একথা বলতে শুনেছি। তাই বাখ শুনে আমার ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে ইচ্ছা হয়েছে। তেমনই, সারা জীবন উত্তরভারতীয় সংগীতে অভ্যস্ত কান নিয়ে যখন কর্নাটকী সংগীত শুনতে গেলাম তখন মনে হল, এত দিনে সত্যি পেলাম পুজোর ফুলের পরশ, ধুপের গন্ধ। এক্ষেত্রে গান আর শুধু কালোয়াতি নয়—গান আর পুজো সমার্থক।

সে জন্যেই শুভলক্ষ্মীর গান শুধু শুনলে হয় না, তাঁকে গাইতে দেখতে হয়। দেখতে হয় তাঁর গৈরিক পোশাক, বিনম্র ভঙ্গি, আত্মনিবেদনের মুদ্রা। সংগীতকলামন্দিরের শুভলক্ষ্মীর অনুষ্ঠানে যোগদানের নিমন্ত্রণ পেয়ে তাই আনন্দ হয়েছিল। শুভলক্ষ্মীকে গাইতে দেখার একটা সুযোগ পেলাম। অনুষ্ঠানটিতে তাঁর একটি নতুন রেকর্ড এইচ. এম. ভি প্রকাশ করলেন। অবশ্য ওই রেকর্ডের মাত্র একটি গানই শুভলক্ষ্মী গেয়েছিলেন—'পেয়ারে দর্শন দি জে'। বাকিগুলির অধিকাংশই ছিল মীরার ভজন। আপন মনে, দিনান্তে মানুষ যেভাবে প্রার্থনা করে, এই অসাধারণ গায়িকা সেই দীনতায়, বিনম্র ভঙ্গিতে একের পর এক ভজন গেয়ে গেলেন। শেষদিকে গাইলেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা'—বাঙলায় এবং সংস্কৃতে। মনে পড়ে গেল, দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, এই গান তাঁর কাছেই শেখা। অবশ্য বাড়িতে এসে রেকর্ডটি শুনে একটু দমে গেলাম। রেকর্ডের শুভলক্ষ্মী যেন একটু ক্লান্ত। অথচ সেদিন কলামন্দিরে ক্লান্তি তো দূরের কথা, তাঁর গাওয়ার মধ্যে বয়সেরও কোনো ছাপ পাই নি। তাঁর মেয়ে রাধা যদিও তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তবু রাধার সাহায্য খুব বেশি দরকার হয় নি। অনেক গায়িকা সাধিকা হয়েছেন, অনেক সাধিকা গান গেয়েছেন, আমাদের গানের জগতে এ অতি সাধারণ ব্যাপার। সেদিন শুভলক্ষ্মীর গান ছিল নিছক বিনোদন ছাড়িয়ে আরো গভীর কিছু। বহুদিন গান শুনেছি, চট করে গান গেয়ে কেউ আমার চোখের পাতা ভেজাতে পারেন না। শুভলক্ষ্মী সেদিন পেরেছিলেন।

কর্নাটকী সংগীতের উপস্থাপনার মধ্যে একটা ফরমাল ব্যাপার আছে। খানিকটা আমাদের পুজোর পালার মতো—আরতির মতো। এ যেন গান গেয়ে কেউ আরতি করছে, পর-পর গান গেয়ে একটি বক্তব্য সাজিয়ে তুলছে। সেজন্য গলার সঙ্গে-সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে কর্নাটকী সংগীতে। সেদিন কলামন্দিরে ঘাটম্ (শব্দটি ইংরেজিতে যাকে বলে 'অনমেটোপিয়াক' শব্দ। ঘাটমের আওয়াজ আর উদ্দামতা ওই শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে) এবং মৃদঙ্গের অপূর্ব যুগলবন্দীটি এখনো কানে লেগে আছে। উদ্যোক্তারা বাদকদের নাম জানানোর প্রয়োজন বোধ করেন নি, তাই এখানে নাম দেওয়া গেল না। যাই হোক, এই দুই যন্ত্রের ঝংকার আর তান্ডবের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ভায়োলিনের সুর—বজ্রের আওয়াজের সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলকের মতো। কর্নাটকী ভায়োলিন সম্পর্কে একটা কথা বলা দরকার। বহুকাল আগে ভায়োলিন-রসিক এক বিদগ্ধ পাশ্চাত্ত্য সংগীতবিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা হয়েছিল। ওঁর মতে, ভারতীয় সংগীতজগতে একমাত্র কর্নাটকী সংগীতেই ভায়োলিন এক বিশেষ, নিজস্ব 'ওরিয়েনটাল' রূপ পেয়েছে। কথাটা খুব মনে লেগেছিল। কর্নাটকী ভায়োলিন শুনলে কথাটা আবার মনে পড়ে যায়। যদিচ মোৎসার্ট ভায়োলিনের মাধ্যমে কিছু তথাকথিত 'ওরিয়েনটাল' মিউজিক লিখেছিলেন, যেমন তার 'টারকিস' কনচেরটো বা অপেরা 'সরাগলিয়ো'—তবু কর্নাটকী ভায়োলিন একেবারে আমাদের আপন, নিজস্ব। যেন সেই টেনিসনের ব্রুকের পাশে আমাদের অলকনন্দা।

রেকর্ডটির (নম্বর ই সি এস ডি ৪১৫৬৫) নিন্দে করে শুভলক্ষ্মীকে ছোটো করতে চাই না। কিন্তু সত্যিই রেকর্ডটি, আগের দুটির তুলনায়ও, ভালো হয় নি। হয় সাউনড ইনজিনীয়াররা ব্যাপারটা ঠিকমতো ধরতে পারেন নি, অথবা কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটেছিল, যেজন্য শুভলক্ষ্মীর গলার মীড় আর সকরুণ মীরা ডাক এই রেকর্ডে ঠিকমতো আসে নি। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো সতর্কতা প্রয়োজন।

ধর্মীয় সংগীত অর্থাৎ স্পিরিচুয়ালস সম্পর্কে একটি কথা বলে শেষ করি। সংগীত আর ধর্মের সম্পর্ক আমাকে প্রায়ই ভাবিয়েছে। বাখের সংগীত কি শুধুই লুথারিয়ান ক্রিশ্চানদের জন্য? কোয়েকার না হলে কি মোৎসার্টের 'ম্যাজিক ফ্লুট' বোঝা যাবে না? সেদিন কলামন্দিরে আমার সঙ্গে ছিলেন এক বন্ধু—তিনি অতি ধর্মপরায়ণ মুসলমান। ছোটোবেলা থেকে আমার মতোই তিনিও শুভলক্ষ্মীর গান শুনে এসেছেন। সেদিন তাঁকে তন্ময় হয়ে ভজন শুনতে দেখেছি, চোখের জল ফেলতে দেখেছি। শুভলক্ষ্মীর সাফল্য এখানেই। মানুষকে কাঁদানোর ক্ষমতা আছে তাঁর।

কলকাতায় শুভলক্ষ্মী আবার কবে গাইবেন, তার অপেক্ষায় রইলাম।

কিশোর চট্টোপাধ্যায়

সিনেমা

রবীন্দ্রনাথ, ঘরে বাইরে, সত্যজিৎ রায় এবং কয়েকজন দর্শক

গত জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি যখন ঘরে বাইরে ছবিটি দেখতে গেলাম, মনে বেশ সংশয় নিয়েই হলটিতে বসে অপেক্ষা করছিলাম। নানা লোকের মুখে শুনেও ফেলেছি তখন যে, খ্যাতনামা পরিচালক এবারে একেবারে হতাশ করেছেন আমাদের, এত বছর ধরে পাঁয়তাড়া কষে তিনি কিনা অবশেষে এই দেখালেন—এই ধরনের মন্তব্য। নামকরা চলচ্চিত্রসমালোচক অমিতা মালিকের একটি দীর্ঘ, মোটামুটি নেতিবাচক সমালোচনাও আমাদের প্রসিদ্ধ ইংরাজি দৈনিকে তখন বেরিয়ে গেছে। তাই ঘর অন্ধকার করে দিয়ে কিছু পরে যখন ছবি শুরু হল, কেমন একটা হতাশ্বাস ভাব নিয়ে যেন চেয়ারের গভীরে এলিয়ে বসলাম—দেখা যাক, যা থাকে কপালে।

কিন্তু তেমন ভাবে তো বসে থাকা গেল না। আপনারা বিশ্বাস করুন, সেই যে উত্তেজনা আর সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ প্রথম দৃশ্য থেকেই শুরু হল, তাতে আমি পিঠ সোজা করে আগাগোড়া বসতে বাধ্য হলাম, চোখ আবদ্ধ রইল শুধু পরদার ওপর। এখানে বলে রাখা ভালো, সত্যজিতের ঘরে বাইরে দেখতে যাব বলে আগে থেকে আবার রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে আমি পড়ে ফেলে তৈরি হয়ে যাই নি। তা ছাড়া, আমার মন রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ অথবা ঘরে বাইরে বইটি সম্পর্কে কোনো প্রাজ্ঞ, অ্যাকাডেমিক অথবা সমাজনীতিক অনুশাসন তথা অনুশীলনে বাঁধা ছিল না কোনোদিনই। এতটা বয়সে এ কথাটা স্বীকার করতে লজ্জাও লাগে, সাহসও লাগে নিশ্চয়ই। তবু কথাটা বলছি একটা বিশেষ কারণে। তাহলে কি সত্যজিৎবাবু স্বল্পশিক্ষিত এবং স্বল্পবুদ্ধি দর্শকদের জন্যে এই ছবিটি তৈরি করেছেন? আমার ভালো লাগল, আমি তৃপ্তি পেয়েছি, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—এই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করে আমি কি তবে আমার অজ্ঞানতা প্রচার করছি, আর আধুনিক সিনেমাজগতে সত্যজিৎ রায়ের 'রেলেভেনস'-এর অভাবটাই ঘোষণা করছি? তা ছাড়া, সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখে ভালো লেগে ফেললেই তো আবার চাটুকারদের শ্রেণীতে আমাকে বসিয়ে দেওয়া হবে —সে কলঙ্ক যে চাঁদের কলঙ্কের চেয়ে ঢের বেশি বেদনার, অনেক বেশি অপরিবর্তনীয়।

এবার আবার ফিরে যাই সেদিনের সিনেমাহলের অভিজ্ঞতার কথায়। উত্তেজনা, আবেগ, অনুভূতি আর ভাবনার নানা স্তরে দোল খেয়ে-খেয়ে ছবির সমাপ্তির সঙ্গে বাইরের আলোয় বেরিয়ে আসছি যখন, তখন সারা হলে একটা জমাটবাঁধা দীর্ঘশ্বাস যেন থমথম করছে, কানে শোনা যায় মনে হল। আমরা গ্লোব থিয়েটার হলে ছিলাম ; দর্শকদের মধ্যে নানা বয়স আর শ্রেণীর বাঙালি ছিলেন, বহু মহিলা তাঁদের মধ্যে—আর আশ্চর্য লাগল দেখে, অল্প কয়টি বিদেশী ছাড়া বেশির-ভাগ দর্শকই অবাঙালি ভারতীয়। প্রত্যেকের মুখেই একটা অন্যমনস্ক আচ্ছন্ন ভাব। বাড়ি ফিরে এসে যখন খবরের কাগজে নামী সমালোচকদের সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিশ্লেষণগুলি পড়তে থাকলাম, ক্রমেই ঘোর থেকে ঘোরতর সংশয়ে ঘুরপাক খেতে থাকল মনটা। তবে কি আজকের বাঙালি বিদগ্ধজনের কাছে সত্যজিৎ রায়, ঘরে বাইরে আর রবীন্দ্রনাথ আর গ্রহণীয় নন? সেদিনের দর্শকমন্ডলী অতটা অভিভূত হয়েছিল তবে কেন? হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেদিনের একটা ঘটনা।

ওই স্তব্ধ দর্শকদের সংহত বেদনাবোধের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে এল—চমকে তাকালাম একটি শীর্ণকায় বাঙালি ছেলের দিকে। কেমন অপ্রতিভ মুখে অথচ রাগি গলায় সে বলে উঠল—'এমন জঘন্য ছবি দেখব মোটেই ভাবিনি'। চারিপাশের আচ্ছন্ন ভাবটাকে যেন সে সহ্য করতে পারছে না, তার নিজের ধারণাশক্তির জগৎ থেকে হয়তো এটা এতটাই আলাদা।

কিন্তু ছেলেটির তীব্র মন্তব্য শুনেও সেই জনস্রোত তেমনি সমাহিতভাবে ধীরে-ধীরে সরে গিয়ে নানা পথ দিয়ে মিলিয়ে গেল।

তারপর থেকে কত লোকের সঙ্গে যে ছবিটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশির-ভাগেরই কাছে ঘরে বাইরে হয় নৈরাশ্যের নয় বিরক্তির নয় রাগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বোধ হয়। নানা লোকের নানা মতামত নিয়ে পরে কথা হবে—আগে সমালোচকদের কথা তোলা যাক। আমার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে যে কয়টি বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য আমি পড়েছি তা কলকাতার একটি বাঙলা দৈনিক আর তিনটি ইংরাজি দৈনিক থেকে পাওয়া। তা ছাড়া আরেকটি আশ্চর্য উপহার পেয়েছি কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজি সাপ্তাহিক থেকে, যার সম্পাদক একজন শ্রদ্ধেয়, সমাজসচেতন কবি। সেখানে, ঘরে বাইরে সম্পর্কে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, লর্ড কার্জনের কাছে! অবশ্য চিঠির শৈলী আর ভাষার ছেলেমানুষি বুঝিয়ে দেয় যে আসল লেখিকা নিতান্তই বালিকা অথবা কিশোরী। কিন্তু সেই নকল রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি অবাক-করা মন্তব্য করেন। প্রথমে বলেন তিনি যে, প্রায় সব দৈনিক এবং পত্রিকাগুলিই নাকি সত্যজিৎ রায়কে কোনো ভাবে সমালোচনা করতে ভয় পাচ্ছেন। এত বড়ো মিথ্যে কথাটা নকল-রবীন্দ্রনাথ কী করে লিখলেন? আমার অভিজ্ঞতা তো তা বলছে না—সব কটা কাগজই তো কড়া পাওয়ারের চশমা পরে শবপরীক্ষার যন্ত্রপাতি, ছুরি-কাঁটা চালিয়ে ছবিটিকে ব্যবচ্ছেদ করে ফেলেছেন। দ্বিতীয় যে আশ্চর্য কথাটি নকল-রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, তা হল—ফিল্মের প্রথম অর্ধেকভাগ দেখতে-দেখতে তিনি নাকি ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করেন। যাঁরা আসল রবীন্দ্রনাথকে অল্পস্বল্পও চিনতেন তাঁরা তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত না হয়েও, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে জনসমক্ষে নাক ডাকিয়ে ঘুমোনো যে ঠিক স্বভাবসুলভ নয়, সেটা স্বীকার করতে আপত্তি করবেন না। অবশেষে নারীমুক্তি সম্বন্ধে কিছু অবান্তর কথা লিখে নকল-রবীন্দ্রনাথ শাসন করছেন সত্যজিৎকে, আমাদের সমাজ আর অন্দর মহলকে এমন নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর ভাবে ভেঙে ফেলার জন্য। রায়ের 'গিমিক'-বহুল শিল্প নাকি ভারতীয় চেতনার একেবারে বিরুদ্ধে, বোমবাই ছবি তার পাশে হেরে যায়।

একটি বাঙলা দৈনিকের সিনেমা-সমালোচক আমাদের প্রশংসা পাবেন বিশেষত একটা কারণে—তিনি পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানের বইগুলি কত পড়েছেন, আর তার থেকে শক্ত-শক্ত বাক্যগুলি কেমন লিখতে শিখেছেন, মনোবিকারের কিলবিলে সাপগুলিও আমাদের সাদামাটা বাঙালি মনের ভিতর থেকে টেনে কেমন বের করে ফেলেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানগুরু ফ্রয়েডের মহিমা স্বীকার করেও বলব যে ফ্রয়েড গিললেই তো হবে না, হজম করতেও হবে। আর প্রতি দেশের পরিবেশ আর রুচি অনুপাতে মানসিক খাদ্য-সম্ভার সাজাতে হবে তো—আমাদের জন্য এখনও কি মনোবিজ্ঞানকে যৌন তৃপ্তি বা অতৃপ্তির ছকে-আঁকা চার্টে বেঁধে রাখতে হবে? নিখিলেশকে তার 'পরাজিত পৌরুষে'র প্রতিশোধে Voyenristic 'ঠাণ্ডা ভিলেন' করে ফেললেন এই সমালোচক। তারপরে বিশ্লেষণের পরতে-পরতে, ঘরে বাইরের তিনটি প্রধান চরিত্রের গভীরে যে কত নাম-না-জানা অসুস্থ মানসিকতা খুঁজে পেলেন—ভাবলেও বিস্ময় লাগে। আমরা বড়ই অশিক্ষিত, মানুষ চিনি না, জগৎ সংসার বুঝি না—হুট করে বই পড়ি, উচ্ছ্বসিত হই, ফশ করে সিনেমা দেখে আবেগে গলে যাই। এমন মানুষদের মতামতের কি দাম আছে কোনো? নিখিলেশ আমাদের মতো মানুষদের কাছে আদর্শ পুরুষ হিসাবে মাননীয়, সে চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের কাহিনীতে আর সত্যজিতের ছবিতে সমান মর্যাদায় চিত্রিত হয়ে গেছে। কিন্তু একটু পড়াশোনা করে বিচার করতে বসলেই আমরা বুঝতে পারব যে নিখিলেশ আদর্শ এবং রোমানটিক নায়ক তো নয়ই—সে 'পুরুষ'ই না, বরং একটা অসুস্থ ভিলেন! যে পুরুষ তার স্ত্রীকে উনিশ-শতকীয় অন্দরমহল থেকে উদ্ধার করে উদার শিক্ষাজগতে মুক্ত করে দেয়, ভালোমন্দ বিচার করায়, বন্ধুত্ব গ্রহণ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাকে উপহার দিয়ে, নিজের আদর্শে অটল থাকে—সে কখনও 'পুরুষ' হতে পারে? পুরুষ তো মদ, মাংস আর মেয়ে নিয়ে দুর্দান্ত দাপাদাপিতে ব্যস্ত থাকবে, বউকে শয়নগৃহের শাসনে রাখবে, 'লম্পট' বন্ধুদের বাইরে ঠেকিয়ে রাখবে—তবেই না? আর ওই মেকী পুরুষগুলোর বাড় বাড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা সত্যজিৎ রায়ের মতো অদ্ভুত মানুষগুলিই।

তবু সেই ফ্রয়েডীয় সমালোচকের মতামত পড়ে কিছুটা বিনোদিত হওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের গানের লাইনটি গুনগুন করে ওঠে—'বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে!'

একটি ইংরাজি দৈনিক পুরো একপাতা জুড়ে নানা জ্ঞানিজনের মন্তব্য ছেপেছিলেন, জানুয়ারির এক শনিবারে, সেই 'টেগোর অ্যান্ড রে' আর ঘরে বাইরে সম্পর্কে। সমালোচনাগুলি পড়ে প্রথমে বিভ্রান্ত লাগলেও পরে মনে হল, ভয়ের কিছু নেই—এঁরা তো আর আমরা নন, এঁরা অন্য জাতের, ওঁদের শিরায় তো রক্ত বয় না, শুধু বয়ে চলে কালো কালি। তাই নির্লিপ্ত কৌতূহলে চোখ বুলিয়ে যেতে-যেতে মনে হল এঁদের সকলের একটা সাযুজ্য ধরা পড়ে—এঁরা হয় রবীন্দ্রনাথ নয় সত্যজিৎ নয় তো উভয় সম্পর্কেই বড়ো বীতস্পৃহ, এবং শিল্প আর সাহিত্যের সামাজিক 'রেলেভেনস' নিয়ে খুবই উত্তেজিত থাকেন। একজন তো সাহিত্যেপুরস্কৃত লেখক, এমন নীরস কয়েক ছত্র লিখে ছেড়ে দিয়েছেন—মনে হল এঁরা বাস্তব আর কল্পনাজগতের উপকরণ সাজিয়ে সাহিত্য গড়ে তোলেন কিভাবে? সবচেয়ে স্তম্ভিত করে শেষ লেখাটি—এমন 'ভিট্রিয়লিক' দাহতে গায়ে ছ্যাঁকা লাগে নি অনেক দিন। বোঝা গেল লেখকের সত্যজিৎ সম্পর্কে কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে, যা আমবাতের মতন তাঁর সারা গায়ে বেরিয়ে পড়ে, পরিচালকের নাম শুনলেই। পথের পাঁচালী থেকে শতরঞ্জ কে খিলাড়ী, সেখান থেকে সদ্গতি আর ঘরে বাইরে, সবই শুধু আঙ্গিকের অলংকারে ভারাক্রান্ত, সোস্যাল রিয়ালিটির বাণী অথবা শ্রেণীসংগ্রামচেতনা তাঁর শিল্পকে কখনো প্রগতির আকাশে তুলে নিয়ে যায় না। যখন লেখক বলেন যে সদ্গতিতে সম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থাটির উপর স্পষ্ট ফোকাস করা হয়নি তখন তাঁকে অনুরোধ করতে ইচ্ছে হয়—চশমার পাওয়ার আপনার বাড়ছে বোধহয়, বদলে দেখুন, ঠিক ফোকাস পেয়ে যাবেন। ভদ্রলোক মৃণাল সেনের ছবির ভক্ত, তাই বলে কি অন্য জাতের ছবি তারিফ করতে বাধা আছে কিছু? নতুন ধরনের গুরুবাদ শুরু হয়েছে মনে হয়।

'দ্য টেলিগ্রাফ' ও 'দ্য স্টেটসম্যান' দৈনিকে ঘরে বাইরে সম্পর্কে বেশ চিত্তাকর্ষক কিছু ডিটেল আর তথ্য পাওয়া গেল—বিশেষ করে পড়ার মতো ছিল নায়ক ভিক্টর ব্যানার্জীর অনুভূতিময় মন্তব্যগুলি। চিত্রসমালোচনায় প্রশংসনীয় ভারসাম্য লক্ষ্য করার মতো এই দুই দৈনিকে।

মোটামুটি পড়ে মনে হল যে আমাদের বিজ্ঞ সমালোচক-গোষ্ঠী দলীয় সংহতিতে বিশ্বাসী, তাই তাঁরা ব্যক্তিগত অনুভূতি বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে উৎসাহ দিতে নারাজ। হয় ফ্রয়েড নয় মার্কস—এই দুই বিদেশী দেবতার মন্দিরে তাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন—তাই সেই দুটি কড়া ছকের বাইরে দাঁড়ানো তাঁদের পক্ষে অস্বস্তিকর। হাঁফ ছেড়ে নিশ্বাস নিলাম—আমার মত আমারই রইল, ওঁদের মত ও'দের। এখানে 'মগজ-ধোলাই' হবার আশঙ্কা কমে গেল।

এবারে আসি বন্ধুবান্ধবদের মতামতগুলির প্রসঙ্গে।

দুটি সাধারণ গৃহবধূর কাছ থেকে যেমন বুদ্ধিযুক্ত বক্তব্যে প্রশংসা পেয়েছে ঘরে বাইরে, তেমন ইংরাজ নাট্যকার আর ভারতপ্রেমিক ব্রায়ান ক্লার্কের মতে, ফিল্মটি তাঁর জীবনের উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি।

বিমলা-চরিত্রে স্বাতীলেখার অভিনয় নিয়ে, এবং তাঁর চেহারা নিয়ে, অনেকে আপত্তি তুলেছেন—কিন্তু সেখানেও আমার মত বদলায় না। বইয়ের বিমলা আর ফিলমের বিমলায় কোনো ঠোকাঠুকি লাগে নি আমার মনে; তাঁর সাজ নিখুঁত, চেহারায় একটা লম্বা, তন্বীভাব আছে, 'লোকেরা যাকে নিন্দে করে বলে—ঢ্যাঙা!' সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হল তাঁর প্রায় না-কথা-বলার মধ্যে একটা তীব্র-গভীর একাগ্রতা, আর চাহনির উজ্জ্বল দীপ্তি। অন্দরমহলের চৌকাঠ পেরিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাহিরজগতে যখন বেরিয়ে এলেন সুসজ্জিতা বিমলা, জীবনে প্রথমবার—তাঁদের দুজনের সেই অসাধারণ ভাসমান দ্যুতি সহজে ভোলার নয়। চিকের আড়ালে বসা বিমলার সন্দীপের দিকে তাকিয়ে থাকাও ভারি রমণীয়—আর আবেগে, সন্দেহে, রাগে, লজ্জায়, গভীর শোকেও, তাঁর মুখে কত সূক্ষ্ম অনুভূতি হালকা ছোঁয়ায় ধরা পড়েছে কতবার। সন্দীপের চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্যভাবেই ফুটিয়েছেন সৌমিত্র—বইয়ের সন্দীপ কোনোভাবেই এর চেয়ে সংবেদনশীল মনে হয় নি আমার। অনেকে তাতে আপত্তি করেন যদিও। নিখিলেশরূপী ভিক্টর ব্যানার্জি সম্পর্কে কিছু বলার থাকতে পারে নাকি? এই অভিনেতা একেবারে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতায় ভোট পেয়ে গেলেন সবার কাছে। আর ভারি ভালো লেগেছে অমূল্য চরিত্রের তরুণটির অভিনয় আর চেহারা।

একজন বিদগ্ধমনা অধ্যাপক-কবি ঘরে বাইরে ফিলমটিকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন নি—যেমন পারেন নি একজন নামী লেখিকা। আমার মনে হল, এঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরের অন্তর্ভুক্ত (বিশেষ করে তাঁর স্বদেশী আন্দোলনের সেই যুগ সম্পর্কে) স্পষ্ট মতবাদগুলি আদপেই পছন্দ নয়। সন্দীপ তাঁদের চোখে কিছুটা 'পরাজিত নায়ক' পর্যায়ে পড়েন বোধ হয়—ভিলেন তিনি কখনোই নয়। এই তর্কে নামলেন এক তরুণ দম্পতিও। তরুণী নিলেন রবীন্দ্রনাথের মতবাদের পক্ষ আর তাঁর স্বামী স্পষ্টতই সন্দীপের ভক্ত-দলে—তাই তাঁর কাছে ফিলমটি বেশ ত্রুটিপূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলন আর হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ নিয়ে অতি প্রাঞ্জল আর পরিষ্কার বিশ্লেষণ করলেন তরুণ গবেষক-সাংবাদিক চন্দন মিত্র। শুনে নিশ্চিন্ত হলাম যে তাঁর মতে (তিনি ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ), ঘরে বাইরেতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিকোণটি, ইতিহাসের চোখে একেবারে নির্ভুল প্রমাণিত হয়ে গেছে। আলোচনার শেষে যদিও, চন্দন মিত্র ঘরে বাইরে ফিলমটি সম্বন্ধে খুব উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। রবীন্দ্রতত্ত্ববিশেষজ্ঞ ড মঞ্জুলা বসু বল-

লেন, ফিলমটি তাঁদের তৃপ্তি দিয়েছে—প্রণতি মুখোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রনাথ বসু আর তাঁকে। ছোটোখাটো মন-খুঁতখুঁতে সব অভিজ্ঞতার সঙ্গেই জড়িত থাকে—কিন্তু সম্পূর্ণতায় সত্যজিতের ঘরে বাইরে অত্যন্ত মনোগ্রাহী।

সবশেষে আমার এক বন্ধুর কয়টি কথা উদ্ধৃত করে লেখা শেষ করি। তিনিই আমার সঙ্গে, অনেকটা সময় খরচ করে, এই ফিলমটি নিয়ে সকলের থেকে বেশি আলোচনা করেন, এবং আমাকে এই বিষয়ে লিখতে প্ররোচিত করেন।

"ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ যখন, তখন সবাই ঘরে বাইরে দেখে একমত হবেন এমন প্রত্যাশা করা যায় না। ...অনেকখানি প্রত্যাশা থাকলে সাধারণত কোনো কিছুই আশানুরূপ ভালো লাগে না। ...যাঁদের মোটামুটি পরিচয় ছিল উপন্যাসটির সঙ্গে তাঁরা অধিকাংশই হতাশ হয়েছেন, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। আর বিদগ্ধ সমালোচকেরা তো একেবারে উন্মত্ত উল্লাসে ব্যবচ্ছেদ করে চলেছেন চলচ্চিত্রটির শুধু নয়, চলচ্চিত্র-পরিচালকেরও।

"সম্মানিত ব্যতিক্রম স্বীকার করেও বলব, বেশ কিছু নামি দামি সমালোচক আছেন যাঁদের কাছে ৫০ বছর ধরে ব্যবহারের পরেও ফ্রয়েডিয়ান কিংবা মার্কসিস্ট ছকের দাম কমে নি। অবশ্য ছকে বাঁধা চিন্তার সুবিধা এই যে পাণ্ডিত্যের জন্যে তৈরি বোলচাল বেশ যথেষ্ট পরিমাণে হাতের কাছে পাওয়া যায় এবং তাতে নিজের আর অপরের চোখ কান ধাঁধিয়ে দিতে দেরি হয় না। তা ছাড়া প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই যে বিশিষ্ট, এবং তা নিয়ে প্রত্যেককেই নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী ভাবতে হয়, এই মূল সত্যটাই অস্বীকার করলে পরিশ্রম আর দায়িত্ব অনেক কমে যায় আমাদের। কিন্তু এমনতরো সমালোচনায় সত্যকে বুঝতে যত না সাহায্য হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ঘুলিয়ে দেওয়া হয় সত্য-মিথ্যাকে, শব্দের চটকদার ভড়ং দিয়ে।

"...যে মানুষ সংসার, সমাজ, চলতি রাজনীতির প্রচণ্ড চাপ একা অগ্রাহ্য করে নিজের বিশ্বাসে অটল থাকতে পারল, স্ত্রী আর বন্ধুর বিশ্বাসঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করল না, নিজের আদর্শ অনুযায়ী কর্ম থেকে বিরত হল না, সেই হল পরাজিত পুরুষ! আর সে যখন নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে দাঙ্গায় বিপন্ন মানুষদের রক্ষা করবার জন্যে ছুটে যায়, তখন সেটা হয় পরাজিতের আত্মহননের কামনা! হায়, ফ্রয়েডের কী মহিমা, 'অবচেতন'-এর দোহাই দিয়ে সাদা আসলে সব সময়েই কালো, মহত্ত্ব সব সময়েই ক্ষুদ্রতা। এবং সর্বোপরি, সমস্ত চিন্তাভাবনা-সাধনা, ব্যর্থতা-সার্থকতার ব্যাখ্যা মেলে যৌন তৃপ্তি আর অতৃপ্তিতে। এই পোড়া দেশে মনোবিজ্ঞানের এই হল "আধুনিকতম" প্রয়োগ।

"অন্যদিকে আছে মার্কসিসট ফরমুলা—সেই তত্ত্ব অনুযায়ী কিছুই কিছু নয় যদি-না শ্রেণীসংগ্রামচেতনা, সমাজবিপ্লব ইত্যাদির পথ প্রশস্ত করতে পারে কোনো শিল্প। তাই ঘরে বাইরে, শতরঞ্জকে খিলাড়ী, সদ্গতি সবই নীরক্ত, আঙ্গিক-সর্বস্ব, ঘটনার বয়ান মাত্র ঠেকে—তাতে সমাজপরিবর্তনের কোনো আশা জাগে না মনে। ...যে পরিচালক 'ন্যায়' অর্থাৎ ইতিহাসের প্রগতিশীল ব্যাখ্যায় পূর্ণ আনুগত্য স্থাপন না করেন, তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়। বেশ তাই শিরোধার্য করা গেল।"

তবু একটু "নির্লজ্জ স্তাবকতা" করব মনস্থির করেই কলম ধরেছি। কারণ, যাঁরা সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছেন, অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন, ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন, আমরা তাঁদের দলে নই। কিছু আপত্তি আর সংশয় সত্ত্বেও চলচ্চিত্রটি দেখে উঠে আসার সময় আমি অন্তত তৃপ্তি নিয়েই এসেছি, এবং আরো বার কয়েক খুঁটিয়ে দেখার ইচ্ছাও রয়েছে। কারণ একবার দেখে যেন সব কটি ডাইমেনসন পুরো উপভোগ করা যায় নি।

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরের সঙ্গে সত্যজিতের ঘরে বাইরের মেরুপ্রমাণ দূরত্ব পেয়েছেন কেউ-কেউ। আমি পাই নি। তবে শ দেড়েক পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, গ্রামীণ সমাজ আর তার আর্থিক-সামাজিক টানাপোড়েন, ক্ষয়িষ্ণু একটি জমিদারপরিবারে সনাতন আর আধুনিকের সংঘাত ইত্যাদির বিস্তৃত পটভূমিতে তিনটি মূল চরিত্র এবং প্রায় দ্বিগুণ-সংখ্যক সহায়ক চরিত্রের যে দক্ষ চিত্রণ করেছেন তাকে আড়াই-তিন ঘণ্টার একটি চলচ্চিত্রে পরিণত করা যে সহজ কাজ নয়, একথা নিশ্চয়ই তাঁরা সবাই স্বীকার করেন।

..."অবশ্য অনেকে নাকি পড়তেই পারেন না এই বাকসর্বস্ব উপন্যাস-নামধেয় তত্ত্বকথাটি। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখতে জানতেন না একথা বহুকাল ধরেই শুনছি, এখন আবারও শুনলাম—হয়তো ঠিক কথা। বাঙালির মনের মতন উপন্যাস তিনি লিখতে পারেন নি, শরৎবাবু যেমন পেরেছেন। কথা শুনতে বা কইতে বাঙালির অরুচি নেই যদি কথায়-কথায় চোখের জল ছলকে ওঠে, বুক গুমরে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে এবং বই বন্ধ করতে-করতে মনে হয় 'কী হৃদয়নিঙড়ানো ভাষা, আহা!' হৃদয় জিনিষটা মন্দ নয়, কিন্তু বাঙালির যে মগজেরও অহংকার আছে! না হয় মগজের উপরও একটু চাপ দিলেনই রবীন্দ্রনাথ। 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' নাকি আগাগোড়া তর্কের কচকচিতে ঠাসা, তাতে মানুষ নেই, ঘটনা নেই, কাহিনীর কোনো ক্রমপরিণতি নেই, আছে শুধু প্রাণহীন বিতর্ক। অথচ এই দুটি উপন্যাসেই চিন্তার ক্রমপরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটি মানুষের ক্রমিক পরিণতি এমন টানায়-পোড়েনে বুনে দেওয়া হয়েছে যে না রসের ঘাটতি হয়, না ঘটনার স্বচ্ছন্দ গতিতে বাধা পড়ে। রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় বাঙলা ভাষায় প্রথম আর শেষ চিন্তাশীল উপন্যাস লিখেছেন। ইনটেলেকট আর ইমোশন-এর এমন নিশ্ছিদ্র বয়ন বাঙলার তাঁতে বড়ো চড়ানো হয় না।

এজাতীয় উপন্যাসকে চাক্ষুষ করে তোলা কঠিন—বড়ো কঠিন, সে কথা সত্যজিৎ না বললেও আমরা বুঝতে পারি। তিনটি প্রধান চরিত্রই বেছে নেবার বেলায় এবারও তাঁর ভুল হয় নি। বয়সের ছাপ পড়েছে নাকি সন্দীপের মুখে! স্বাতীকেও বয়স্কা দেখায়? বেশ, ধরে নেওয়া যাক রবীন্দ্রনাথের নায়কনায়িকাদের চেয়ে সত্যজিতের প্রত্যেকটি নায়কনায়িকার বয়স দশ বছর বেশি। তাহলে কি কোথাও অসুবিধা হয় এই নাটকীয় কাহিনীটিকে অনুধাবন করতে? তাদের পারস্পরিক যোগবিয়োগ কি অবান্তর ঠেকে কোথাও?

শ্যামশ্রী লাল

নাটক

এই সময়ের একটি প্রোফেশনাল নাটক

ঠিক এখনই কলকাতা শহরে যেসব পেশাদার নাটক রমরমিয়ে চলছে, তার একটি 'নাগপাশ'। তপন থিয়েটারে এ নাটকের অনেকগুলি দর্শকবহুল রজনী অতিক্রান্ত। মূল কাহিনী সমীর রক্ষিতের—তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত একটি সমসাময়িক সামাজিক সমসা

হীরু-নামের এক অখ্যাত মস্তানকে নিয়ে কাহিনী। যে জটিল নাগপাশের বাঁধনে বাঁধা পড়ে শেষ পর্যন্ত তাকে হীরু গুণ্ডা হতে হয়, পরিণামে তারই প্রতিদ্বন্দ্বী আর-এক মস্তানের হাতে তাকে প্রাণ হারাতে হয়, কাহিনীসূত্রে তা-ই বিবৃত হয়েছে। অবশ্যই, এই সামাজিক সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আমরা এই ধরনের নাটকে প্রত্যাশা করি নি, এবং তা পাইও নি।

এই ধরনের পেশাদার থিয়েটার অভিনয়ধারায় যে চড়া সুর তুলতে চেষ্টা করে, তা অবশ্যই এ নাটকেও দেখা গেল। নামি-দামি শিল্পীদের নিয়ে এঁরা মঞ্চে নামেন, দর্শকেরা যান তাঁদের প্রিয় শিল্পীদের চলন-বলন-কথনে আনন্দিত হতে। শিল্পীরা সে চাহিদা মেটাবার চেষ্টাও করেছেন প্রাণপণে। মঞ্চে আলোর সমারোহ আর নানা দৃশ্যসমাহারের জৌলস এই ধরনের নাটক থেকে এক উপরি পাওনা। লক্ষণীয়, 'নাগপাশ' নাটকে তা প্রায় দেখা গেল না। তবে সংগীতে চড়া সুরের ব্যবহার ছিল বেশ প্রকট।

গ্রুপ থিয়েটারগুলি কলকাতায় অধুনাকালের সামাজিক সমস্যার রূপায়ণে বেশ ব্যস্ত। কিন্তু, সেখানে দেখা গেছে, সমস্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জরুরি তাগিদ, তার বিশ্লেষণ আর তার নানান খুঁটিনাটি দিক মেলে ধরার প্রয়াস। প্রোফেশনাল নাটকে আমাদের প্রত্যাশা এত বেশি থাকে না। তবু তাঁদেরও লক্ষ্য, দেশের বিভিন্ন সমস্যার নাট্যরূপায়ণ। এবং সেসব সমস্যা অতি মাত্রায়ই দেশী। হয়তো এর একটা সুফলও আছে—দর্শকরা সমস্যা সম্বন্ধে কতকটা অবহিত হতে পারেন। সমাধানের সামান্যতম ইঙ্গিতও অবশ্য তাঁরা পান না।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ব্রডওয়ে থিয়েটারের যে ধারা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের এই প্রোফেশনাল থিয়েটারকে দেখতে চেষ্টা করলে, মুহূর্তেই অনেক ফাঁকি ধরা পড়ে। ব্রডওয়ে থিয়েটারগুলি মূলত দর্শকমনোরঞ্জনের তাগিদ নিয়েই তৈরি হয়ে থাকে। আর্থিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত স্বচ্ছল। সামাজিক ঘরোয়া উপাখ্যান নিয়ে নাটক তৈরি হলেও, মূল লক্ষ্য থাকে মনোরঞ্জন। কিন্তু কলকাতায় যে-সমস্ত পেশাদার নাটক অভিনীত হচ্ছে, কয়েকটিকে বাদ দিলে লক্ষ্য কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেরই এক : এইটা দেখানো যে তাঁরা কতটা সমাজসচেতন।

আমাদের দেশে থিয়েটারের অভিনেতাদের আর্থিক কদর ক্রমেই কমে আসছে। আশার কথা এই যে, এই-সমস্ত নাটকের সুবাদে তাঁদের আর্থিক সমস্যার কতকটা সুরাহা হচ্ছে। তার উপর, শিল্পের দিক দিয়ে যদি কিছু প্রাপ্তি ঘটে, সেটি উপরি পাওনা।

দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

পাঠকের দৃষ্টিতে

প্রসঙ্গ : ভবতোষ দত্তের প্রবন্ধ 'প্রগতি এবং দারিদ্র্য'

১

দারিদ্র্যসীমার নীচে ভারতের যে অর্ধেক মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখাটাই সমস্যা—তাদের অবস্থা কী করে ফিরতে পারে, ড ভবতোষ দত্তের প্রবন্ধে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সেগুলো সংক্ষেপে হল : বিলাসসামগ্রীর উৎপাদন বাড়াতে না দেওয়া ; কমলাভের বা যে প্রকল্প কার্যকর হতে দীর্ঘ সময় আর বেশি অর্থের প্রয়োজন সেগুলো সরকারি ক্ষেত্রে সীমাবন্ধ রাখা ; ভোগ্যপণ্যের প্রধান প্রধান সামগ্রী নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিপণণ ; ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণে সাহায্য এবং দরিদ্র জনসাধারণের স্থায়ী উপকার হয়, কেবল এমন প্রকল্পেরই রূপায়ণ।

এখন প্রশ্ন, এই-সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা কার আছে? বিশেষ করে যখন দেখি, সরকারি সংস্থার বেশির ভাগই রক্তাল্পতায় ভুগছে। স্বীকার করলাম—আমাদের কাজ করবার ক্ষমতা আছে, দক্ষতা আছে, বৈজ্ঞানিক তথা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষও আছে। কিন্তু যেখানে সরষের মধ্যে ভূত, সেখানে এসব থেকে সার্থকতা পাওয়াটাই আশ্চর্য। এশিয়াড বা জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের সময় কর্মতৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে অপচয়িত অর্থের যে পরিমাণ শুনেছি, তাতে আনন্দের চাইতে ক্ষোভই বাড়ে।

তারপর ধরুন, ভোগ্যপণ্য বণ্টনে দুর্নীতি তো আসবেই। নিকৃষ্ট দ্রব্যটি মিলবে, উৎকৃষ্ট সামগ্রী চলে যাবে খোলা বাজারে কিংবা কালো বাজারে। করফাঁকি রোধ করা যাবে কি? কয়েক হাজার কোটি তো বকেয়া আয়করই রয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয়। আর ছিয়াত্তর হাজার কোটি কালো টাকার কৃষ্ণমেঘ তো সমস্ত আর্থিক আকাশকে ঘন আঁধারে ঢেকে রেখেছে। কালো টাকার এই সমান্তরাল অর্থনীতি তো দরিদ্রকে আরো দরিদ্রই করছে। মুদ্রাস্ফীতির দৌরাত্ম্যে টাকার মূল্য কমে আজ মাত্র ষোলো পয়সায় দাঁড়িয়েছে।

এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের কতটা উন্নতি ঘটাতে পারা যাবে? দুর্নীতির নানা রন্ধ্রে—তার মধ্যে উৎকোচটিই প্রধান—অনেক সদিচ্ছারই যে প্রাণান্ত হয়, এটা সবাই জানেন। তা ছাড়া আইনও নাকি বহুক্ষেত্রেই দুর্বল।

আসল কথাটা হল এই যে, মূল ধরে টান না দিলে কিছুই হবে না। অর্থাৎ আমাদের চরিত্র বদলাতে হবে। শুনতে পাই, জাপানে আগাম করবৃদ্ধির খবরেও লোকে বিচলিত হয় না, কোনো সামগ্রী বেশি করে কিনে জমিয়ে রাখে না। কারণ তারা জানে করবৃদ্ধি দেশের স্বার্থেই হবে। সেই চরিত্রবল, সেই মানসিকতা আমাদের কি আসবে কোনোদিন?

ড দত্তের আশা সার্থক হলে খুশিই হতাম—কিন্তু মনে হয়, তা হবার নয় এই পোড়া দেশে।

দিলীপনারায়ণ দে
৪৬/১০ বেচারাম চাটুজ্জে রোড
কলকাতা-৩৪

২

স্বাধীন ভারতের প্রগতির সঙ্গে মিশে-থাকা দারিদ্র্যের ছবিটা দেখতে গেলে, তার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে গেলে, সমস্যাটির গভীরে ঢুকতে গেলে প্রথমেই চিনে নেওয়া দরকার ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কাঠামোটাকে। এই কাঠামোটি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে গ্রামীণ ভারতের দারিদ্র্য আর শহুরে দারিদ্র্যকে একসঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হবে, আর তাতে যে ছবিটা ফুটবে তাতে রাম শ্যাম দুজনের কাউকেই ঠিকমতো চেনা যাবে না, ফলে সমস্যার সঠিক সমাধান নির্দেশ করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, প্রসঙ্গ যেখানে ভারতবর্ষ, সেখানে বণ্টনগত বৈষম্যকে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত রাখতে হবে—তাদের আলাদা করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরে যদি বলা হয় যে, কেবল জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রকল্পের নবমূল্যায়ন করে, এবং তাদের পুনর্বিন্যাস করেই দারিদ্র্য ঘোচানো সম্ভব, তাতে কথাটা যুক্তিসহ হয় না। শ্রেণীসংঘাতকে অস্বীকার করে তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশই অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করতে পারে না, দেশের সাধারণ মানুষকে সামাজিক তথা রাজনৈতিক মুক্তি দিতে পারে না।

এক। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের মূল কারণ জমির অসম বণ্টন, অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ইনপুটের বণ্টনে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, এবং ঋণদানব্যবস্থার অপ্রতুলতা।

যেখানে জমিই প্রধান সম্পদ, সেই গ্রামদেশে যার হাতে বেশি জমি তার অর্থনৈতিক ক্ষমতাই শুধু বেশি নয়, এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা তাকে এনে দেয় সামাজিক প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতা। এই দুয়ে মিলে তার হাতে এনে দেয় আরও অর্থনৈতিক ক্ষমতা। এই বৃত্তকে ভেঙে দিতে হলে প্রথমেই চাই আমূল ভূমিসংস্কার, ভূমি-আইনের কঠোর প্রয়োগ, এবং একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন।

অনুন্নত কৃষিব্যবস্থায় কৃষিশ্রমের সর্বোচ্চসম্ভব ব্যবহার হয় না। পুরনো ধারার কৃষিকর্মে কাজ করে যত লোক, তাদের বেশ-কিছুকে সরিয়ে নিলেও উৎপাদন একই থাকবে, নয়তো একই থাকবে। অর্থাৎ পাঁচজনের খাবার ভাগ করে খাবে সাতজন বা আটজন।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া কৃষিঋণ যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কৃষক শোধ দিতে না পারে তাহলে তাকে চড়া সুদ স্বীকার করে সেই মহাজনের কাছেই ফিরে যেতে হয়। অর্থাৎ আবার সেই বৃত্তেরই মধ্যে।

গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য দূর করার জন্য উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়ের আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। যদি রাজনৈতিক কারণে সরকার এই পরিবর্তন আনতে না পারে, তাহলে প্রয়োজন কৃষিকর্মের বাইরে কর্মসংস্থান—কর্মসংস্থান, আয় এবং উৎপাদনের বৃদ্ধি যেন হয় একই সঙ্গে।

আমাদের দরিদ্র দেশে যোগানের প্রতিবন্ধকতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই, আয়বৃদ্ধির হারের চেয়ে উৎপাদনবৃদ্ধির হার বেশি হওয়া প্রয়োজন। এর কারণ, জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে অনুৎপাদক জনসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে গেলে, উৎপাদনকে সব সময়েই অনেক বেশি হারে বাড়াতে হবে।

দুই। শহরে দারিদ্র্যের মূল কারণ, বেশি মজুরির আশায় গ্রাম-থেকে-আসা বিশাল শ্রমিকবাহিনী, যারা ভিড় করে ইনফরম্যাল সেকটরে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে শহরে যে মুহূর্তে মজুরির হার বাড়ছে, সেই মুহূর্তে গ্রামীণ শ্রমিকের কাছে শহর আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির মূল প্রকোপ এসে পড়ছে শহরের শ্রমিকের উপর।

তাই, শহরে দারিদ্র্যমোচনের পথ বার করতে হলে গ্রাম থেকে শহরে আসা বন্ধ করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন গ্রামে আরও কর্মসংস্থান।

তিন। ড দত্ত বলছেন যে, বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না। কিন্তু তাতেই দারিদ্র্যমোচন হবে না। যদি এইসব বিলাসসামগ্রীর উপর অত্যন্ত বেশি হারে কর বসানো যায়, আর সেই আয় যদি সাধারণ মানুষের ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে নিয়োগ করা হয়, তাহলে সুফল ফলবে অনেক বেশি।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় জোর দেওয়া উচিত ভারি শিল্পের উপর।

চার। আয়ের অসাম্য দূর করতে হলে এমন ব্যবস্থা নিতে হয় যাতে ভবিষ্যতের আয়ের মোটা অংশটাই খেটে-খাওয়া মানুষের হাতে যায়।

আয় বাড়লে, নিম্ন আয়ের লোকেদের ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও বাড়ে। সুতরাং, সঞ্চয়ের হার বাড়াতে গেলে আয়ের হার এবং সাধারণ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনের হার এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে ভোগ্যপণ্যের দাম না বাড়ে। এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় অর্থনীতির কাঠামোটাকে নমনীয় করা এবং ফ্যাকটর ইমমোবিলিটি দূর করা।

গৌতম রায়চৌধুরী
এডি ১৯৬, সল্ট লেক সিটি, সেকটর-১,
কলকাতা-৬৪

৩

ড ভবতোষ দত্ত বলেছেন, প্রগতির মুখে কালিমা লেপেছে দারিদ্র্যের ধোঁয়া। স্বাভাবিকভাবেই, পরিকল্পনার মধ্যেকার সম্ভাবনা-ব্যর্থতার একটি সীমিত সর্বজনবোধ্য আলোচনা তিনি করেছেন। বিশেষত, শিল্পোৎপাদনের একদিকে প্রগতি (বিলাসদ্রব্য, ইনজিনীয়ারিঙ), আরেক দিকে অবক্ষয় (চট, কয়লা, ওয়াগন ইত্যাদি)। এই নিয়ে আর-একটু আলোচনার প্রয়োজন ছিল। এর মধ্য দিয়ে শিল্পপ্রগতির অর্ধসত্য উদ্ঘাটিত হতে পারত ; বোঝা যেত সামগ্রিক অর্থনীতির কতটুকু পরিকল্পনার আওতায় পড়ে। লেখক বেকার-সমস্যার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ড দত্ত দারিদ্র্যের সমস্যাকে শেষ পর্যন্ত সংগঠনের সমস্যা, পরিকল্পনার সমস্যা হিসাবেই দেখেন। কিন্তু একশ বছরের অভিজ্ঞতায় এটা পরিষ্কার যে, দারিদ্র্য ভুল পরিকল্পনা বা সাংগঠনিক বিচ্যুতির খেসারত নয়।

দারিদ্র্যমোচনের পথটা কী। বিতর্ক আছে। ড দত্ত মাঝারি একটা অবস্থান নিয়েছেন। যেমন, শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি চাই, সমবণ্টনমুখী উদ্যোগ চাই। কিন্তু মূলধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় টেকনলজি শ্রমনিবিড় হবে কিনা, সে ব্যাপারে সংশয় থাকে। প্রথমত, এইসব টেকনলজির জন্ম মূলধনপ্রধান দেশে। দ্বিতীয়ত, শ্রমনিবিড় টেকনলজির ক্ষেত্রে পরিচালনসমস্যা বেড়ে যায়। তৃতীয়ত, শ্রমিককে আরো বেশি যন্ত্রের মুখে ফেলে দিয়ে মালিকপক্ষ উদ্বৃত্ত সম্পদ বাড়াতে পারে। চতুর্থত, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার একটি লক্ষ্য হল মানুষকে বিশ্রামের সুযোগ করে দেওয়া। প্রতিটি মানুষের খাওয়া-পরার জন্য এখন যৎসামান্য শারীরিক শ্রমই যথেষ্ট—বিজ্ঞানের এই সাফল্য মূলধনের শোষণের একটি শর্ত।

অন্যদিকে, সমবণ্টনমুখী আয়বৃদ্ধি এই সমাজব্যবস্থায় বেশি দূর করা যায় না।

ড দত্ত পরিকল্পনাবিদ আর তার রূপায়ণকারীদের কাছ থেকে এক ধরনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দায়িত্ববোধের প্রত্যাশা করেছেন। বুরজোয়া ব্যবস্থার ভিতরেই তা পাওয়া যেতে পারে। আমেরিকায় যে দক্ষতা বা বাস্তববোধ অর্থনীতিবিদদের মধ্যে

দেখা যায় তা সেখানকার মুক্ত অর্থনৈতিক উদ্যোগের একটি শর্ত। কাজটার মধ্যেও জটিলতা নেই ; গোটা পৃথিবীর বাজার মূল্যধনীদের দখলে রাখতে হবে—এইরকম একটা অতিস্পষ্ট লক্ষ্য সামনে থাকে। অর্থনীতিবিদদের কাজটা হয়ে দাঁড়ায় একটা সাদাসাপটা অপটিমাইজেশন। কিন্তু আমাদের দেশে পরিকল্পনাবিদদের সামনে প্রচুর পরস্পর-বিরোধী লক্ষ্য একসঙ্গে রাখা হয়। ফলে, দারিদ্র্যমোচনের পরিকল্পন হয়ে দাঁড়ায় কয়েক শতাংশ মানুষকে একটি রেখার উপরে তুলে আনার জন্য কত টাকা খরচ করতে হবে—সেইরকম মুদ্দির হিসাব। দারিদ্র্য যে একটি গুণগত ধারণা—তার স্বীকৃতি পরিকল্পনায় মিলেছে কি ?

ড দত্ত যে তত্ত্বের সাহায্যে দারিদ্রের সমস্যাটিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন, তাতে শেষ পর্যন্ত বিলাপ করতেই হয়। অর্থনীতিবিদের সংকীর্ণ অবস্থান ছেড়ে বিবিধ সমাজতত্ত্বের সাহায্য নিলে আমরা হয়তো সমাজের এক অংশের দিকে আঙুল তুলে বলতে পারতাম—তোমরাই দায়ী।

বিভাস সাহা

জগৎবেড়, শ্রীপল্লী, বর্ধমান

জুন সংখ্যায় এ বিষয়ে আরও লেখা প্রকাশিত হবে।